তিন ভাগ জল

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর : ১৯৬৫
অগ্রহায়ণ : ১৩৭২

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ. গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

তিন ভাগ জল

প্রথম ভাগ

পাখির বাসা

এখানে যুদ্ধ।

এখানে বাঁচতে হলে মৃত্যুর সঙ্গে প্রতি-মুহূর্তে যুঝতে হবে। জীবন আর মৃত্যুর এখানে পাশা-পাশি বাস। গায়ে গায়ে বাস। কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে মৃত্যু ঈগলের মত জীবনকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে ঠিক নেই। আবার তারই অব্যর্থ গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে নিজেকে উদ্ধাবের তৎপর কৌশলটিও জানা আছে এখানকার জীবনের।

এখানে জীবন আর মৃত্যু দুই-ই সজীব।

আঁট-কপনি পরা লোকগুলো খালি গায়ে কোমরে শুধু একটা করে ধারালো বাঁকা ছোরা গুঁজে বু-বু বু-বু ডাক ছেড়ে একের পর এক ডুবে ডুবে কালো জলের তল হাতড়ে সভ্যতার জ্যান্ত উপকরণ তুলে আনার উল্লাসে মেতেছে। তারা কেউ জানে না কোন্‌টা কার শেষ ডুব। কেউ জানে না কোন্‌বার কে শেষ ডোবা ডুবল। কিন্তু তাবাও মৃত্যুতে বিশ্বাসী নয়, জীবনে বিশ্বাসী। এই জীবনে। এমনি জীবনে।

যে-সভ্যতার প্রয়োজনে সমুদ্রের বুক খুঁড়ে খুবলে ওদের এই উপকরণ সংগ্রহ, সেই সভ্যতার সঙ্গে ওদের যোগ নেই একটুও। শুধু এই জীবনের সঙ্গে যোগ। এই যুদ্ধের সঙ্গে যোগ।

এই যুদ্ধ ওদের পেশাও, নেশাও।

শেল ব্যবসায়ীরা সমুদ্রের এলাকা ইজারা নিয়ে শেল-ডাইভার নামায়। বহু দলে বহু লোক নামে। এদিক-কার এই দলগুলো আসে মায়াবন্দর থেকে। স্টিম্-বোটে পনেরো-বিশ মাইল দূরে দূরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এক-একটা দল এক-একটা নির্দিষ্ট এলাকার উদ্দেশে পাড়ি দেয়।

এমনি একটা দলের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন কি দুদিন নিবারণ দাসও আসে।

নিবারণ দাসও যুদ্ধ করছে। তারও এই যুদ্ধ পেশা। নেশা। নেশাটাই বড়।

কিন্তু নিবারণ দাস ডুবুরী নয়। শেল-ডাইভার নয়। ওদের সঙ্গে সমুদ্রে ডুবে শেল দু-চারটে তোলে যদি কখনো, শখ করে তোলে। তার অসাধ্য কর্ম নেই এই অন্তর তুষ্টি উপলব্ধি করার জন্য কখনো-সখনো জলে নামে। এই দলের সঙ্গে তার আসার উদ্দেশ্য জানতে পেলে তক্ষুনি শ্রীঘরে নিয়ে পোরা হবে তাকে। কিন্তু জল-পুলিশ জানবে কেমন করে, যারা নিয়ে আসে, নিবারণ দাসকে রক্ষা

করার দায় তাদেরই।

দলের মধ্যে এই দল-ছাড়া লোকটাই একমাত্র বাঙালী। বর্মী আছে, ভিল আছে, কেরলী আছে—অনেক জাত অনেক বর্ণের লোক আছে। কিন্তু সকলের মধ্যে এই একজনের প্রাধান্য চোখে পড়ার মত। না জানলে মনে হবে এই লোকটাই বুঝি দলের সর্দার। সকলের ঘাড় মাথা যেন বিকনো তার কাছে। এই লোকগুলো জীবনের পরোয়া করে না, কিন্তু একটা কিছুর পরোয়া করে…।

স্টিম বোটের এক-ধারে বসে নিবারণ দাস বিড়ি টানছে আর ওদের শেল তোলা দেখছে। ডুবছে ভাসছে, ডুবছে ভাসছে। সবে সকাল এখন। এমনি চলবে আড়াইটে-তিনটে পর্যন্ত।…দেখতে দেখতে স্টিম বোটের একটা ধার শেলের ঢিকে হয়ে গেল। নানা আকারের নানা রকমের শেল। সাত-আট সের ওজনেরও আছে কয়েকটা। শেলের ভিতরের নরম মাংসপিণ্ডের মত জীবগুলো নড়াচড়া করতে থাকে। অভ্যস্ত চোখ না হলে ওই দৃশ্য দেখে গা ঘুলোবে। গরম জলে সেদ্ধ করে ওগুলোকে খোল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হবে। খোলগুলোই দরকার, খোলসগুলো দরকার।

নিবারণের হাসি পায় এক-এক সময়। সে তো বলতে গেলে ভদ্রলোকের ছেলেই ছিল। লেখাপড়াও করেছিল একটু-আধটু। ইস্কুলের উঁচু ক্লাস ছুঁয়েছিল। তাই চেষ্টা করলে ভদ্রলোকের ছেলের মত একটু-আধটু উচ্চাঙ্গের ভাবনাও ভাবতে পারে। ভাবছে, খোলস ছাড়ালে সব কিছুরই অমনি দগদগে বীভৎস মূর্তি। এই যে নিশ্চিন্ত আরামে বসে বসে বিড়ি টানছে আর দেখছে—এও একটা খোলস ছাড়া আর কি। জগৎ-জুড়ে খোলের পুজো আর খোলসের পুজো চলছে। ভিতর দেখছে কে?

নিজের মনেই অস্ফুট একটা অশ্লীল উক্তি করে বিড়িটা জলে ছুঁড়ে মারল নিবারণ দাস। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত মোটা মোজা-জোড়া পরাই ছিল। জুতো জোড়া বদলে তলায় কাঁটা-মারা রাবার-শু পরে নিল। থলেটা কাঁধে ঝোলালো। থলের মধ্যে একটা শক্ত-পোক্ত বড় দড়ি, কাটারি, আর একটা ছোরা। আর কিছু না। এর জন্যে এতবড় থলে দরকার হয় না। দরকার, যে-জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সেই জন্যে।

বোট থেকে গামলা-বয়াটা টেনে জলে নামাল। বয়ার ওপর বসানো গামলার আকারের জিনিসটা। জলে ডোবে না। একজনই বসতে পারে। নিবারণ দাস উঠে বসল তাতে। ডুবুরীদের কেউ কেউ দেখল। অনেকে দেখেও দেখল না। নিবারণ দাস ডাকলে ওদের মধ্যে সাগ্রহে কেউ কেউ ওর সঙ্গ নিতে পারে।

কিন্তু ডাকবে না জানে। কখনো ডাকে না। যে-কাজে যাচ্ছে সে-কাজে নিবারণ দাস দোসর বরদাস্ত করে না।

গোড়ায় গোড়ায় জোর-জুলুম করে কেউ যে সঙ্গ নেয় নি এমন নয়। ওই দ্বীপের ওপর আর পাহাড়ের ওপর আর পাহাড়ের গাছ-গাছড়ার ওপর তো এক-চেটিয়া দখল নয় নিবারণ দাসের। কেউ এলে ঠেকাবে কি করে। এসেছে। ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ওরই মত শেকড লতা পাতা, গাছ-চাঁছা গুঁড়ো ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে। নিবারণ দাস হেসেছে। হেসেই সতর্ক করেছে তাদের। বলেছে, এর অনেক মাপজোক, আরো অনেক কিছুর মিশেল, আর অনেক কিছু হিসেবের ব্যাপার আছে। সে-সব ঠিক না হলে মরবে কিন্তু।

কিন্তু ঠেকে আর ঠকে না শিখলে শিখতে চায় কজন? চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। বলা বাহুল্য সে-চেষ্টার পরিণতি হাস্যকর ব্যর্থতা, ছোটখাটো থেকে বড় দরের অসুখ—এমন কি একটা মৃত্যুও। খুব স্বাভাবিক, কোন্ লতা-পাতা গাছ-গাছড়ায় কি রকমের বিষ আছে কে জানে? নিবারণও জানে না। লোক সঙ্গে থাকলে সে যা কুড়িয়েছে তার সবই মেকী, সবই মিথ্যে। আসল জিনিসের ধার দিয়েও যায় নি কখনো।

তাই দলের সঙ্গীরা হাল ছেড়েই তার সঙ্গ নেওয়া ছেড়েছে। অসুখ আর একটা মৃত্যু দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে রসায়নের গুপ্ত রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা ছেড়েছে।

কাঠের ছোট হাত-বৈঠায় জল ঠেলে নিবারণ দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলল। সামনে ওই পাহাড়ী দ্বীপটাই লক্ষ্য। সমুদ্র ফুঁড়ে বেশ খানিকটা খাড়া পাহাড়ের মত উঠে গেছে দ্বীপটা। তারপর সমতল-ক্ষেত্র, নিবিড় জঙ্গল, গাছ-গাছড়া। বোটটা দ্বীপ ঘুরে অন্যধারে গেলে হয়তো সমুদ্র-লগ্ন অপেক্ষাকৃত সমতলভূমি মিলত। কিন্তু অকারণে অত কেউ ঘুরবে না। আর, তাতে লাভই বা কি, তারপর তো ওকে ছেড়ে বোট নিয়ে এধারে চলে আসবেই ওরা। বোট ছেড়ে অতখানি দূরে পড়ে থাকতে নিবারণ দাস রাজী নয়। আসলে সে এই দুনিয়ায় কাউকেই বিশ্বাস করে না। নিজেকেও না।

পাহাড়ের গায়ে তার বয়া থামল। নিবারণ দাস ওপরের দিকে তাকাল। কোন্ দিকটা ধরে উঠবে ঠিক করে নিল। শেওলা ভরা ওই পিচ্ছিল খাড়া পাথর বেয়ে ওপরে উঠতে হবে. ভাবলেও মাথা ঘুরে যাবার কথা, ত্রাসে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যাবার কথা। কিন্তু নিবারণ দাস পাহাড়ী সরীসৃপের মতই নিশ্চিন্ত মনে ওপরে

উঠে যাবে। পাহাড়ের খাঁজ খুঁজে খুঁজে শিকড় ধরে, ঝুলন্ত ডালে দড়ি আটকে আটকে।

পড়লে মৃত্যু।

সমুদ্র অশান্ত আক্রোশে মুহুর্মুহু এই স্থাবরের তট-বেষ্টনের ওপর আঘাত করছে। আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে চাইছে ওটা। ওর একটা আঘাত গায়ে লাগলে মৃত্যু। পড়লে পতনের ঘায়ে মৃত্যু। এই দ্বীপ পর্যন্ত আসতে গিয়ে বয়া উল্টে জলে পড়লে মৃত্যু—জলের নীচে হাঙর আর সামুদ্রিক সাপ কিল-বিল করছে। অনেকের ধারণা, জলের তলায় ওই সামুদ্রিক দানবেরা ছেয়ে আছে বলেই কালাপানির জল এত কালো। আবার পাহাড় বেয়ে বা গাছ বেয়ে উঠতে গিয়ে একটি সাপ বা একটি কাল-খাজুরার কামড় খেলেও মৃত্যু। একটি দুটি নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে কাল-খাজুরা (বড় আকারের বিচ্ছু) থাকে গাছের ডালে ঝোপে ঝাড়ে। নিবারণ দাসের পা থেকে গলা পর্যন্ত পোশাকের আড়ালে খানিকটা নিরাপদ, কিন্তু বাকিটুকু নিরাপদ নয় বলেই জীবনটাও নয়। তারপর, গভীর জঙ্গলে বন্য শূকরের হাতে পড়লে মৃত্যু, ভীত-ত্রস্ত হরিণের পালের মধ্যে পড়ে গেলেও মৃত্যু।

কিন্তু এতগুলো মৃত্যু ঠেলে আসতে আর ফিরে যেতে একটুও হাত-পা কাঁপবে না নিবারণ দাসের। একবারও বুক কাঁপবে না। কেউ যদি তাকে নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার লোভ দেখিয়ে নিরাপদ কাজের সন্ধান দেয়, সে তা করবে না। দু-দিনে হাঁপ ধরে যাবে, পঙ্গু মনে হবে নিজেকে।

তার থেকে এই যুদ্ধ প্রিয়। এই যুদ্ধ পেশা। নেশা।

পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলে ঢুকে গেল সে। পাঁচ ইন্দ্রিয় সজাগ। এর মধ্যে চোখ দুটো শুধু ওপরের দিকে। তীক্ষ্ণ, শাণিত। বড় বড় গাছগুলোর সামনে এক-এক বার দাঁড়ায়, দেখে, মুখ দিয়ে উৎকট শব্দ বার করে এক-এক বার, গাছগুলোর মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারে—আবার এগোয়। ওই গাছগুলোই লক্ষ্য—চুগলুম, গর্জন, প্যাডক, মার্ব্‌ল-উড···।

বড় একটা গর্জন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে শব্দ করে ঢিল ছুঁড়তেই এক ঝাঁক ছোট পাখি উড়ে পালাল। ব্যস্। আজকের কাজ এইখানে। এইখানেই এসেছে নিবারণ দাস।

পাখিগুলোর গায়ের রঙ ধূসর। আকারে চড়াই পাখির থেকে একটু বড়। নাম আওয়াবিল পাখি। ওদের বাসাগুলিও ছোট ছোট। অনেকটা ডিমের মত দেখতে। সাদাটে।···পাখি নয়, পাখির ডিম নয়, এই বাসাগুলোই বাণিজ্য-

বস্তু নিবারণ দাসের। আওয়াবিল পাখির বাসা। শুধু এগুলোর জন্তেই পায়ে পায়ে মৃত্যুর সঙ্গে যোঝাযুঝি, এত যুদ্ধ আর যুদ্ধের নেশা।

থলেটা কাঁধেই আছে। তরতরিয়ে গাছের ডগায় উঠে গেল। পাখির ঝাঁক উড়তে দেখেই বুঝেছিল বাণিজ্যের পরিমাণ আজ কম হবে না। টপাটপ পাখির বাসাগুলো তুলে তুলে হাতের চাপে সেগুলো গুঁড়িয়ে থলেতে পুরতে লাগল। এই একগাছের বাসাতেই অত বড় থলেটার অর্ধেকের বেশি ভরে গেল। কতক্ষণই বা লাগল নিবারণের—এক ঘণ্টাও নয়। আজ আর অনুসন্ধানের দরকার নেই, অন্ত গাছ চড়াও করার দরকার নেই।

নেমে এসে থলের ওপর দিয়ে পাথরের ঘায়ে জিনিসগুলো আরো বেশ করে গুঁড়িয়ে নিল। দেখলেও কেউ বুঝতে না পারে, চিনতে না পারে। আস্ত দেখলেও চিনবে না কেউ, চট করে ভাবতে পারবে না জিনিসটা কি। তবু সাবধানের মার নেই। তারপর বেছে বেছে কতগুলো লতা-পাতা শিকড় তুলে থলের বাকিটুকু ভরে নিল। ভরে নিল না শুধু, ভিতরের জিনিসগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিল। এরও প্রয়োজন শুধু চোখে ধুলো দেবার জন্য। নইলে এ একটা ঝামেলা। এগুলো থেকে ঝেড়ে ঝুড়ে আবার আসল জিনিসগুলো পরিষ্কার করে উদ্ধার করতে হবে। লতাপাতা শিকড়গুলো জঞ্জাল। সব ফেলে দিতে হবে।

আসল সংগ্রহ এবং একমাত্র সংগ্রহ ওই পাখির বাসা।

নিবারণ দাসের যত মান মর্যাদা প্রতিপত্তি সব এই পাখির বাসার জন্তে।

স্টিম লঞ্চ মায়াবন্দরের দিকে পাড়ি দিয়েছে। শেল ড্রাইভাররা কেউ ঝিমুচ্ছে, কেউ কেউ জুয়া খেলছে। জুয়া এখানে অবকাশ বিনোদনের খেলা। নিবারণ দাসের মুখ দেখলে বোঝা যাবে না তার বাণিজ্য কেমন হয়েছে। দুই-এক জন জিজ্ঞাসা করেছে, মাল কি-রকম পেল। নিবারণ কথা বেশি বলে না। ঠোঁট উল্টে দেয়, নয়তো দুই এক কথায় জবাব দেয়, তেমন কিছু না, মোটামুটি।

থলেটা সামনেই একধারে পড়ে থাকে। ওটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বা ওটা সযত্নে সরিয়ে রাখার মানেই গুরুত্ব বাড়ানো, কৌতূহল বাড়ানো। ওরা জানে এগুলো আসল উপকরণের কিছু কিছু সরঞ্জাম মাত্র। আসল জিনিসটা নিবারণ দাসের মস্তিষ্কজাত। সে ঘরে বসে বানায় সেটা। নিবারণ সেই রকমই বুঝিয়েছে তাদের।

বোটের একপাশে বসে একের পর এক বিড়ি টানছে। মন প্রসন্ন থাকলেও ওতে চাপা পড়ে, তিক্ত থাকলেও। আজ প্রসন্নই। বহু টাকার মাল আছে ওই

থলেটাতে। বহু লোককে বিস্মৃতির গহ্বরে ঠেলে দেবার রসদ আছে। দেশে থাকতে নিবারণ দাস সস্তা নাটক নভেল পড়ত এককালে। ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর বা হতাশার উপমার প্রয়োজনে পাখির বাসা কথাটার ব্যবহার অনেক পেয়েছে। কিন্তু এই পাখির বাসাই যে আবার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা আর এত অর্থ দিতে পারে তা কে জানে ?

নিবারণ দাস জানে। এই জানার তুষ্টিতে কালাপানি পাড়ি দেওয়াও সার্থক মনে হয় তার।

অর্থ উপার্জনের জন্য, মায়াবন্দরে বহু লোকের খাতির আর তোষামোদ কুড়োবার জন্য আর কিছু করতে হয় না তাকে। ওই সব শিকড়-আগাছা লতা-পাতার জঞ্জাল ফেলে দিয়ে কাঠি-কাঠি পাখির বাসায় গুঁড়োগুলো উদ্ধার করতে হবে। সেগুলো আরো একটু গুঁড়ো করে চিনির রস মিশিয়ে আচার শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর দু-তিন রকমের রঙ মিশিয়ে বোতলে বোতলে পুরে ঢাললেই হল। চিনির রস আর রঙ মেশানোটাও চোখে ধুলো দেবার জন্যেই। এ-ব্যাপারে বড় দরের দুর্লভ রসায়নবিদ নয় নিবারণ দাস? খদ্দেররা জানে তিন চার রকমের মাল বানায় নিবারণ দাস। আর সব মালই কড়া মাল। কিন্তু মাল ওই একটাই। শুধু রঙে তফাৎ, দামে তফাৎ।

খদ্দের বেশির ভাগই আসে সন্ধ্যের দিকে, চুপিসাড়ে। এক-একটা মোড়কের জন্যে কি আকুতি তাদের। নিবারণকে হাত পাততে হয় না। টাকা গুঁজে দিয়ে যায় তারা। অনেক দূর থেকেও প্রার্থী আসে, মোটা দক্ষিণা দিয়ে যায়। তবে নেহাত অন্তরঙ্গ চেনা-জানা ছাড়া সরাসরি তার কাছে আসে না কেউ। আসে উবা-স'র মারফত। এই ব্যবসায় তার একমাত্র সঙ্গী উবা-স। বর্মী। যোগ্য সহচর। খদ্দের সংগ্রহ আর দর কষাকষির ব্যাপারে পাকা এবং বিশ্বস্ত। কিন্তু যতই পাকা হোক, বিশ্বস্ত হোক, মাল তৈরির রহস্যটা আজ পর্যন্ত সেও জানে না। খুব আশা, একদিন জানবে। ওস্তাদ এও তাকে হাতে-কলমে শেখাবে একদিন। উবা-স ওস্তাদ মেনেছে নিবারণকে।

তার আশা দেখে নিবারণ মনে মনে হাসে।

কোনো পরব বা উৎসব থাকলে নিবারণের মোড়কের দাম চড়ে। যে-কোনো বড় উৎসব। হিন্দুর হোক, মুসলমানের হোক, বর্মীর হোক বা যারই হোক। উৎসবের আনন্দ এখানে সকলেরই। আনন্দটাই উপলক্ষ, উৎসব কিছু নয়। এই মোড়কের প্রতিক্রিয়া তখন চোখের ওপরেই কত দেখে ঠিক নেই। পুলিশ চড়াও না হলে এই নেশার জন্যে মস্ত একটা দালান তুলে দিতেও আপত্তি ছিল না

নিবারণের। উপকরণ আর বিশেষ কিছু লাগে না। দুধের সঙ্গে অথবা দুধের অভাবে চায়ের সঙ্গে ওই মোড়কের পদার্থ ফুটিয়ে নাও বেশ করে। তারপর ঘুমের জন্যে প্রস্তুত হয়ে সেই তরল পদার্থ জঠরে চালান করে দাও। তারপর খানিক বসে থাক চুপচাপ—জিনিসটা পাকস্থলীতে গিয়ে কাজ শুরু করুক। বেশিক্ষণ বসতে হবে না, খানিক বাদেই শুতে ইচ্ছে করবে। কারণ ক্রমশই দেহের ওজন কমছে মনে হবে। শুয়ে থাকতে থাকতে মনে হবে, দেহটা একবার কড়ি বরগায়, একবার বাতাসে, শেষে ঘর ছেড়ে অনন্ত শূন্যের মধ্যে দিব্যি সাঁতরে বেড়াচ্ছে।

তারপর ঘুম।

এই ঘুম, অর্থাৎ, এই নেশা পাঁচ-ছদিন পর্যন্ত জিইয়ে রাখা যেতে পারে। নেশা করার আগে অল্পবয়সী ছোকরা মজুত রাখতে হয়। মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে দেবে গায়ে, সেই অচৈতন্য অবস্থায় হাঁ করিয়ে চিনির জল ঢেলে দেবে মুখে। গায়ে জলের ছিটে পড়লে আর পেটে চিনির জল গেলে নেশা জমাট বেঁধে যায় একেবারে। লালন করতে জানলে সাত-আট দিন পর্যন্ত বিস্মৃতির অতলে ডুবে থাকা যেতে পারে। এই কটা দিন আর আহারের তাগিদ নেই, ইন্দ্রিয়ের তাড়না নেই, শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণা কি-চ্ছু নেই। হৃদ্‌যন্ত্রটা চলবে শুধু, দেহযন্ত্রের আর সব কিছুর নিঃসীম ছুটি। আওয়াবিল পাখির লালা-সিক্ত এক-একটা বাসা এই সাময়িক মৃত্যুর রসদ যোগায়।

মৃত্যু কেউ চায় না। কিন্তু এই নিটোল সাময়িক মৃত্যুর প্রতি লোভ এখানকার বহু লোকের। এখানকার বলতে এই মায়াবন্দরের। এই নেশার ব্যবসা জমিয়ে তোলার মত এমন জায়গা সমস্ত কালাপানিতে আর বোধহয় দ্বিতীয় নেই। পৃথিবীর মধ্যে নামকরা কাঠের শিল্পকেন্দ্র এই মায়াবন্দর। কাঠের কারবারের দরুন বিস্তৃত গোটা দ্বীপটাই শিল্পনগর হয়ে উঠেছে। তাই এই বিশাল দ্বীপ জুড়েও সংগ্রামী মানুষেরই বসতি। এ ছাড়া সরকারী জঙ্গলের কাজে উপযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়। শেল-ফিসার শেল-ডাইভার, জেলে বন্দরের কর্মী, ছোটখাটো ব্যবসায়ী—সব মিলিয়ে নানা জাতের নানা ধর্মের নানা বর্ণের মানুষের চাপের ভার এই একটা দ্বীপের ওপর।

আর, নিবারণের ধারণা, শুধু শেল ডাইভাররা নয়, চারদিকে লবণাক্ত সমুদ্র-ঘেরা এই দ্বীপের প্রায় সকল মানুষই সর্বদা মৃত্যুর সঙ্গে অল্পবিস্তর যুঝছে, যুদ্ধ করছে। তাই নেশা জিনিসটার এত কদর এখানে। সাময়িক মৃত্যুর প্রতি এত লোভ। এই মৃত্যু চড়া মাশুলে কেনে তারা। নিবারণও তো প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েই এই অভিনব মৃত্যুর রসদ সংগ্রহ করে। চড়া মাশুল না পেলে সে

এমন মৃত্যু বেচবে কেন ? এত ঝুঁকি নেবে কেন ?

কিন্তু এভাবে ভাবে যখন নিবারণ দাস নিজেকেই ভোলায়। টাকা রোজগার করাটাই একমাত্র আকর্ষণ নয় এখন। টাকা অনেক রোজগার করেছে। খরচও কম করে না, তবু যা আছে সেই টাকা একসঙ্গে কখনো চোখে দেখবে বলেও কল্পনা করে নি। সব গুছিয়ে নিয়ে সাগরপাড়ি দিয়ে দেশে চলে যেতে পারে। পায়ের ওপর পা তুলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যাবার কথা একটা বার ভাবেও না নিবারণ দাস। অথচ তার এই মারাত্মক মাদক-দ্রব্য ব্যবসার ব্যাপারটা হাতে-নাতে ধরা পড়লে রক্ষা নেই। মৃত্যু-তুল্য নেশা বিক্রির অপরাধও মারাত্মক বৈকি। হয়তো বাকি জীবনটাই জেলে পচে মরতে হবে। টাকাপয়সা সব যাবে—সব নিরর্থক হবে। মায়াবন্দর বলেই ধরা পড়ছে না। অবশ্য এ ব্যাপারে সদা সজাগ সে, কোন রকম ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে মাথা গলায় না। তবু, অন্য কোথাও হলে পার পেত না বোধ হয়। কিন্তু মায়াবন্দর বিচিত্র জায়গা। মানুষ এখানে নিজের খোলসের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। কারো সঙ্গে কারো যোগ নেই। তাই জোরও নেই। ভিতরে ভিতরে সকলেই অসহায় প্রায়। কার সঙ্গে কে লাগতে যাবে ? খোলসের ওধারে কোন্ মূর্তিটা খাঁটি ?

তাহলেও আইন তো আছে। কানুন আছে। বিচার আছে। শাস্তি আছে। বিপদ যে-কোন মুহূর্তে যে-কোনো দিক দিয়ে আসতে পারে। শুধু জীবিকা সংস্থানের জন্যে হলে এমন অসম্ভব ঝুঁকি নেয় কে ? সংস্থান তো হয়েইছে। নিবারণ দাস তল্পি-তল্পা গোটায় না কেন ?

গোটায় না কারণ, এই নেশা করানোটাও বোধহয় এক তাজ্জব নেশা নিবারণ দাসের। সে নেশা করে না। নেশা দেখে। দেখে দেখেই নেশা ধরে তার ! তাছাড়া লোকের তোয়াজের নেশাও আছে। প্রতিপত্তির নেশা আছে। এখানে কত লোক যে ওর কথায় ওঠে বসে ঠিক নেই। দেশে যাবে কেন নিবারণ দাস ? কোন্ লোভে যাবে ? কোন্ টানে ? তার থেকে এই ভালো। ধমনীতে রক্ত নাচে এখানে, মনটাকে রসাতল পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনার অবাধ স্বাধীনতা। ধরা পড়লে পড়বে, জেল হয় হবে, সব যায় যাবে। একটানা আটটা বছর তো জেলে কাটিয়ে দিয়েছে। উনত্রিশ থেকে সাঁইতিরিশ পর্যন্ত। কালাপানির ওই জেলে, যার নাম শুনলে সুস্থ মানুষ ঘুমের মধ্যেও আঁতকে ওঠে। ওই জেল তো উঠে গেছে, এখন জেলে পুরতে হলেই বরং সাগর পেরিয়ে লোকালয়ে নিয়ে যেতে হবে। আবার না-হয় বাকি জীবনটাও নির্বিবাদে জেলেই কেটে যাবে। মৃত্যু বেচার মাশুল দেবে। নিবারণ দাস পরোয়া করে না। তবে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে

দুর্দৈব যেন না আসে। সকল দিকে আঁটঘাট বাঁধা তার।

নিবারণের বয়েস এখন একচল্লিশ। আজ প্রায় চার বছর এই ব্যবসা করছে। বলতে গেলে জেল থেকে বেরুবার মাস দুই পর থেকেই। জেল থেকে বেরিয়ে মাস দুইয়েক মায়াবন্দরে জঙ্গলের কাজ করেছিল। সেও এক দুঃসহ দাসত্ব। সেই দুমাসের স্মৃতি নিবারণ দাস আজও ভোলে নি।

এই নেশার ইতিবৃত্ত জেলে থাকতে এক বৃদ্ধ কয়েদীর মুখে শুনেছিল সে। লোকটার সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল খুব। কেন হয়েছিল সে বলতে পারে না। নাম ডুংডুং। দক্ষিণ ভারতের লোক। ছেলেবেলায় দেশ ছেড়ে দ্বীপে শহর গড়ার কাজে এসেছিল। ও বলত ওকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে আনা হয়েছিল। পাগলের কথা কেউ শুনত না, কেউ শুনতে চাইত না।

নিবারণের মধ্যে নীরব সহিষ্ণু শ্রোতা পেয়েছিল সে। সেই কারণেই অন্তরঙ্গতা বোধ হয়। অনেক মনের কথা আর মর্মের কথা ব্যক্ত করত নিবারণের কাছে। মাঝ-বয়সে জঙ্গলের কাজ করত ডুংডুং। পাখির বাসার নেশাটা তখন আবিষ্কার করেছিল সে। বুঝেশুনে চললে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু মাঝখান থেকে নিজেই সে নেশাখোর হয়ে বসল। ডুংডুংয়ের উপদেশ, নেশা-কারবারীর নেশা করতে নেই। সে নেশা করত বলেই এই নেশার ব্যাপারটা দু-পাঁচ জনের কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ওর সঙ্গে। সে-ই আর কয়েকজনকে বলে দিয়ে টাকা রোজগারের ফিকিরে ছিল। পাখির বাসা কোথায় পাওয়া যায়, হাতে-নাতে দেখিয়ে না দিলে আর চিনিয়ে না দিলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়েছিল। সেই জন্যেই রাগের মাথায় একেবারে খুন করে বসেছিল ডুংডুং। খুন করে ধরা পড়েছে। ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে জেল খাটতে এসেছে।

কিন্তু কিছুকাল না যেতে লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল। ডুংডুং নিজেই বলত তার মাথা খারাপ। বলত, নেশা বন্ধ হয়ে গেল বলেই মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। বলত, মাসের মধ্যে কটা দিন আর চোখ মেলে থাকত, এক মাসে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সে। সেই নেশা বন্ধ হলে নিজের মাথা নিজে চিবুতে ইচ্ছে করে কি না? তাই চিবুচ্ছে এখন।

ইংরেজ শাসনের সেই ভয়াবহ জেলে পাগল কয়েদী রাখারও ব্যবস্থা ছিল একটা। কারণটা সহজ অনুমানসাপেক্ষ। মনে হয়, সেদিনের সেই হাড়পাঁজর গুঁড়নো নিদারুণ শাসনে আর নিষ্পেষণে আর ভয়ে আর হতাশায় অনেক

আসামীরই মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিত। তাই ব্যবস্থাও ছিল।

ভয়াবহ পাগল ছিল না ডুংডুং। কাজ করত, পাগলামিও করত। তাই গারদে আটকে রাখতে হত না তাকে। বাইরে থাকতে পেত। নিবারণও মাত্র বছরটাক জেলের সেই নীরন্ধ্র গারদের মধ্যে কাটিয়েছে। তারপর বাইরে থাকতে পেয়েছে। বাইরে থাকা মানেই খালাস পাওয়া নয়। বাইরে কয়েদী হয়েই থাকা, জেলের হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটা। কয়েদীর ব্যবহার ঠাণ্ডা ভদ্র এবং ভাল হলে এই সুবিধেটুকু মিলত। দ্বীপ থেকে পালাবে কোথায় ? চার দিকে আকাশ-ছোঁয়া কালাপানি। জলে নামলে হাঙরে ছিঁড়ে খাবে। অন্যভাবে পালাতে চেষ্টা করলেও ধরা শেষ পর্যন্ত পড়তেই হবে। তখন সোজাসুজি ফাঁসির দড়ি। তাই বাইরে থাকলেও আত্মঘাতী বেপরোয়া না হলে পালাবার কথা কেউ ভাবত না।

ডুংডুং প্রায়ই নিবারণের কাছে এসে বসত। অনর্গল বকত। তার অনেক কানে যেত, অনেক আবার যেতও না। শেষের দিকে ডুংডুংয়ের ভারী অসুখ হল একটা। সময় ঘনিয়েছে এটা সেও বুঝেছিল বোধ হয়। চোখ বোজার আগে নিবারণের একটু উপকার করার সাধ হয়েছিল তার। তখন এই পাখির বাসা কোথায় মিলতে পারে, কি-রকম দেখতে বাসাগুলো, কি করে কত মাত্রায় ব্যবহার করতে হয়, ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য তার কানে দিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু নিবারণ তখনো একটুও গুরুত্ব দেয় নি সেই কথায়। আর পাঁচটা কথা যেমন শোনে তেমনি শুনেছিল। ডুংডুং বার বার সতর্ক করেছিল, সাবধান, নিজে ওই নেশা করবি না—তাহলে আমার দশা হবে। আর, গোপন রাখবি, দেখবি লোকে এসে তোর পায়ে টাকা ঢেলে দিয়ে যাবে।

তাই দিচ্ছে। কিন্তু সেদিন কি নিবারণ একবারও ভেবেছিল সত্যিই এই দিন আসবে। ভাবে নি। এই শাস্তির মেয়াদ শেষ করে সে জীবিত থাকবে কিনা তাই সন্দেহ ছিল। এর পরেও ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার জাল বুনতে একমাত্র পাগলেই পারে।

নিবারণ দাসও খুনের দায়েই এই দ্বীপান্তরে চালান হয়ে এসেছিল।

ছোরা যার বুকে বিঁধিয়েছিল সেই লোকটা একেবারে মরে যায় নি। শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচেছিল। কিন্তু সেই লোকটাকে আদৌ মারতে চায় নি নিবারণ দাস। মারতে চেয়েছিল আর একজনকে। অথচ বাধা পেয়ে মেরে যাকে বসেছিল সে ছেলেবেলা থেকে নিতান্ত প্রিয়জন তার। ফলে বিচারে দুটো অপরাধ প্রতিপন্ন হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। একটা হত্যার উদ্দেশ্য, আর একটা সেই উদ্দেশ্য

ব্যাহত করার ফলে একজন নির্দোষীকে ছুরিকাঘাত করা। দুটোই সত্যি। বাধা না পেলে নিহত একজন হতই।

বর্তমান প্রসঙ্গে পিছনের সেই অধ্যায়টিও বিশেষভাবে জড়িত।

॥ দুই ॥

কাহিনীটি মামুলি। বংশগত সরিকানা বিদ্বেষের এক মর্মান্তিক নিষ্পত্তি।

ছ মাসের মধ্যে নিবারণের বাপ-খুড়ো দুজনেই চোখ বুঝতে সরিকানার মামলা শেষ হয়েছিল। খুড়োব মস্ত অবস্থা ছিল। যুদ্ধের বাজারে তাঁর সুতোর কারবারটি বাতারাতি ফেঁপে উঠেছিল। মাত্র কটি বছরের মধ্যে শুধু ছেলের নয়, পর পর কয়েক পুরুষেব জাহান্নমে যাবার রাস্তা প্রশস্ত করে দিয়ে সে চোখ বুজেছে। ছেলেটি তার বাপের জীবদ্দশাতেই সেই রাস্তায় বিচরণ করছিল।

ওই তরুণ বয়সেই নিবারণের প্রায়ই ইচ্ছে হত, চুপিসাড়ে কাকাকে একদিন খতম করে আসে। পরবর্তী কালে কাকাকে নয়, খুড়তুতো ভাইটিকে খতম করার জন্যে হাত নিশপিশ করত তার। ছেলেবেলা থেকেই যেমন একরোখা তেমনি রাগী ছিল নিবারণ। কারণে অকারণে প্রায় সমবয়সী খুড়তুতো ভাইকে মারধরও কম করে নি। করে বাড়িতে বাবার কাছে দারুণ পিটুনিও খেয়েছে।

বয়েসকালে নগেন দাস, অর্থাৎ, খুড়তুতো ভাইটি সর্বগুণের অধিকারী হয়েছে। বয়স্থা মেয়ে-বউরা ভোর-রাতে অথবা সাঁঝের আঁধারে ছাড়া দিন দুপুরে ঘাটে যেতেও ভয় পেত। আর সম্পত্তি হাতে আসার পর তো আলাদা ছোট্ট একটা বাগানবাড়িই হয়েছে নগেনের।

পৈতৃক ভিটে, একটা পুকুর আর সামান্য কিছু জমি-জমা ছাড়া আর কিছু ছিল না নিবারণের। কায়ক্লেশে দিন চলার মত। এমন লোকের তেজ খর্ব করতে না পারাটা ভারী অপমানকর মনে হত নগেন দাসের। মোসাহেবরা চিরাচরিতভাবেই ক্ষোভের ইন্ধন যোগাত।

না, নিবারণ দাসের আরো কিছু ছিল। ঘরে বউ ছিল। পাড়ায় তার রূপের না হোক, লক্ষ্মীশ্রীর খ্যাতি ছিল। গরীব ঘরের মেয়ে। গরীবের ঘরেই এসেছে। লোকের বলার মত বাড়তি কিছু থাকাটা অনেকের চোখে বাড়াবাড়ি। অন্তত নগেন দাসের চোখে বাড়াবাড়ি। বউকে সে-ও দেখেছে। সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে আনা-গোনাটা একেবারে বন্ধ হয়নি তখনো। নিবারণ না যাক, নগেন আসত। বিয়েতেও এসেছিল। এমন কিছু রূপসী নয়। রূপসী সে দুচারটে

বিশেষভাবেই দেখেছে। তার ঘরের স্ত্রীটিও কম রূপসী নয়। তবে এনার শ্রীটুকু মন্দ নয় বটে। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে করে। লক্ষ্মীশ্রী কাকে বলে নগেন দাস অত জানে না, তবে দেখতে ভালই লাগে, বেশ মিষ্টি লাগে। না হাসলেও মনে হয় ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মত লেগে আছে। এক নজর দেখলেই নগেন দাস অনেকটা দেখে নিতে পারে।

বউটি নিবারণের থেকে বেশ ছোট। চোদ্দ বছর বয়সে এসেছিল, এখন বছর আঠেরো বয়স। নিবারণের আটাশ। বউ নিবারণকে ভাল কতখানি বাসত সেই প্রশ্ন কখনো ওঠে নি। কিন্তু ভয় যে করত, সেটা বেশ বোঝা যেত। নিজের জন্তে ভয় নয়, কখন কি করে বসে সেই ভয়। তরতরিয়ে তাকে নারকেল গাছে তাল গাছে উঠে যেতে দেখে ভয়ে বুক কাঁপত, রেষারিষি করে পুকুরে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দেখে ভয় পেত, রেগে গেলে লোককে যা-তা গালাগাল করতে শুনেও ভয় ধরত। ছিপছিপে লম্বা লোকটার গায়ে শক্তি যত না তার থেকে সাহস ঢের বেশি, আর তার থেকেও ঢের ঢের বেশি জেদ আর রাগ। দু-চারটে ছোটখাটো রাগারাগি মারামারি ব্যাপার বউ নিজের চোখেও দেখেছে।

নিবারণের দিক থেকে বলতে গেলে সে বিয়ের আগে যা ছিল, বিয়ের পরেও প্রায় তাই-ই। বিয়ে একটা করা দরকার, করেছে। তার বেশি কিছু নয়। লোকে বলে বেশ বউ—ভালই। ভালো-মন্দ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় নি সে। গান-বাজনার দিকে ঝোঁক ছিল তার, তাস খেলত, দাবা খেলত। বাবা মায় যাবার পর বাড়িতেই আড্ডা বসত। বছরান্তে নাটক রিহার্সাল হত যখন, পিছনের জানালার ওধারে সকৌতুকে বউটির মুখখানা উঁকিঝুঁকি দিতে দেখা যেত।

মামলা মিটে যাবার পর এই আড্ডায় মাঝে মধ্যে আসা শুরু করেছিল নগেন দাস। তার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট নয় কারো কাছে, কিন্তু তার অন্তরঙ্গ আবির্ভাবে সকলেই অস্বস্তি অনুভব করেছে। কিন্তু নিবারণ কৌতুক অনুভব করেছে, দেখাই যাক না—হয়তো এবারে ওর কাল ঘনিয়েছে। নগেন দাস নতুন হারমোনিয়াম বাঁয়া-তবলা এমন কি একটা তানপুরাও কিনে দিতে চেয়েছে। তাতেও কারো আগ্রহ না দেখে মনে মনে চটেছে।

দুই-এক দান তাস খেলে বা এক হাত দাবা খেলে হাই তুলে নগেন বলত, বউঠানের সঙ্গে একটু কথা-বার্তা কইগে যাই—

সামনাসামনি কিছু একটা মনোমালিন্যের কারণ ঘটুক, তাই হয়তো চেয়েছিল নগেন দাস। তাকে আড্ডায় আসতে নিষেধ করলেও রেষারেষি জমাট বেঁধে উঠতে পারত। সে-রকম হল না বলেই অন্দরমহলে পা বাড়িয়ে মজা দেখতে

চাইল। কিন্তু নিবারণ তাতেও নির্লিপ্ত। মজা বরং সেই দেখাচ্ছে। নিজের ঘরে বসে ভয় বা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই তার।…বাড়ুক। এতটুকু অশোভন আচরণের আঁচ পেলেও নিবারণ খুশি হবে।

তার অন্দরমহলে ঢোকায় আপত্তি বউয়ের। কিন্তু সোরগোল তুলে আপত্তিও করতে জানে না সে। শুধু বলেছে, উনি ভিতরে আসেন কেন…।

নিবারণের দু চোখ ধারালো হয়ে উঠেছে, কেন, কি বলে?

বউ নিরুত্তর।

নিবারণ আগ্রহ চেপে হাসিমুখেই অভয় দিতে চেষ্টা করেছে তাকে। রসিকতা করে বলেছে, চেহারাখানা তো আমার তুলনায় কার্তিক, পছন্দ হল না? বউয়ের রাগ দেখে হেসেছে, তারপর সোজা-সুজি বলেছে, ভিতরে আসে তোমাকে দেখবার লোভে, কি হয়েছে বল না?

বউ মাথা নেড়েছে শুধু। অর্থাৎ, কিছু হয় নি। তারপর বলেছে, আমার ভাল লাগে না।

বউকে এখনো ছেলেমানুষই ভাবে নিবারণ, তার ভাল লাগা না লাগার ধার ধারে না। কিন্তু এ ব্যাপারে তার ভিন্ন রকমের আগ্রহ। নগেন এসে কি বলে না বলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। শুনেছেও। খারাপ কিছু বলে না। ছেলের গল্প করে, নিজের বউয়ের গল্প করে, বউঠানের হাতের রান্না কখনো খেল না সেই অনুযোগ করে। এর থেকে ত্রুটি ধরার কিছু নেই। কিন্তু কথাই যে সব নয় এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি নিবারণের আছে।

নগেনকে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়াটা ঠিক নয় সেটা তার মনে হল। নিজের ঘর নিয়ে ব্যাপার, গণ্ডগোল বা ঝগড়া বিবাদ করতে গেলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবেই, পাঁচ রকম রটবেই। সামনাসামনি তাকে অপমান করার লোভ ছেড়ে একান্তে ডেকে নিষেধ করে দেবে ভাবল। বলবে, বউ পছন্দ করে না।

কিন্তু সামনাসামনি অপমান করার মতই সুযোগ এল একটা। আড্ডায় দিন কতকের অনুপস্থিতির পর জানা গেল, তার বাগানবাড়িতে কলকাতা থেকে নতুন মেয়েমানুষের আমদানি হয়েছে। ভদ্রঘরের ডানাকাটা পরী নাকি। কলকাতা থেকে মদের পেটি আসত এতদিন—এবারে একধাপ উন্নতি।

এসব রটনা মিথ্যে হয় না বড়। এরপর নগেন দাস একদিন আড্ডায় আসতে নিবারণ সকলের সামনে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, তার মত লোক কোন ভদ্র-লোকের বাড়িতে ঢোকে সেটা কারো কাম্য নয়, অতএব সে যেন আর এ মুখো না হয়। নগেন দাস হাসিমুখেই চলে গেছে।

কিন্তু ... শত্রু-সংখ্যা নিবারণের অনেকগুণ বেশি। ক্রমশ একটা কানাকানি স্পষ্ট এবং পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। নিবারণের ঘরে লীলার ব্যাপারটা ভালই চলেছে। মাঝখান থেকে আত্মীয়টিকেই বরদাস্ত সে করল না শুধু। কি করে করবে, চক্ষুলজ্জা আছে না! নিবারণের বাপের দুই-এক জন বন্ধু উপদেশ দিয়ে গেল, এসব আড্ডা-টাড্ডা বাড়িতে কেন বাবা, বাইরের ছেলে-ছোকরাদের অত বাড়িতে এনো না, ওতে নিন্দে হয়—।

নিন্দে যা হবার হয়েছে। নিবারণ ঘরের আড্ডাটা দিনকে দিন আরো জাঁকিয়ে তুলতে লাগল। আর মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকল। বোঝাপড়ার সময় আসছে।

মাস ছয়েক পরে। নিবারণ ছোটখাট একটা ব্যবসার কথা ভাবছিল। হাঁস মুরগী ছাগল পুষবে। পুকুরধারের লাগোয়া জমিটা পরিষ্কার করে বেড়া লাগানো শুরু করেছিল। ঘোরাঘুরি করে এ-ব্যাপারে অনেক কিছু জেনেওছে। কিন্তু কাজ শুরু করার আগেই নগেনের পরিহাস কানে এল তার। কানে দেবার লোক এসব ক্ষেত্রে সর্বত্রই থাকে। ব্যবসা করবে শুনে সে নাকি অবাক হয়েছে।—মূলধন পাবে কোথায়? ব্যবসায় যে মূলধন লাগে! তারপর নিজের বোকামি দেখে নিজেই হেসেছে, মূলধন যে ঘরেই আছে তার মনে ছিল না, বেশ ভাল মূলধন আছে—বাইরে থেকেও শাঁসালো লোক আড্ডায় আসছে আজকাল, মূলধনের অভাব হবার কথা নয় বটে।

নিবারণ দাসের মাথায় আগুন জ্বলেছে। আর কেউ না বুঝুক বউ বুঝেছে। সে মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারে নাকি। নিবারণকেই বলেছে। বলে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেছে তাকে। আর ধমক খেয়ে মরেছে। নগেন দাসের শত্রু-সংখ্যা খুব কম নয়। এই কটা মাসের মধ্যেই তার মুখোশ একেবারে খুলে গেছে যেন। দুঃস্থ গৃহস্থ ঘরেও এখন তার লোক হানা দিতে শুরু করেছে, অল্প-বয়সী সুশ্রী গলগ্রহ বিধবা মেয়েদের দাদা কাকার কাছে টাকার টোপ পড়ছে। তার ওপর একেবারে এ-জায়গায় না হোক, অন্যান্য জায়গা থেকে শিকার একটি দুটি তার বাগানবাড়িতে আসছে। রাতের আঁধারে আসে, দু-পাঁচ দিন থাকে, আবার চলে যায়।

মিথ্যেও বার বার শুনলে সত্যের ছায়া ফেলে। নিবারণের মনে হয়, যারা ভাল জানে না তাকে মনে মনে তারা হয়তো সন্দেহ করে এর মধ্যে কিছু সত্য আছে। কেউ কেউ যেন এড়িয়েও চলতে চায় তাকে। বাপের বন্ধুরা তো স্পষ্টই বিরূপ।…নিবারণ ভাবে, মাঝরাতে উঠে গিয়ে একবারে একদিন সব শেষ

করে এলেই হয়। কথায় কথায় যশোবন্তর কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধের ব্যাপারটা সব জেনেও নিয়েছে।

যশোবন্ত ওই বাড়ির দরোয়ান। প্রায় বৃদ্ধ এখন। ছেলেবেলায় নিবারণ তার ঘাড়ে কাঁধে চড়েছে, তরুণ বয়সে কুস্তি লড়েছে তার সঙ্গে। এখনো গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখে যশোবন্ত। কিন্তু এই নয়া মালিকটিকে সে ঘৃণা করে মনে মনে। নিবারণের বাবার ওকে রাখার সঙ্গতি ছিল না বলে অন্য তরফে গিয়ে থাকতে হয়েছে তাকে। বিশ্বস্ত লোকের দরকার ছিল বলেই খুড়ো তাকে মোটা মাইনের বহাল রেখেছিল। তার পরেও আছে কারণ, তার মাইনে ক্রমশ বেড়েছে বৈ কমে নি। আর আছে মায়া পড়ে গেছে বলে, নিমক খেয়েছে বলে।

মনে মনে এখনো নিবারণকেই পছন্দ তার। নিবারণের বউকে ডাকে বউরাণী। ফাঁক পেলে আসে এখানে, আব্দার ধরে এটা সেটা খেতে চায়। নিবারণের বউয়ের সঙ্গী নেই, যশোবন্ত এলে সে ভারী খুশি হয়। গল্প-সল্প করে।

এই যশোবন্তই সখেদে বর্তমান মনিবের হালচাল জানিয়েছে নিবারণকে। রাতে বাড়িতে আজকাল থাকেই না প্রায়। বাগানবাড়িতে থাকে। মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে সেখানে। মালিকের সঙ্গীসাথীরাও। এমন কি সেখানকার চাকর-বাকরও। খানা-পিনার পর বাবুরা বেহুঁশ হলে ওরা মজা লোটে। মালিক ওখানকারই দরোয়ান করে রাখতে চেয়েছিল যশোবন্তকে। কারণ, তার থেকে বিশ্বাসী আর কে আছে? কিন্তু সেখানকার নরকের হাল দেখে যশোবন্ত পালিয়ে এসেছে; সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ওখানে থাকার জন্যে জোর করলে কাজে ইস্তফা দিয়ে সে দেশে চলে যাবে।

সেখানকার সমাচার নিবারণ শুধু যশোবন্তর কাছ থেকেই নয়, অন্যের মুখেও কিছু কিছু শুনেছে। যাদের কাছে শুনেছে, পারলে তারাও চরম প্রতিশোধ নেয় নগেনের ওপর।...নিবারণ ভাবে, তাকে কেউ সন্দেহ করবে না। প্রত্যক্ষ শত্রু সে নয়। প্রত্যক্ষ শত্রু নগেনের অনেক আছে। সন্দেহটা পাঁচজনের ওপর পাঁচ দিকে চাড়িয়ে যাবে।

বউ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি ভাবো আজকাল?

কেন? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় নিবারণ।

আমার ভাল লাগে না। ভয় করে।

কেন ভাল লাগে না? কিসের ভয়?

বউ জবাব দিতে পারে না। নিবারণ তাতেও বিরক্ত হয়। বউয়ের ওপর আজকাল অনেক তুচ্ছ কারণেও বিরক্ত হয় সে। নিজেও বোঝে সেটা, তবু

বিরক্ত হয়।

মানুষকে জব্দ করার চেষ্টাটাও একটা জোরালো নেশা বোধহয়। বাধা না পেলে সব নেশার মত এই নেশাও দিনকে দিন বাড়েই। নগেন দাসও চূড়ান্ত বাড়াই বাড়ল একদিন।

দুপুরের নিরিবিলিতে সেদিন কুৎসিত-দর্শন দুটি জোয়ান গোছের লোক এসে হাজির নিবারণের কাছে। তাদের বেশভূষা ভদ্রলোকের মতই। নিবারণকে বাইরে ডেকে নিয়ে চুপিচুপি জানাল, নগেনবাবুর কাছ থেকে ভরসা পেয়ে আসছে। কোনো এক নামকরা বড়লোকের জন্যে একটি ভদ্র গৃহস্থ ঘরের রূপসী মেয়ের সন্ধানে আছে তারা। নগেনবাবু আভাস দিয়েছে, নিবারণবাবুর হাতে এরকম মেয়ে আছে নাকি। অতএব যোগাযোগ হলে নিবারণবাবুরও ভাল লাভের সম্ভাবনা।

জবাব দেবার জন্যে নিবারণের শরীরের সব রক্ত তক্ষুনি মাথায় উঠেছিল। কিন্তু কি করে দমন করল নিজেকে, সেই জানে। ঘা ওপড়াতে হলে জবাব এদের দেবে না সে। এবারে সময় হয়েছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার এখন। দু কথায় তাদের বিদায় করে দিল।

ঠিক এর দু দিনের মধ্যে তার কাছে দালাল ঘোরাঘুরির খবরটাও রটে গেল কেমন করে। রটনার উদ্দেশ্যেই সাজানো সমস্ত ব্যাপারটা।

এরপর প্রতীক্ষা। সময়ের প্রতীক্ষা। সুযোগেব প্রতীক্ষা। কোন প্রতিক্রিয়ার আভাসও যাতে না পায় কেউ সেই প্রতীক্ষা! কিন্তু ঘবে যে খরদৃষ্টি রেখেছে কেউ তার ওপর সেটা লক্ষ্য করে নি। বউয়ের অস্তিত্ব নিবারণ ভুলেই গিয়েছিল। একজনের প্রতিমুহূর্তের স্তব্ধতা যে আর একজনের বুকের ওপর চেপে বসছিল তাও জানে না।

তিন সপ্তাহ কেটেছে এই করে। শেষের দু দিন নিবারণ একটি কথাও বলে নি কাবো সঙ্গে। ঘর থেকে বেরোয় নি। সঙ্গীরা খোঁজ নিতে এসে জেনে গেছে তার জ্বর হয়েছে।

ঠিক দুদিন বাদে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে আচমকা ত্রাসে বউ উঠে বসেছে। শয্যার আব এক ধার খালি। গত দুদিন ধরে বলতে গেলে বউটির সমস্ত রাতই বিনিদ্র কেটেছে।

বাগানবাড়িতে নিবারণ ধরা পড়েছে। ছোরাটা বুকে বসানোর আগেই। ঘুমন্ত পুরীতে হঠাৎ এভাবে কেউ জাপটে ধরতে পারে ভাবে নি। যে জাপটে ধরে-

ছিল তাকে, সে নিঃশব্দেই তাকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছিল। সে যশোবন্ত। কিন্তু এভাবে উদ্দেশ্য পণ্ড হওয়াতে বিকারগ্রস্তের মত জলন্ত আক্রোশে ঘুমন্ত বাড়িটা নিবারণই জাগিয়ে দিয়েছে। মারামারি ধস্তাধস্তি গালিগালাজ করে নিজেকে ছাড়িয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ওই ছুরি নগেনের বুকে বসাতে। না পেরে শেষে যশোবন্তকেই মারাত্মক আঘাত করে বসেছে।

তারপরে স্তব্ধ নিবারণ নিজেই।

এত সব ঘটে যেতে পাঁচ মিনিটও লাগে নি। ইতিমধ্যে ঘরের আর বাইরের অধিবাসীরা নিবারণকে জাপটাজাপটি করে ধরে ফেলেছে। যশোবন্ত রক্তে ভাসছে।

তারপর থানা পুলিস। দেখা গেল নগেন দাস অনেক আগেই নিবারণের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরী করে রেখেছিল। লিখিয়ে রেখেছিল, এই লোকের দ্বারা তার বিপদগ্রস্ত হবার আশঙ্কা। তারপর বিচার। বিচারের জেরার সময় নিবারণ জেনেছে কেমন করে যশোবন্ত তার উদ্দেশ্য পণ্ড করেছে, কে তাকে সতর্ক করে পাঠিয়েছিল। তার বউ। ঘটনার দুদিন আগেই সে যশোবন্তকে গোপনে ডেকে সর্বদা সজাগ থাকতে বলেছে। বলেছে কিছু একটা ঘটবে হয়তো। তার দুই হাত ধরে কাতর অনুনয় করেছে, কোনরকম খুন খারাপি না হয় দেখো।

যশোবন্ত আশ্বাস দিয়েছিল দেখবে। দেখেছে।

নিবারণ কঠিন, পাথর।

বউকে কোর্টে টেনে আনা হয়েছে যখন, তখনো। জেরার জবাব দিতে হয়েছে বউকে, নিবারণ শুনেছে—তখনো। জেরা—কি দেখে তার সন্দেহ হল স্বামী এ রকম কিছু করে বসতে পারে? বউ জবাব দিয়েছে, মুখ দেখে। জেরা—কি করে এতটা সন্দেহ হল তার, কি করে এতটা বুঝতে পারল? তখনো একই উত্তর, কি করে জানে না—তবে মুখের দিকে তাকালে সে বুঝতে পারে। নিবারণের পক্ষের উকিলের প্রশ্ন, বুঝেও সে নিজে তাকে আটকাতে চেষ্টা করে নি কেন? উত্তর, নিজে চেষ্টা করলে পারত না আটকাতে। প্রশ্ন, দেওরের প্রতি টান বা দরদবশতই সে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে কিনা। উত্তর, সে তার স্বামীকেই রক্ষা করতে চেয়েছিল, স্বামী মারাত্মক কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে মনে হলে সে চুপ করে বসে থাকবে কেমন করে।

নিবারণ তেমনি কঠিন, তেমনি পাথর।

তার চিন্তাধারা আচ্ছন্ন নয় একটুও। যা সে করতে গিয়েছিল করে আসতে পারত—বিশ্বাস, ধরাও পড়ত না। কিন্তু পারল না আর ধরা পড়ল নিজের

বউয়েরই জন্যে, যে বউয়ের কথা সে একবারও ভাবে নি। বউ তাকে ফাঁসির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বউ নগেনকে রক্ষা করেছে। রক্ষা করেছে যখন, রক্ষা করার নিগূঢ় হেতুও আছে। আর নিবারণ এত মূর্খ যে এদিক দিয়ে মনে একটা সন্দেহ পযন্ত রেখাপাত করে নি। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে বিচারকের রায়ের প্রতীক্ষা করেছে নিবারণ। আকাঙ্ক্ষা ফাঁসির হুকুমই যেন হয়।

ফাঁসি হল না। এগারো বছরের দ্বীপান্তর হল।

তাকে নিয়ে যাবার আগে বউ আছড়ে কেঁদে দেখা করতে চেয়েছিল। অনুমতিও পেয়েছিল। নিবারণ দেখা করে নি। যে-আত্মীয়ের তদ্বিরে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল, নিবারণ তাকে বলেছে, ফাঁসী হলেই ভাল হত, সে ভুল লোককে খুন করতে চেষ্টা করেছিল, এগারো বছর বাদে সে ফিরে আসেই যদি আবার, ওই ভুলটা তাকে শোধরাতে হবে, আর তখন বোধহয় ফাঁসির দড়ি এড়াতে পারবে না।

জাহাজে পাঁচ-পাঁচটা দিন কালাপানির কালো জল দেখতে দেখতে গন্তব্য-স্থলে পৌঁছেছে। সেই কালো জল বিষে ভরা। কিন্তু তার থেকেও অনেক কালো বিষ নিবারণ দাসের বুকে।

এক বছর এক বছর করে আট বছর গত হয়েছে। বয়েসটা ঊনতিরিশ থেকে সাঁইতিরিশে ঠেকেছে। তারপর হঠাৎই ছাড়া পেয়ে গেল নিবারণ দাস। ছাড়া পেল স্বাধীনতা উপলক্ষে। যাদের রেকর্ড ভাল তারা সকলেই ছাড়া পেল।

কিন্তু এই আট বছরে নিবারণ দাস আর এক মানুষ। দেশ বলতে যা কিছু সব মন থেকে মুছে দিতে পেরেছে। সর্ব-অনুভূতিশূন্য এই মুক্তিটা মন্দ লাগে নি নিবারণের। দেশে ফেরার চিন্তাটা একবারও মনে হয় নি। তার বউ কারো কাছে শুনে থাকবে আসামীরা আগেই ছাড়া পাচ্ছে। নিবারণ পরপর দুটো চিঠি পেয়েছে বউয়ের। সেই আঁকা বাঁকা কাঁচা লেখার মধ্যে কোনো আকুতি আবিষ্কারের চেষ্টা কেউ করে নি। বউ লিখেছে, সকলে ফিরে আসছে খবর পেয়েছে, সে ফিরে আসছে না কেন। অবশ্য অবশ্য যেন ফেরে। লিখেছে, যশোবন্ত বড় বাড়ির চাকরি ছেড়ে সেই থেকে তার কাছে আছে, নিজের মেয়ের মত সব বিপদ আপদ ঠেলে তাকে আড়ালে রেখেছে।

নিবারণ চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।···ওর চোখেই যে মেয়েমানুষ ধুলো দিতে পেরেছে, তাকে আগলে রাখবে ওই বুড়ো! ভেবেছে, নিবারণ মনে মনে হেসেছে, নগেনের বাগানবাড়ির মেয়েমানুষ বেশিদিন নতুন থাকে না।

কিছুদিন বাদে ঘুরে ফিরে বউয়ের দ্বিতীয় চিঠি তার হাতে এসেছে। নিবারণ

তখন মায়াবন্দরে দ্বীপ বদল করেছে। আবারও আকা-বাঁকা কাঁচা অক্ষরের অনেক অনুনয়। সব্বাই ফিরে এল শুনছে, সে ফেরে না কেন? বউকে খুন করার জন্যেও ফিরে আসবে বলে গিয়েছিল, তাই যেন আসে। খুন করলেও তার গায়ে যেন কোনো আঁচ না লাগে সেই উপায় সে-ই করে দেবে—তবু যেন আসে, অবশ্য যেন আসে।

অশ্লীল গাল পেড়ে সেই চিঠিও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নিবারণ। আর চিঠি পায় নি।

মাস দুই মায়াবন্দরে জঙ্গলের কাজে লেগেছিল। জীবনী-শক্তি যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেই হাড়-ভাঙা খাটুনিতে তাও যেতে বসেছিল। কিছু টাকা জমলেই সমুদ্র-পাড়ি দিয়ে আর কোথাও যাবে ঠিক করেছিল। কিন্তু তার আগেই দুনিয়া পাড়ি দিতে হবে কিনা সেই সংশয়।

এমনি দিনে জীবনের গতি নতুন বাঁক নিল হঠাৎ।

কাজের শেষে জঙ্গলের একটা নির্জন পথ ধরে জনা তিনেক একসঙ্গে ফিরছিল তারা। ডিমের মত শাদাটে কি একটা পায়ের কাছে পড়তে জুতোর ঠোক্কর মেরে একজন নিজের মনেই বলল, আওয়াবিলের বাসা—

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত কি মনে পড়ে গেল নিবারণের। এই কাজ থেকে মুক্তির বাসনা এত উদগ্র বলেই হয়তো পাগলা ডুংডুংয়ের বিস্মৃতপ্রায় কথাগুলো তার সব কটা স্নায়ু নাড়িয়ে দিল একপ্রস্থ। অনেকটা চুপচাপ এগিয়ে গিয়ে কিছু একটা অজুহাতে ফিরল আবার। একা। আওয়াবিলের বাসাটা পেল।

পরদিন আর কাজে আসে নি নিবারণ। তার পরদিনও না। আর কোনদিন না। হিসেব করে দেখেছে, সেই রাতের পর সম্পূর্ণ অসুস্থ হতে আট দিন লেগেছিল। তারপরেও দিনকতক শরীরের হাড় মাংস সব আলাদা আলাদা মনে হয়েছে। এক-রকম মৃত্যুর জন্যেই প্রস্তুত হয়ে নিবারণ সেই রাতে আওয়াবিলের বাসার প্রতিক্রিয়া নিজের ওপরে পরীক্ষা করেছিল।

সেই একদিনই। এই চার বছরের মধ্যে আর একবারও না। ডুংডুংয়ের উপদেশ মনে ছিল তার।

॥ ৩ ॥

স্টিমবোট মায়াবন্দরের পাড়ে ভিড়ল।

এবারে আর অতবড় থলেটা নিজের হাতে বইবে না নিবারণ। ডুবুরীদের সর্দার যাকে ইঙ্গিত করবে সে-ই বয়ে দিয়ে আসবে। জেটি পেরিয়ে বাইরে আসতে মা-সোয়ের সঙ্গে দেখা। এমনি বেড়াতে এসেছিল যেন সমুদ্রের ধারে—দেখা হয়ে গেল। নিবারণ হাসি চাপল, সে বাইরের কাজে বেরুলে ফেরার সময় এ-রকম দেখাটা আজকাল প্রায়ই হয়ে যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করল, কি খবর, এখানে দাঁড়িয়ে যে?

মা-সোয়ে নিস্পৃহ জবাব দিল, এমনি। কিন্তু চোখদুটো উৎসুক তার।—কি রকম পেলে?

নিবারণ ঠোঁট ওলটাল, কিছুই না প্রায়।

শোনামাত্র রমণীমুখে খুশির আভাস। কিন্তু নিবারণের পিছনের লোকটাকে দেখে আর তার হাতের থলেটা দেখে হাসি মিলিয়ে গেল। থলের বহর থেকে শুকনো মুখে মালের পরিমাণটা আন্দাজ করা গেল। পরে তার দিকে তাকাতেই যা বোঝার বুঝে নিল। হাসির আভাস একেবারে গোপন করতে পারে নি নিবারণ। মা-সোয়ে চুপচাপ সঙ্গ নিল তার।

উষা স কোথায়?

কে জানে—। মা সোয়ের মুখভাব নির্লিপ্ত। রাগ চাপতে চেষ্টা করছে বোঝা যায়।

নিবারণ হালকা রসিকতা করল, জেটিতে দাঁড়িয়ে কি করছিলে? লোক জমাচ্ছিলে?

মা-সোয়ে জবাব দিল না, তার দিকে নিস্পৃহ একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিথিল চরণে সঙ্গে সঙ্গে আসছে। তার এই নিরাসক্ত হাব-ভাব আর ঈষৎ মন্থর চলার ছন্দটা মন্দ লাগে না নিবারণের। সে-ও যে খুব একটা বাজে ঠাট্টা করেছে এমন নয়। রমণীয় দ্বীপে রমণী বিরল। অন্তত চোখ তৃপ্ত হতে পারে পথে-ঘাটে এমন বরাঙ্গনার দর্শন প্রায় দুর্লভ। এই এক মেয়েকে পথে-ঘাটেই দেখা যায়। আর যেখানে দেখা যায়, সেখানে পথচারীদের একটা দৃষ্টি-জালও ক্রমশ পরিপুষ্ট হতে থাকে। মা-সোয়ে তা খুব ভাল করেই অনুভব করতে পারে। বাঘের অস্তিত্ব জেনেও বনে যেমন হরিণ থাকে, ওর এই দ্বীপে অবস্থানও অনেকটা সেই

রকমের। পায়ে পায়ে নিজেকে রক্ষা করার দায়। অবশ্য আগের থেকে সাহস আজকাল অনেকটাই বেড়েছে। বেড়েছে নিবারণের জোরে। ফ্রেণ্ডের জোরে। মা-সোয়ে নিবারণকে ডাকে, ফ্রেণ্ড—বন্ধু। এখানকার সর্বজনীন ভাষা হিন্দী। সকলেই বলতে কইতে পারে, হিন্দীর সঙ্গে প্রয়োজনমত ইংরেজি শব্দও কম-বেশি প্রায় সকলেই মেশাতে পারে। ফ্রেণ্ডের আওতার মধ্যে না থাকলে এতদিনে যে নেকড়ের পালের মধ্যে গিয়ে পড়তে হত, সে-ও মা-সোয়ে খুব ভাল করেই জানে। ভবিষ্যতের কথা জানে না, কিন্তু এ-পর্যন্তও উবা-স'র ভরসায় অন্তত এভাবে কেটে যেতে পারত না।

উবা-স'র বউ মা-সোয়ে। বছর চব্বিশ-পঁচিশ হবে বয়স। পনেরো বছর বয়স থেকে মানুষের তাড়া খেয়েই বেদে-বেদেনীর মত এভাবে ঘুরছিল। পুরুষের সংস্থানের জোর তেমন না থাকলে তার রূপসী ঘরনীর ওপর বাইরের পুরুষের চোখ অনেক সময়েই পড়ে। এসব জায়গায় অনেক বেশিই পড়ে। পড়ে বলেই একের পর এক জায়গা বদল করতে হয়েছে তাদের। আজ আড়াই বছর হল মায়াবন্দরে টিকে আছে। উবা-স'র বিশ্বাস, এখানেই শেষ-পর্যন্ত থেকে যেতে পারবে তারা।

চুপচাপ খানিক পথ চলার পর মা-সোয়ে তার দিকে না তাকিয়েই গম্ভীর মুখে বলল, পরশু রাতে তোমার ওই নেশা খেয়েছিল, আজ দুপুরে ঘুম ভেঙেছে—

নিবারণ তাচ্ছিল্যভরে মন্তব্য করল, পুরো দুটো দিনও নয়, অনেকে হপ্তা-ভোর ঘুমোয়।

চাপা রোষে ঘাড় ফেরাল মা-সোয়ে, কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে ও এই নেশা করবে না—এখন দু'দিন ঘুমুচ্ছে, পরে দশদিন ঘুমুবে।

নিবারণ ঠাট্টা করল, তোমাকে ছেড়ে ওর নেশাটাই বড় হল—তোমারই লজ্জা। আমি কি করব! তোমার কথা শোনে না আমার কথা শুনবে কেন?

মা-সোয়ে আবারও একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল শুধু। কিছু বলল না।

নিবারণ হাসছে মনে মনে। ফ্রেণ্ড বলুক আর যা-ই বলুক, মেয়েটার সব থেকে বেশি রাগ ওর ওপরেই। টিরকীর থেকেও বেশি রাগ বোধহয়। টিরকীর স্থূল উদ্দেশ্যটা যেমন নগ্ন তেমনি স্পষ্ট। সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু যে-লোক এক হাতে আশ্রয় দিয়ে আর এক হাতে সর্বনাশের রাস্তা করে যেতে পারে—তাকে সে বুঝবে কেমন করে?

টিরকী ভিল ক্রিশ্চিয়ান। গায়ের রং আবলুস কাঠের মত কালো, তেমনি ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারা। নিবারণকে হয়তো তুলে আছাড় দিতে পারে। কিন্তু এই

বিচ্ছিন্নতার রাজ্যে দলের জোর কারো থাকলে তাকে সমীহ না করে উপায় নেই। কাঠের কারখানায় মোটামুটি ভালো মাইনের কারিগর লোকটা। মা-সোয়ের কাছে তার সাদাসিধে প্রস্তাব, উবা-সকে ছেড়ে তার কাছে আসতে হবে। না এলে অশান্তির কারণ ঘটবেই একদিন না একদিন।

এই বাসনা অনেকেরই, কিন্তু অতটা উগ্র হয়ে ওঠার সাহস সকলের নেই। গোড়ার দিকে কারখানায় উবা-স'র চাকরি করে দিয়েছিল টিরকী। দিয়ে বিনিময় আশা করেছিল। নিরাশ হয়ে ক্ষেপে উঠেছে ক্রমশ। গোটাগুটি দখল করতে চেয়েছে মেয়েটাকে। সেই দুর্দিনে মা-সোয়ের সামনে অনেক প্রলোভনের জাল ফেলেছে, পরে অনেক রকম ভয়ও দেখিয়েছে। টিরকীর ধারণা ছিল, তার প্রধান অন্তরায় উবা-স। সে সরলেই কাঁটা সরল। কিন্তু পরে দেখা গেল তার থেকেও বড় অন্তরায় নিবারণ দাস। দু-দুটো কাঁটা সরানো সহজ নয় বলেই টিরকী গুমরে মরছিল।

এতদিনে ছিনিয়ে আনা সম্ভব হত না মা-সোয়েকে? নিবারণের জন্যেই সম্ভব হয় নি। উবা-স নিবারণের শরণাপন্ন হয়েছিল। ওস্তাদের সাগরেদি এভাবে সে করবে কেমন করে? মা-সোয়েকে হারিয়ে সে থাকবে কেমন করে? মা-সোয়ে এখান থেকেও পালাতে চাইছে ওকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত পালাতেই হবে বোধ হয়।

অনুরাগ বা রমণীপ্রীতির ধার ধারে না নিবারণ দাস। তার এই জীবনে নারীর জায়গা নেই বললেই চলে। ক্ষণ-বিস্মৃতির তাগিদ অদম্য হয়ে উঠলে সেটা টাকা থাকলেই মেলে। ওটুকু বিস্মৃতি টাকা দিয়ে কেনা যায়। নিবারণ কেনেও কখনো-সখনো। তখনো এক-ধরনের হিংস্র বিদ্বেষই বড হয়ে ওঠে। কিন্তু সে-রকম প্রয়োজন নিবারণ দাস খুব ক্বচিৎ কখনো অনুভব করে। তার জীবনের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারী মুছে গেছে।

ইচ্ছে করলেই এই মেয়েটার দিকে সে হাত বাড়াতে পারে। ইচ্ছে করলেই হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে পারে। লোভ একেবারে হয় না কোনদিন এমনও নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত নিবারণ সে ভেবে হাত বাড়ায় নি কোনদিন। কেন বাড়ায় নি নিজের কাছেও খুব স্পষ্ট নয় সেটা। মা-সোয়ে আর উবা-স'র ভালবাসার কানা-কড়িও মর্যাদা দেয় না সে। আওয়াবিল পাখি তাদের বাসাগুলোকে কম ভালবাসে? কিন্তু নিবারণ দিব্বি টপাটপ তুলে নিয়ে আসে বাসাগুলো—হাতের চাপে গুঁড়িয়ে দেয়। তেমনি ওদের বাসাটাও গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

দেবেও হয়তো একদিন। মা-সোয়েকে নিজের ঘরে রাখবে। উবা-স'র

তর্জনী তোলারও ক্ষমতা নেই। তার সাগরেদ হবার ফলে খদ্দেরদের কাছে যত হম্বি-তম্বি করুক আর মেজাজ দেখিয়ে চলুক—আসলে লোকটা যেমন ভীরু তেমনি মেরুদণ্ডহীন। নিবারণ সেটা খুব ভাল করেই বুঝে নিয়েছে। চোখের দিকে চেয়ে সে মানুষের ভিতর দেখতে পায় এখন। নেশা করিয়ে লোকটাকে যে-কোনো রাতে নৌকায় করে একটু ভিতরে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেই হাঙরে টেনে নেবে। আর কেউ দেখবেও না কোনদিন। যখন ইচ্ছে হবে, নিবারণ অনায়াসে তাও করতে পারবে। আর, ওই লোকটার প্রতি মা-সোয়ের এত টান এক-ধরনের বিকার ছাড়া আর কিছু ভাবে না সে।

কিন্তু আপাতত ওই লোকটাই তার ডান হাত। উবা-স। দ্বীপের নেশা-খোর খুঁজে খুঁজে বার করে টোপ ফেলাতে পটু। ওর আড়ালে নিবারণ দিব্বি আছে। বিশ্বস্ত। নিবারণ ওকে হাতে ধরে যা দেয় তাতেই খুশি। অবশ্য কম দেয় না। বউয়ের কাছেও উবা-স ওস্তাদের দরাজ দিলের তারিফ করে।

এই লোক চলে গেলে নিবারণের সমূহ ক্ষতি। একটা মেয়েমানুষ হাত-ছাড়া হবার ভয়ে এত উতলা হতে দেখে নিবারণ উবা-স'র ওপরেই চটেছিল। মনে মনে গালাগাল করেছে তাকে। তারপর পাঁচ-ছজন অন্তরঙ্গ শেল-ডাইভার সঙ্গে করে এক সন্ধ্যায় সোজা টিরকীর ডেরায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। খুব ঠাণ্ডা মাথায় তাকে যা বুঝিয়ে এসেছে তার সারমর্ম, টিরকীর নজরটা মা-সোয়ের ওপর থেকে ফেরানো দরকার। অন্যথায় বিপদ ঠেকানো যাবে না। যে একবার আনাড়ীর মত মানুষ খুন করে ন বছর জেল খেটেছে, এখন আর সে অতটা আনাড়ী নয়। তাছাড়া তার এই সব অনুচরেরা অবলীলাক্রমে কালাপানির হাঙরের পেট ফাঁসিয়ে দেয়, একটা মানুষের পেট ফাঁসাতে তাদের এমন আর কি পরিশ্রম করতে হবে।

টিরকীও বেশ ঠাণ্ডা মাথাতেই বুঝে নিয়েছে। বুঝে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, নিবারণ এর মধ্যে নাক গলাতে আসছে কেন, তার কি স্বার্থ?

নিবারণ নির্লিপ্ত জবাব দিয়েছে, টিরকীর যে স্বার্থ তারও সেই স্বার্থ। মা-সোয়ের স্বামী একটা আছে—থাক্, কিন্তু তার ওপর আর কারো দখল নিবারণ বরদাস্ত করবে না।

টিরকী অবিশ্বাস করে নি। অবিশ্বাসের কারণও নেই। তার বুকের রক্ত টগবগিয়ে ফুটেছে। তারপর ঠাণ্ডা হয়েছে। আত্মরক্ষার তাগিদটাই বড় হয়েছে। প্রাণে বাঁচলে তারপর মেয়েমানুষ। বলেছে, এতটা সে ঠিক জানত না, জানল যখন, দোস্ত্‌এর চিড়িয়ার দিকে সে আর হাত বাড়াবে না।

কিন্তু ব্যাপারটা গোপন থাকল না। টিরকীই পাঁচজনকে বলে বেড়াল। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপে উবা-স'কেও জর্জরিত করে তুলতে চেষ্টা করল।

শুনে উবা-স আর মা-সোয়ে দুজনেই হকচকিয়ে গেল প্রথম। আরো কেউ কেউ ঠাট্টা ঠিসারা করেছে, কিন্তু তখন অতটা বোঝে নি তারা। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল দুজনে। তারপর উবা-স জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার, লটঘট আছে নাকি কিছু ?

মা-সোয়ে রেগে উঠেছে, কেন, তোর চোখ নেই ?

উবা-স বলেছে, চোখ যখন থাকে তখনকার কথা কে বলছে ? নেশায় চোখ উল্টে থাকি যখন তখনকার কথা জিজ্ঞাসা করছি।

মা-সোয়ে আরও তেতে উঠেছে, চোখ উল্টে থাকতে কে বলেছে তোকে—বেইমান কোথাকার ! যাবই তো একদিন ছেড়ে, তোর মত লোকের কাছে কোনো মেয়েমানুষ থাকে !

রাগারাগি সিকেয় তুলে সন্ধ্যেবেলায় দুজনেই এসেছে নিবারণের কাছে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিতে। উবা-স আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করেছে, ওস্তাদ, এ-সব কি শুনছি—

নিবারণ জানে কি শুনেছে। সে অনুমান করতে পারে। অনুমান শক্তিটা প্রখর তার, প্রায় নির্ভুল। জবাব দিল, টিরকী যদি হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে থাকে তো তার ভয়েই থাকবে। সেই জন্যেই ও-রকম বলার দরকার হয়েছে। কিন্তু উবা-স'র গায়ে যদি তাতেও ফোস্কা পড়ে আর লোকের কথায় কলজে পোড়ে, তাহলে সে অনায়াসে ওই সমুদ্রের জলে ডুবে মরতে পাবে বা বউ নিয়ে যে চুলোয় খুশি চলে যেতে পারে, নিবারণের আপত্তি নেই।

সঙ্গে সঙ্গে উবা-স'র মুখ খুশিতে ভরে উঠেছে। এক মুহূর্তেই নিঃসংশয়, নিঃশঙ্ক সে। মাথা ঝাঁকিয়ে ওস্তাদের বুদ্ধির তারিফ করেছে আর হেসেছে। বলেছে, সে এই রকমই কিছু একটা আশা করেছিল। মা-সোয়ে চুপচাপ খানিক নিরীক্ষণ করেছে নিবারণকে। মুখের দিকে চেয়ে ভিতরটা দেখে নিতে চেষ্টা করেছে। তারপর সেও খুশিই হয়েছে। এ রাজ্যে কথায় কিছু যায় আসে না। এ যদি নিরাপদের কারণ হয়, লোকে যা খুশি ভাবুক, যা খুশি বলুক। সেও ঠাট্টা করেছে, সকলে জানত বন্ধু মেয়েমানুষ পছন্দ করে না, এখন উল্টো ভাববে।

নিবারণ টিপ্পনী কেটেছে, এখন জানবে সে-রকম মেয়েমানুষ হলে একেবারে অপছন্দ করে না।

উবা-স বোকার মত হা-হা করে হেসেছে। আর তার সেই হাসি দেখেই

মা-সোয়ে মুখ টিপে হেসেছে। নিবারণের সেই পুরনো বিস্ময়, এরকম একটা নির্বোধের জন্য মা-সোয়ের মত মেয়ে এমন পাগল হয় কি করে। বিকার, বিকার ছাড়া আর কি!

কিন্তু নিবারণ জানে, মনে মনে মেয়েটার ওই টিরকীর থেকেও বেশি রাগ বেশি বিদ্বেষ তার ওপর। তার কারণ ওই নেশা— নেশার ব্যবসা। দুনিয়ায় এই একটা জিনিসের ওপর সব থেকে প্রবল ঘৃণা প্রবল বিদ্বেষ প্রবল বিতৃষ্ণা তার। নিজের দেশে অপরিণত বয়সেই নেশার নরক দেখেছে মা-সোয়ে, নেশার বিভীষিকা দেখেছে। সেই বিভীষিকা আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

নিবারণ সবই জানে, সবই শুনেছে। মেয়েটাই বলেছে তাকে। উবা-স'ও বলেছে।

মা-সোয়ের বড় বোন ছিল একটা, পাঁচ ছ বছরের বড়। দেখতে মা-সোয়ের মত না হোক, সুন্দরীই ছিল। মা-সোয়ের বাবা মা দিবারাত্র নেশা করত। নেশা করার জন্যেই তারা জাগত যেন, জেগে আবার নেশা করার জন্য চনমনিয়ে উঠত। নেশা না পেলে ক্ষিপ্ত পাগল হয়ে যেত তারা।

বারো বছর বয়সে মা-সোয়ে দেখত, বড় বোনটাকে কারা যেন কোথায় জোর করে ধরে নিয়ে যেত। অপরিচিত লোকও আসত বাড়িতে। মা-সোয়েকে তখন সেদিকে যেতে দেওয়া হত না। বোনটা যেত। সে কাঁদত, যেতে চাইত না। বাবা-মা তখন কি মার মারত তাকে। অন্য লোকের সঙ্গে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিত।

পরে মা-সোয়ে বুঝেছিল, বড় বোন কোথায় যায়, কেন যায়, কেন লোক আসে বাড়িতে। সে বাবা-মায়ের নেশার রসদ জোগায়, টাকা আনে। বোনটা দিনকে দিন কালি হয়ে যেতে লাগল, তবু বাবা মা তা দেখত না—নেশা এমনই জিনিস। কিন্তু লোকের কাছে বড় বোনের কদর ক্রমশ কমে আসছিল। মা-সোয়ের বছর পনেরো বয়েস তখন। বাবা-মায়ের তার দিকে চোখ গেল। অন্য লোকেরও। মা-সোয়ের একটুও বুঝতে বাকি নেই, তাকেও শুধু নেশার খোরাক জোগাবার জন্যে জিইয়ে রাখা হয়েছে। বড় বোন ভাল থাকলে আরো কিছুদিন কেটে যেতে পারত, কিন্তু আর কাটবে না। তাকে নিয়েও একটু টানা-হেঁচড়া শুরু হল বলে। তার

ভয়ে ত্রাসে দিশেহারা মা-সোয়ে। বাঁচার এমন তাড়না আর সে অনুভব করে নি। পালাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পালানো সহজ নয় অত। তাদের

বাড়িতেই দালাল গোছের লোক থাকত একটা। বাবার ভয়ানক বিশ্বাসী লোক—মূর্তিমান দুশমন। যেখানেই পালাক, সে ধরে নিয়ে আসত। তারপর বাবার নেশা ছুটলে মেরে আধমরা করত তাকে।

উবা-স তখন উনিশ-কুড়ি বছরের ছোকরা। বাড়িতে আসত প্রায়ই। বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করত। কেন আসত, কেন ঘুরঘুর করত মা-সোয়ে খুব ভাল করেই জানত। প্রাণের দায়ে মা-সোয়ে শেষে তাকেই হাত করল। কিন্তু ভীতুর একশেষ উবা-স, বাবার সেই লোককে দেখলেই ভয়ে কাঁপত। তার টাকা নেই, তাকে কে পাত্তা দেবে?

মা-সোয়ে দিল। ওই ভীতু লোকটাকেই আর এক নেশা ধরিয়ে দিল। নেশায় কি না হয়? তারপর তাকে নিয়ে পালাল একদিন। চারদিক থেকে মৃত্যু ছেঁকে ধরেছিল তাদের। কিন্তু এই ভীতু লোকটাই তখন প্রাণ দিয়ে আগলেছে তাকে, রক্ষা করেছে। জায়গায় জায়গায় পালিয়ে বেড়িয়েছে। ওকে ছেড়ে যায় নি, বিশ্বাসঘাতকতা করে নি।

মা-সোয়ে বলেছে, লোকটা বরাবরই ভীতু বটে, কিন্তু আগে এমন অপদার্থ ছিল না। একটু একটু করে নেশা ধরে এরকম অপদার্থ হয়েছে। বলেছে, নেশা জিনিসটা ওদের জাতের অভিশাপ, রক্তের অভিশাপ। দুচোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল মা সোয়ের, রুদ্ধ আকুতিতে দুহাত আঁকড়ে ধরেছিল নিবারণের। বলেছিল, বন্ধু ভাল লোক, উবা-সও ভাল লোক, বন্ধু যেন তাকে নেশার হাত থেকে রক্ষা করে—মা-সোয়ে কেনা হয়ে থাকবে তাহলে, চিরঋণী থাকবে। বন্ধু নিজে তো নেশা করে না, ও কেন করবে? বন্ধু ইচ্ছে করলেই পারে তাকে রক্ষা করতে, ওই লোকের ওপর বন্ধুরই জোর সব থেকে বেশি।

না, সেদিনও যে নিবারণ খুব অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠেছিল তা নয়। তবু মেয়েটাকে সে আশ্বাস দিয়েছিল বটে, সে যতটা পারে করবে, বেশি নেশা-টেশা যাতে না করে দেখবে।

কিন্তু নিবারণ করেওনি কিছু, দেখেও নি। কারণ, সব নেশা-টেশা ছেড়ে উবা সও যদি ঠিক তারই মত হয়ে বসে, সব ব্যাপারে যদি তার চোখ খোলা থাকে টনটনে জ্ঞান থাকে—তাহলে তার চলে কি করে? লোকের কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকলে তবেই প্রতাপ খাটে। তবে, নিবারণ এই নেশাটা রপ্ত না করে বসে সেদিকে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। কারণ, তাহলে ব্যবসা অচল হবে, চাই কি, বিপদেও পড়তে পারে। অন্য যে নেশা-ভাঙই করুক তার আপত্তি নেই, কিন্তু এটা নয়। ডুংডুংয়ের পরিণতির গল্প করেছে সে উবা-

স'র কাছে, মন-গড়া আরো দুই একটা বিভীষিকার কাহিনীও ফেঁদেছে।

ফল খুব হয় নি। কারণ, নেশার ঝোঁক ক্রমশ বাড়ে বই কমে না। মাঝে মাঝে এই জিনিসটাও সে পরখ করে এবং করছে। বিশেষ করে নিবারণ দূরে কোথাও মাল সংগ্রহে যাচ্ছে শুনলে কথাই নেই। তার হাত দিয়েই এত মাল পাচার হয়ে যাচ্ছে, আর সে একটু-আধটু চেখে দেখবে না? এই চেখে দেখাটাই বাড়ছে একটু একটু করে। তবে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে চাখতে বসে না সে। ওস্তাদকে মনে মনে বিলক্ষণ ভয় করে। খুব বেশি হলে আর দুদিন বেহুঁশ হবার মত মাত্রা নেয়। তার বেশি নয়।

কিন্তু এতেও নিবারণ বিশেষ কিছু বলে না। দেখুক—একটু-আধটু দেখুক। নইলে তার কদর বুঝবে কেন, ক্রীতদাস হয়ে থাকবে কেন। বাড়াবাড়ি না করলেই হল। নিবারণ তাকে পরামর্শ দিয়েছে, ঘরে তো তার জংলি (দিশি-মদ) মজুতই থাকে—হাতে যখন কোনো কাজ থাকবে না বা কোনরকম ঝামেলা থাকবে না, তখন তার সঙ্গে একটু আধটু ওই জিনিস মিশিয়ে খেতে পারে। কিন্তু বেশি খেয়েছে কি, সেই বেহুঁশ অবস্থাতেই তাকে তুলে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে-আসা হবে।

মা-সোয়ে এ সবই জানে বোধহয়। বোধহয় কেন, জানে যে সেটা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ওস্তাদের নির্লিপ্ত প্রশ্রয় না পেলে তার ঘরের লোকটা দিনকে দিন এমন বিগড়ে যেত না। বিগড়ে একেবারে যায় নি, কিন্তু মা-সোয়ের স্থির বিশ্বাস বিগড়ে যাচ্ছে—এই করে একেবারেই গোল্লায় যাবে একদিন।

সুস্থ যখন থাকে, গালাগাল করে তার ভূত ছাড়াতে চেষ্টা করে মা-সোয়ে। শাসায়, সে টিরকীর কাছেই চলে যাবে ঠিক একদিন। টিরকীর চোখের ঘোর কাটে নি, ভয়ে মুখ বুজে আছে শুধু—সেটা সকলেই জানে। এখনো ওদের বাড়ির কাছে ওকে হামেশাই দেখা যায়, ভদ্রতার মুখোশ পরে বাড়িতেও আসে এক-এক দিন। উবা-স'র সঙ্গে সে বেশ ভাল ব্যবহারই করে এখন। আর দুই চোখে যতটা সম্ভব নারীদেহ লেহন করে। কাজেই তার সম্বন্ধে ভয়টা উবা-স'র একেবারে যায় নি।

কিন্তু মা-সোয়ের শাসানিতেও ফল তেমন কিছু হয় নি। বেগতিক দেখলে নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করে, নেশা এবারে ছাড়ল, সরাব-টরাব একটু আধটু খাবে শুধু—সেটা তেমন কিছু নেশা নয়। নেশা বলতে যা বোঝায় তার ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না আর। প্রতিজ্ঞায় ঘরণীকে ঠাণ্ডা করা না গেলে উল্টে চোখ রাঙায়, টিরকীর কাছে গেলে ওস্তাদ টুকরো টুকরো করে কাটবে তাকে।

ওস্তাদ যে-সে লোক নয়।

মা-সোয়ে জ্বলে উঠে, তোকে আর তোর ওস্তাদকে দুজনকেই হাত-কড়া পরাব আমি, জেলে পাঠিয়ে ছাড়ব একদিন—বলিস তোর ওস্তাদকে।

এতদিনে মা-সোয়ে বুঝে নিয়েছে, যে জন্যেই হোক, এ-ব্যাপারে বন্ধু সাহায্য করবে না তাকে। সাগরেদ ব্যবসায় গোল না পাকিয়ে নেশা যতটা করে করুক, উল্টে সেটাই সে চায়।

আজ শুধুই জেটিতে আসে নি মা-সোয়ে, অকারণে বন্ধুর সঙ্গ নেয় নি। আজ একটা বোঝাপড়া করে নেবার সঙ্কল্প মা-সোয়ের। সামনা-সামনি ফয়েসালা করে নেবার ইচ্ছে।

নিবারণ দাস রাস্তা ভাঙছে, আর মাঝে মাঝে আড়ে আড়ে দেখছে তাকে।

সামনেই যে লোকটাকে দেখে তার গতি শ্লথ হল আরো, সে উবা-স। সে-ও দেখেছে তাদের! তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কাছে আসছে। শেষটা দৌড়েই এল। বেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক আছে সেটা বোঝাবার চেষ্টা। চকিতে বউয়ের গম্ভীর মুখখানা দেখে নিল একবার, তারপর ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, ভাল মত কাজ হল ওস্তাদ?

নিবারণ বলল, হল একরকম। তুমি এদিকে কোথা থেকে?

নাট-মার্চেন্টের সঙ্গে কথা কইতে কইতে এগিয়েছিলাম। উবা-স'র মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া একটু, বলল, ওই লোকটার সঙ্গে টিরকী আজকাল মাঝে মাঝে কি গুজুর গুজুর করে ওস্তাদ, আজও দেখলাম—

নাট-মার্চেন্ট অর্থাৎ স্থানীয় নারিকেল ব্যবসায়ী একজন। সকলে নাট-মার্চেন্ট বলে। পয়সাওয়ালা লোক। নিবারণের অনুথায় উবা-স'র একজন শাঁসালো খদ্দের। অনেক মাল কেনে সে।

মা-সোয়ের গোটা মুখটা ধারালো কঠিন হয়ে উঠেছে, নিবারণ লক্ষ্য করল না। কিন্তু উবা-স করল। তার মুখ শুকনো। তার ভয়ের কারণটা কি মা-সোয়ে জানে। সেদিনও বাড়ি বয়ে তর্জন-গর্জন করে গেছে ওই নাট মার্চেন্ট, মোড়কে খারাপ মাল দেওয়া হচ্ছে এখন, সাত দিনের নেশা পাঁচ দিনে টুটে যাচ্ছে। তাছাড়া যখন যে-মাল পৌঁছে দেওয়ার কথা, দেওয়া হচ্ছে না। ফের এ-রকম হলে সে মজা বুঝিয়ে ছেড়ে দেবে।

মা-সোয়ে জানে মোড়কের মাপা মাল কে সরায়। শুধু নিজের জন্যে সরায় না, দুই-এক জন বন্ধু-বান্ধবকেও দাতব্য করা হয়। মাঝে মধ্যে বাড়িতে এক-আধ

জন এমন ধরণা দিয়ে পড়ে যে শেষে একটু-আধটু না দিয়ে পারে না। অবশ্য হাতে দেয় না, জংলির সঙ্গে সামান্য মিশিয়ে খাইয়ে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। আর, সময়মত মাল পৌছয় না সেই অভিযোগেরও কারণ, ওস্তাদের মোড়কের না হোক, উবা-স নিজেই একটা না একটা নেশা করে পড়ে থাকে—সময়-জ্ঞান তার থাকবে কি করে!

এর ওপর গত কালই বেশ বড় দরের একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে ওই নাট-মার্চেন্টের সঙ্গে।

মা-সোয়ের একবার ইচ্ছে হল, এক্ষুনি সব বলে দেয়, বলে যে, গতকাল টিরকী নিজের কানে নিজের চোখে কিছু শুনে গেছে, দেখে গেছে, বুঝে গেছে। নাট-মার্চেন্ট চলে যাবার পর ভাল মানুষের মত এসে জিজ্ঞাসাও করেছে, লোকটা অত হম্বি-তম্বি করে গেল কেন। এই মুহূর্তে সব কিছুই ফাঁস করে দিতে ইচ্ছে করছিল মা-সোয়ের।

করল না। এসব বললে খুনোখুনি কাণ্ড হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু ঘরে মা-সোয়ে উবা-সকে শাসিয়েছে, সে সব বলবে, ছাড়বে না। উবা-স হাতে পায়ে ধরে ঠাণ্ডা করেছিল ঘরণীটিকে। কিন্তু এখন তার মুখ দেখে প্রমাদ গুনছে মনে মনে।

নিবারণ জিজ্ঞাসা করল, টিরকী নাট-মার্চেন্টের সঙ্গে কথা বলে তাতে তার ভয়ের কি আছে?

মা-সোয়েকে অপরিচিতার মত অন্যদিকে মুখ ফেরাতে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল উবা-স। আমতা আমতা করে জবাব দিল, খবরটা এমনিই জানিয়ে রাখল ওস্তাদকে। আজ সে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করেছে নাট মার্চেন্টকে, টিরকীর সঙ্গে তার কি কথা হয়—টিরকীর সঙ্গে ওর সদ্ভাব নেই খুব, তাই জানা দরকার। নাট-মার্চেন্ট বলেছে, দলবল নিয়ে কারখানা ছেড়ে সে ওর ব্যবসায় কাজে লাগতে চায়—সেই কথাই হয়, আর কিছু না।

নিবারণ অবিশ্বাস করে নি। কারণ, ভিতরের গলদ সে কিছু জানে না। তাছাড়া, এসব নেশার রহস্য খদ্দের নিজের গরজেই গোপন রাখে। এটাই চিরাচরিত রীতি। কোনো গণ্ডগোলে সময়ে নেশা না পেলে প্রাণান্ত অবস্থা। তাই গোপন রাখে। তাছাড়া, গোপন নেশা বেচে যে, আর কেনে যে—আইনের চোখে দুজনেই অপরাধী। অতএব যে যার স্বার্থে গোপন রাখে। মোটকথা নিবারণের চিন্তাধারা কোনো সন্দেহের ধার দিয়ে যায় নি। তার ধারণা, বড় লোকের যোগসাজসে পাছে ঘরের মেয়েমানুষটি এবারে বেদখল হয়ে যায়, সেই

ভয়ে উবা-স'র এই প্রসঙ্গের অবতারণা। ফলে হাসিমুখে সে তাকে অভয় দিল, তার ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ, টিরকীর ঘাড়ে একটার বেশি দুটো মাথা নেই।

উবা-স নিশ্চিন্ত হয়ে তার দোকান দেখতে চলে গেল। বাজারে একটা দরজীর দোকানের ঠাট বজায় রাখতে হয়েছে তাকে। নইলে লোকের সন্দেহ হবে কি করে চলে! এই বুদ্ধিও নিবারণই দিয়েছে তাকে, দোকানও সে-ই করে দিয়েছে। দুজন কর্মচারী দোকান চালায়, তবু মালিককে মাঝে মধ্যে হাজিরা দিতে হয়, না দিলে দোকানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ।

কিন্তু মা-সোয়ে উবা-স'র সঙ্গে গেল না, যেমন সঙ্গে আসছিল তেমনি আসছে। নিবারণ তা চায় না। সমস্ত দিনের ধকলের পর মেয়েছেলের ঝামেলা বা মেয়েলিপনা কোনটাই ভাল লাগবে না। সঙ্গের লোকটা মাল নিয়ে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করল, তুমি চললে কোথায়?

তোমার ওখানেই। নিরাসক্ত জবাব।

কেন?

নিরুত্তর।

বিরক্তি গোপন করা সম্ভব হল না। তার ঘর থেকে এক মাইলেরও দূরে ওদের ডেরা। বলল, এরপর সন্ধ্যে হলে তোমাকে আবার পৌঁছে দেবে কে? আমি ভয়ানক ক্লান্ত।

মা-সোয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার। তারপর ঠাণ্ডা জবাব দিল, পৌঁছে দিতে হবে না।

ঘরের কাছাকাছি এসেই গেছে। নিবারণ বাধা দিল না। বাকি পথটুকু চুপচাপ দুজনেই। নিবারণ চাবি বার করে ঘরের তালা খুলল। থলেটা ঘরের এককোণে রেখে লোকটাকে বিদায় দিল। তারপর ভিতরের ঘরেরও দরজা জানালা খুলে দিল। পিছন দিকের বেড়া টপকেও আঙ্গিনায় আসা যায়, কিন্তু এধার থেকে ঘর বন্ধ থাকলে ভিতরে ঢোকা যায় না।

সামনের ঘরটায় বহু রকমের আর বহু আকারের শেল সাজানো। এগুলো সব সখের সামগ্রী, সৌখীন বাবুদের কাছে বিক্রয়ার্থে সাজানো। সাধারণ লোক এটাই তার পেশা বলে জানে। বাবুরা বেড়াতে এসে শেলের খোঁজ করলে নিবারণের ঘর দেখিয়ে দেয় তারা।

কিন্তু কেউ যদি নজর রাখত, দেখত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জায়গা বদল করে সেই একই শেল সাজান। শেল নিবারণ আদৌ বিক্রি করে না। বাবুরা কিনতে

এলে যে-দাম হাঁকে, শুনে বেশির ভাগ সখের বাবুরই সখ মিটে যায়। যেটাই পছন্দ হয়েছে মনে হয়, সেটারই যা-খুশি দাম চেয়ে বসে নিবারণ। চায় কারণ, শেল সে বিক্রি করতে চায় না। বিক্রি করলে তো আবার নতুন আনতে হবে। যে-শেল পছন্দ হয়, ডুবুরীদের কাছ থেকে সেটা অমনিই নিয়ে আসে সে। কিন্তু একটা ছুটো করে তুলে এনে আর যাই হোক, ব্যবসা হয় না। তার থেকে ঝেড়ে মুছে তকতকে করে বিক্রির জন্যে সাজিয়ে রেখে পারতপক্ষে বিক্রি না করাটাই সব থেকে সহজ রাস্তা।

মা-সোয়ে চুপচাপ বাইরের ঘরেই বসে আছে। নিবারণ বেশবাস বদলে একটা লুঙ্গি পরে হাত-মুখ ধুয়ে তাকে ভিতরের ঘরে ডাকল। চৌকিতে হাত-পা না ছড়িয়ে সে পারবে না এখন, নইলে বাইরে থেকেই বিদায় দিত। তাছাড়া উবা-স বা মা-সোয়ে এখানে এলে ভিতরেই আসে।

মা-সোয়ে চৌকির একধারে বসল।

নিবারণ হালকা করেই জিজ্ঞাসা করলে, পৌছে দিতে হবে না কেন, একা যাবে, না উবা স আসবে নিতে?

একাই যাব।

ও। আজকাল আর তাহলে অত ভয়-ডর নেই তোমার?

মা-সোয়ে ঘুরে বসল তার দিকে। দেখল একটু। তারপর বলল, আছে। কিন্তু বন্ধু হয়েও যে-ক্ষতি তুমি করছ তার থেকে বেশি ক্ষতি আর কি হবে?

নিবারণের মুখে রূঢ় বিরক্তির ছাপটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেই একঘেয়ে কথা, সেই একঘেয়ে অভিযোগ। অথচ হাতে এখন অনেক কাজ তার। জিনিসগুলো থলে থেকে বার করে ঝাড়াবাছা করে গুছিয়ে রাখলে তবে নিশ্চিন্তি। কিন্তু মেয়েটা শিগগির উঠবে বলে মনে হয় না, আর, হাবভাবও যেন আজ অন্যরকম একটু।

কি বলবে বলে ফেল, আমার কাজ আছে অনেক।

মা-সোয়ে তার মুখের ওপর থেকে চোখ ফেরায় নি তখন। বলল, এ ভাবেই চলবে তাহলে?

কি ভাবে?

তার বিরক্তি লক্ষ্য করছে মা-সোয়ে, কিন্তু খুব যেন পরোয়া করে না। বলল, এই যেভাবে চলছে, ও নেশাই করে যাবে তাহলে?

আমি তার কি করব, তুমি ঠেকালেই পার।

পারতুম। তোমার জন্যে পারছি না। তুমি ঠেকাচ্ছ না কেন? তুমি তো

নেশা করো না, ও করে কেন ?

নিবারণ কর্কশ জবাব দিল, সে বোঝাপড়াটা ওর সঙ্গে করলেই পার, এখানে কেন ?

খানিক চুপ করে থেকে খুব ধীর শান্ত স্বরে মা-সোয়ে বলল, তুমি ভাল লোক, ভদ্রলোক—কিন্তু তুমি চাও না ও নেশা করা ছাড়ুক। কেন চাও না ?

নিবারণ ঝাঁঝালো জবাব দিল, তাহলে বুঝছ তো আমি ভাল লোকও নই, ভদ্রলোকও নই—এখন কেটে পড।

মা-সোয়ে বলল, আমার কথা এখনো শেষ হয় নি। হলেই যাব। ওকে যদি নেশা না ছাডাও তা হলে আমরা তোমাকে ছাডব, ওকে নিয়ে এই জায়গাও ছেডে চলে যাব আমি।

নিবারণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে বসেছে। সাফ জবাব দিল, চেষ্টা করে দেখ, পারলে যাও—

মা সোয়ে স্থির চোখে চেয়ে আছে। দেখছে। বলল, না যদি পারি তাহলে তোমারও সত্যিকারের বিপদ হবে জেনে রেখো, নেশাব সঙ্গে আমি আপস করব না।

আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসল নিবারণ। এ শাসানি না বোঝার কথা নয়। ধমনীর রক্ত টগবগিয়ে উঠল হঠাৎই। তার শক্ত হাত দুটো মা-সোয়ের দুই কাঁধে উঠে এসে থাবার মত আটকে গেল। সামনে ঝুঁকে এল নিবারণ। ঈষৎ ঝাঁকুনি দিয়ে মৃদু-কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, তার মানে ?

কাছাকাছি দুজোডা চোখ দুজনের। কয়েকটা নিঃসীম নীরব মুহূর্ত। শেষবারের মত একটা অব্যক্ত আকুতি ঠেলে আসতে চাইল মা-সোয়ের চোখে। কণ্ঠস্বরও বদলে গেল। বলল, মানে কিছু না, আমি জানি তুমি ভাল লোক, ভদ্রলোক, তুমি ওকে রক্ষা করো—

আরো কিছু বলত হয়তো, বলার অবকাশ পেল না। এক নির্মম হ্যাঁচকা টানে লোকটার বুকের ওপর এসে পডতে হল তাকে। লোহার মত দুটো শক্ত হাতের নিষ্পেষণে ওই বুকের ওপর নারী-দেহ ভেঙেচুরে একাকার হবার উপক্রম। তবু মা-সোয়ে মুখ তুলে লোকটাকে দেখতে চেষ্টা করল একবার। দেখা হল না। হিংস্র আক্রমণে অধর বিদীর্ণ হয়ে যাবে বুঝি। দুই হাতের আর দুই ঠোঁটের নির্মম গ্রাসে মা-সোয়ের সর্বাঙ্গ নিষ্প্রাণ, শিথিল !

খানিক বাদে নিবারণ ছেড়ে দিল তাকে। ক্রূর দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখল, বিকারের ঘোর কতখানি কেটেছে দেখল। অস্ফুট স্বরে বলল, এবারে বুঝে নাও

কেমন ভাল লোক আর ভদ্রলোক আমি।...বুঝে থাক তো যাও এখন, নইলে আজ এখানেই থাকতে হবে।

মা-শোয়ে চিত্রার্পিতের মতই চেয়ে রইল খানিক। বিমূঢ়, হতবুদ্ধি সে। আজ তিন বছর ধরে যাকে দেখে আসছে, এ সেই লোকই কি না বুঝে উঠছে না। দিশা ফিরল। বসন সম্বৃত করে আস্তে আস্তে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর এক-পা দু-পা করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিবারণ উঠে অস্থির চিত্তে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল খানিকক্ষণ। অস্থিরতার কারণ নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব। একবার মনে হল, বেরিয়ে আবার গিয়ে ধরে নিয়ে আসে মেয়েটাকে।...কিন্তু আজ না। সময় হলে তো আনবেই। ঠাণ্ডা মাথায়ই আনবে। নিজের উদ্দেশেই অশ্রাব্য কটূক্তি করে উঠল একটা। এ ধরনের মতিভ্রম বিপদের সূচনা করে। এ রকম কিছু থেকে বিপদের সূত্রপাত হয়। হঠাৎ এ-কাণ্ড করতে গেল কেন সে? মেয়েটা ঘরে গিয়ে কি বলবে? কিভাবে তাতাবে উবা-সকে?

নিজেকে ভয়ানক নির্বোধ মনে হতে লাগল নিবারণের। ছটফটানি বাড়তেই থাকল। ঘণ্টা দুই বাদে লুঙ্গি-পরা অবস্থাতেই জামাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মা-সোয়ে কিছু একটা জট পাকিয়ে তোলার আগে উবা-সকে ধরা দরকার। তাকে ডেকে খোলাখুলি কিছু বলা দরকাব, বোঝানো দরকার। বিকারগ্রস্ত মেয়েকে বিশ্বাস করে না নিবারণ। লোকটার মগজে সেই বিকৃতির ছোঁয়াচ লাগলে এক রাতের মধ্যেই অঘটন ঘটে বসতে পারে। তার আগেই জল ঢালা দরকার—উবা-সকে দরকার।

দরজা খুলল মা-সোয়ে। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল। সরে গেল না, ভিতরে আসতেও বলল না। ওই মূর্তি দেখেই নিবারণের স্নায়ু তেতে উঠছে আবার। আবারও মনে হচ্ছে, ছেড়ে না দিলেই হত, বিকারের শেষ করে দিলেই হত।

উবা স কোথায়?

ফেরে নি! আবছা আলোয় দৃষ্টি-বন্দী করার চেষ্টা মানুষটাকে।—তাকে কি দরকার, অনুতাপের কথা বলবে?

নিবারণ স্বস্তি বোধ করল একটু। জবাব দিল না। কোথাও দাঁড়িয়ে উবা-স'র জন্যে অপেক্ষা করবে কি না ভাবছে।

খুব শান্ত মুখে মা-সোয়ে বলল, তাহলে আরো বেশি ভুল করবে। এই গোটা দ্বীপের মধ্যে একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস করে সে। এ বিশ্বাস ভাঙলে তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। তখন তোমার ওই সবগুলো মোড়ক একসঙ্গে

গলায় ঢালবে সে। তার ফল কি হতে পারে তুমিই ভাল জান।

থামল একটু। দুই চোখ মুখের ওপর আটকে আছে তেমনি। আবার বলল, যা করেছ, উষা-সকে বলতে যেও না কিছু।...আজ যে জন্তেই হোক মাথার ঠিক নেই তোমার। আমার এখনো বিশ্বাস তুমি খারাপ লোক নও, তুমি ভাল লোক। তোমার সঙ্গে আমার কথা এখনো শেষ হয় নি, আমি আবার যাব তোমার কাছে।

দরজা দুটো আস্তে আস্তে মুখের ওপরেই বন্ধ করে দিল। নিবারণ নির্বাক দাঁড়িয়ে। পায়ে পায়ে একসময় ঘরের রাস্তায় হাঁটতে লাগল। এখনো বিকারই ভাবতে চেষ্টা করছে সে, ভালবাসার বিকার। কিন্তু ঠিক সেভাবে ভাবতে পারছে না। থেকে থেকে মনে হচ্ছে, মেয়েটা যেন কি একটা জোরের ওপর দাঁড়িয়ে। কি জোর, কিসের জোব ঠাওর পাচ্ছে না।

॥ চার ॥

ভবিষ্যতে এই চোরাই কারবার একদিন গোটাতে হবে নিবারণ জানত। চিরকাল এক জায়গায় একভাবে এ ধরনের কারবার চলে না। তবে জায়গাটা মায়াবন্দর বলেই সেই ভবিষ্যতটা খুব কাছে মনে হয় নি তার।

কিন্তু গোটাগুটি একটা সমাপ্তির জাল এত কাছে এগিয়ে এসেছে, ভাবতে পারে নি। কেউ পারে নি।

জাল বিছিয়েছে টিরকী। তলায় তলায় অনেকদিন ধরেই অনুসন্ধান-রত সে। এই নারী-দুর্লভ দ্বীপে যৌবন বেপরোয়া হলে ঘাড়ে এক-মাথা নিয়েই কতদূর এগোতে পারে নিবারণেরও ধারণা ছিল না।

দরজীর ওই দোকানের আয়ে অমন বাবুয়ানী করা যেতে পাবে টিরকী কোনদিনও বিশ্বাস করে নি। আর, সৌখীন শেল বিক্রি করে আর একজন এমন দাপটে দিন কাটাচ্ছে তাও না। আভাসে অনেকটাই বুঝেছে। হাতে-নাতে ধরবার মত হদিস কিছু পায় নি এতদিন।

সেটা পেল। কিন্তু সে-ও বুদ্ধিমান লোক নয় খুব। পেয়েও ভুল করলে একটু।

নাট-মার্চেন্ট বাবুটির পিছুনে অনেকদিন ধরেই লেগে ছিল টিরকী। তার বাড়িটাও ওর ঘরের লাগোযা। অনেকদিনের চেনা। টিরকী তাকে দেখলেই সেলাম ঠোকে। ওই পয়সাওয়ালা লোকের উষা-স'র ঘরে যখন তখন আসাটা

সন্দেহের ব্যাপার বৈকি। নেশারীর নেশার ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটলে মাথায় কেমন আগুন জ্বলে দাউ দাউ করে, তাও স্ব-চক্ষে দেখেছে, স্ব-কর্ণে শুনেছে। উবা-স সেদিন সত্যি কথা বলে নি নিবারণের কাছে। ভয়টা ব্যক্ত করতে গিয়েও করে উঠতে পারে নি। আগের দিন সে নেশায় মৃতপ্রায় যখন, ওই নাট-মার্চেণ্ট বাড়ি বয়ে এসেছিল মাল সংগ্রহ করতে। মাল না পেয়ে আর উবা-স'র ওই অবস্থা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল সে। মাল বাড়ি পৌছে দিয়ে আসার কথা ছিল তার, তার বদলে এই! চিৎকার চেঁচামেচি করে যথেচ্ছ গালাগাল করেছে সে। জবাবে, ওই পয়সাওয়ালা লোককেও বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে মা সোয়ে। লোকটা শাসিয়ে গেছে, দেখে নেবে—।

তারপর টিরকী এসেছিল ভাল মানুষের মত। উবা-সকে মৃত ভেবে প্রথমে আঁতকেই উঠেছিল সে। তারপর সব বুঝেছে। আর, নাট-মার্চেণ্টের গর্জন তো নিজের কানেই শুনেছে। ঘর থেকে তাকেও বার করে দিয়েছিল মা-সোয়ে।

টিরকী সেইদিনই নাট-মার্চেণ্টকে গিয়ে ধরেছে। আগে যে বাসনা আভাসে ব্যক্ত করেছিল, সেদিন সেটা স্পষ্ট করেই বলেছে। বলেছে, সেও ওই নেশা সংগ্রহের চেষ্টায় আছে অনেকদিন ধরে। আগে উবা সর কাছ থেকে সেও নেশা পেত, এখন পায় না। হুজুরও শিগগিরই আর পাবেন না—কারণ কারবারীরা প্রায় সব মালই এখন চড়া দামে বাইরে পাঠাচ্ছে। কিন্তু টিরকীর স্থির বিশ্বাস, সে নিজেই ওই নেশার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবে, ওদের থেকেও ভাল মাল তৈরী করতে পারবে। পারলে তখন আর হুজুরের এভাবে ভুগতে হবে না। যত মাল চাই সে-ই দেবে। কিন্তু আপাতত মুশকিল হয়েছে, ওদের মালের নমুনা চাই কিছু—সেটাই পাচ্ছে না।

নাট-মার্চেণ্ট বাবুর তখন কাঁদতে বাকি। দোতলার হলঘরে পাঁচ-ছ জন ইয়ারবকশী নেশার অপেক্ষায় বসে। মাথায় জল ছিটোবার লোকও প্রস্তুত। এ অবস্থায় যা স্বাভাবিক তাই হল। খানিকটা নমুনা টিরকীর হাতে এল।

আর সেটা হাতে পেয়ে টিরকী ভুল করল।

তার ঘুম ভাঙল তিন দিন বাদে। তার পরেও দুদিন পর্যন্ত ঝিমুনি ছাড়ল না। শুনল, নাট-মার্চেণ্ট বাড়ি বয়ে তার খোঁজে এসে ফিরে গেছে।

সেখান থেকেও আর নমুনা সংগ্রহের আশা নেই।

একে একে আট-দশ দিন কাটল আরো। নিবারণ দাস আবার বোটে বেরিয়েছে। সামনে পরব আসছে একটা। টিরকী এই প্রতীক্ষাতেই ছিল। পুলিসের সর্দারের সঙ্গে দেখা করে এই মারাত্মক নেশার কথা বলেছে সে।

নিবারণ আর উবা-স দুজনের কথাই বলেছে। টিরকী কেমন লোক জানে তারা। কিন্তু কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে আপত্তি নেই তাদের।

হাতে-নাতে ধরার প্রতীক্ষা। সেই দিন আজ। শিকার আজ ফাঁদে পা দেবে। টিরকীর দুটো কাঁটাই দূর হবে। আজ সে মদ ছোঁয় নি, এমনিতেই উত্তেজনায় বুকের মধ্যে রক্ত নাচছে। কিন্তু গত রাত্রিতে মদে চুর হয়েছিল। সেই নেশার ঘোরে বহু-ঈপ্সিত নারীদেহ জয়ের নগ্ন ভাস কারো কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিল কিনা আজ আর তা স্মরণ নেই।

বিকেলের দিকে দরজীর দোকানে বসেছিল মা সোয়ে। সময় না কাটলে মাঝে মাঝে আসে। বসে। সে এলে দোকানে ভিড় হয় একটু। বাইরে এদিকে-ওদিকে লোক দাঁড়ায়। চোখ দিয়ে রমণী দেহের তাপ শোষণ করে। চলতি পথচারী দোকানে ঢুকে পড়ে ছিট বাছাই করে, দর যাচাই করে—এটা সেটা জিজ্ঞাসা করে।

গোড়ায় গোড়ায় এই দেখেই একটা অভিনব সঙ্কল্প মাথায় এসেছিল মা-সোয়ের। উবা-সকে বলেছে, টাকার জন্যে নেশা বিকির ঝামেলায় মাথা গলিয়ে কাজ নেই। এই দরজীর দোকান থেকেই তাদের বেশ টাকা হবে। মা-সোয়ে নিজে দরজীর কাজ শিখে নেবে, সকাল-বিকেল দোকানে বসবে—অনেক রোজগার হবে।

উবা-স হি হি করে হেসেছে। বলেছে, সেটাও তো নেশা বিক্রিই হল। তুই নিজের হাতে কাজ করলে লোক তো ভেঙে পড়বেই, তোর নেশায় ভেঙে পড়বে। এর থেকে ওস্তাদের নেশা বিকি অনেক ভাল, অনেক নিভয়ের।

মা সোয়ে তখনো জায়গার হালচাল বোঝে নি এতটা। ঘাবড়েছিল ঠিকই। কথাটা তো একেবারে মিথ্যে নয়।

কিন্তু আজ আর কোনো আগ্রহ নেই তার। কোনো উদ্দীপনা নেই। আজ ইচ্ছে করলে নিজেকে বাঁচিয়েই এই চোখের নেশার মূল্য আদায় করে নিতে পারে সে। দোকান ফাঁপিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু যার জন্যে করবে, আর একজনের ইচ্ছার প্রভাব থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনা আর সহজ নয়।

কোনোদিকে চোখ ছিল না মা-সোয়ের। ভাবছিল, নিবারণ ফিরলে আজ আবার একবার সেখানে যাবে কিনা। কিন্তু ওই দিনের পর থেকে রাতে আর যেতে সাহস হয় না।... সেদিন ছেড়ে দিয়েছিল। ছেড়ে দেবে ভাবে নি। এত দিনের মধ্যে আর একটা মুখের কথাও বিনিময় হয় নি। মা-সোয়ে নিশ্চিত জানে, চূড়ান্ত বোঝাপড়া একটা হবে তার সঙ্গে। কিভাবে হবে, কবে হবে, কোন্

উপলক্ষে হবে—সেটাই জানে না শুধু।

একটা লোক এসে ইশারায় বাইরে ডেকে আনল তাকে। পরিচিত নয়, তবে মা সোয়ে দেখে থাকবে তাকে। কতজনকেই দেখে।

লোকটা মাত্র কটা কথা বলে হনহনিয়ে চলে গেল। কিন্তু তাই শুনেই মা-সোয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। শুব্ধ বোবা একেবারে। সমস্ত রক্ত যেন সিরসির করে পা বেয়ে নেমে যাচ্ছে। লোকটা শুধু বলে গেছে, বাড়ি গিয়ে সাবধান হও গে যাও, পুলিস আসছে উবা-সকে ধরতে। টিরকী সব ফাঁসিয়ে দিয়েছে।

আত্মস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে মা-সোয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের রাস্তায় পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়িয়েছে। তারপর নিবারণের ঘরের দিকে পা চালিয়ে দিয়েছে।

সামনে পিছনে সব দিক থেকেই ঘর বন্ধ। নিবারণ ফেরে নি।

এক মুহূর্তও অপেক্ষা করে নি মা-সোয়ে। তৎক্ষণাৎ ঘর-মুখী রওনা হয়েছে। কিন্তু এ পথ বুঝি ফুরোবে না আর। বুকের ভিতরে মুগুরের ঘা পড়ছে। ছুটতে পারলে হত। কিন্তু ছুটতে দেখলে লোক পিছু নেবে।

ঘরের কাছাকাছি উবা-স'র সঙ্গে দেখা। মা-সোয়ের পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল আবার। ওই উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা ভীক মূর্তি সে চেনে। এ তার থেকেও বেশি।·· কিছু হয়েছে · জেনেছে সেও।

জেনেছে।

তার অনুগ্রহভাজন নেশাখোরদের একজন একটু আগে তাকে ওই একই খবর দিয়ে গেছে। যে দিয়েছে সে জঙ্গলে কাজ করে, পুলিসের লোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ।

উবা-সও ছুটেছিল ওস্তাদ ফিরল কিনা দেখতে।

'বাড়ি।

মূর্তির মত বসে আছে মা-সোয়ে। উবা স কাঁপছে থরথরিয়ে। ত্রাসে দিশেহারা সে। মৃতের মত বিবর্ণ পাংশু। মা-সোয়েকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পালিয়ে যাবার কথা বলছে বার বার। কিন্তু মা-সোয়ে নিষ্প্রাণ পাথরের মত বসে। সে জানে এই দ্বীপ থেকে কোথাও পালানো যায় না। আজ না হোক কাল ধরা পড়বে। পালানোটাই তখন সব কিছুর প্রমাণের সামিল হবে।

সন্ধ্যা হয় হয়। নিবারণ ফিরেছে কিনা জানার উপায় নেই। এখান থেকে তার ঘর অনেক দূর। হাঁটু মুড়ে মা-সোয়ের কোলে মাথা গুঁজে আছে উবা-স। থেকে থেকে শিশুর মত অসহায় আকুতি তার, বাঁচাও, এবারের মত আমাকে

মা-সোয়ে জানে, ওই দুর্বল লোককে ধরে নিয়ে গেলে কি হবে। মারের চোটে আধমরা করেই কথা বার করে নেবে, সব কবুল করিয়ে নেবে। তারপর শাস্তির যূপকাষ্ঠে ঠেলে দেবে।

মা- সোয়ে ভাবছে। এমন মর্মান্তিক ভাবনা আর কখনো ভাবে নি। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানটিতে বসে ভাবছে সে। মাঝখানে নয়, মৃত্যুই কাছে এগিয়ে আসছে। ···ছোরা আছে তার কোমরে গোঁজা একটা। সর্বক্ষণই থাকে। নারী-মাংস-লোলুপ পশুর দখল থেকে নিজেকে রক্ষার দায় পায়ে পায়ে। কিন্তু এটার কথা সবসময় মনেও থাকে না এখন। সেই রাতে একজনের গ্রাসের মুখেও মনে পড়ে নি এটার কথা।

কিন্তু আজ পড়ছে। এখন পড়ছে। সমূলে ওটা বুকে বসিয়ে দিয়ে চির-কালের মত বাঁচিয়ে দেবে এই অসহায় দুর্বল লোকটাকে? রক্ষা করবে?

একসময় ঠেলে তুলল তাকে। আরো কিছু মাথায় এসেছে তার। বিদ্যুৎ চমকের মত আরো কিছু মনে হয়েছে।

ঘরে মাল আছে?

উবা-স মুখ তুলল। ঘাড় নাড়ল। আছে।

দাও।

ঘরে নয়, উবা-সর পকেটেই ছিল। সেগুলো নিয়েই ওস্তাদের কাছে ছুটে বেরিয়েছিল সে। পকেট থেকে গোটাকতক মোড়ক বার করে তার হাতে দিল।

মা-সোয়ে জিজ্ঞাসা করল, আর কিছু আছে?

তাড়ি আছে।

তাড়ি অনেক ঘরেই থাকে। সেটা এমন কিছু অপরাধের নয়। মোড়ক-গুলো দেখিয়ে উবা-স অধীর কণ্ঠে বলল, কিন্তু এগুলো না পেলেও তো ওরা ধরে নিয়ে যাবে আমাকে।

যাবে না। বসো ঠাণ্ডা হয়ে।

মা-সোয়ে উঠে দ্রুত অন্য ঘরে চলে গেল। ফিরল তক্ষুনি। হাতে তাড়ির বড় গেলাস। সেটা রেখে একটা মোড়ক খুলে প্রায় আধাআধি ঢেলে দিল তাড়ির গেলাসে। তারপর আঙুলে করে সাদাটে পদার্থগুলো মেশাতে মেশাতে তাকাল তার দিকে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

আর কোনদিন নেশা করবে?

না, কোনদিন না! কিন্তু—

খাও।

উবা-স ব্যগ্র হাতে গ্লাস টেনে নিল। মা-সোয়ের তাকে এ জিনিস খেতে বলাটা সব থেকে বেশি অবিশ্বাস্য। সে কিছু বুঝতে পারছে না। বুঝতে চাইছেও না। সে শুধু বাঁচতে চায়, নির্ভর করতে চায়।

খেতে গিয়েও থমকাল।— কিন্তু ওস্তাদকে ধরলেও তো সর্বনাশ হবে, ধরা পড়ে যাব!

খাও তাড়াতাড়ি!

ঢকঢকিয়ে গেলাসটা খালি করে দিল উবা-স। মা-সোয়ে আরো এক গেলাস তাড়ি এনে দিল তাকে। সেটুকুও নিঃশেষ।

একটু বাদেই শয্যা নিল সে। মা-সোয়ে কি ফন্দি করেছে বা ফন্দি কিছু করেছে কিনা সেটা নিয়ে আর তেমন মাথা ঘামানোর অবকাশ পেল না উবা-স। তার স্নায়ুর এই আকস্মিক ধকলের ওপর এ বিষ খানিকটা অমৃতের কাজ করেছে।

মা-সোয়ে বাইরের ঘরে এসে বসল চুপচাপ।

প্রায় দু ঘণ্টা কেটে গেল আরো।

এতটা সময় পাবে জানলে নিবারণের ওখান থেকে একবার ঘুরে আসত হয়তো।…কিন্তু বাইরে কেউ ওত পেতে আছে কিনা তাও জানে না। ওরা আগে এখানেই আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুর্বল লোককেই আগে চড়াও করার রীতি। টিরকীই আগে তাদের এখানে ঠেলে নিয়ে আসবে।

এল।

সাদা পোশাকের পাঁচটি মূর্তি। টিরকী নেই সঙ্গে। উবা-স'র খোঁজ করল তারা।

মা-সোয়ে জানাল—ঘুমুচ্ছে।

তারা বলল ডেকে দিতে।

মা-সোয়ে জানাল, ডাকা যাবে না, ঘুম এখন ভাঙবে না।

তারা দেখতে চাইল।

মা-সোয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

তারা দেখল। তাড়ির গন্ধ পেল। কিন্তু অবস্থাটা শুধু তাড়ির নেশার মতই লাগল না তাদের। তারা জিজ্ঞাসা করল, আর কি খেয়েছে?

মা-সোয়ে রুক্ষ জবাব দিল, কি করে জানব কি খেয়েছে। তোমরা কে?

পরিচয় দেবার জন্তে সাদা পোশাকে আসে নি তারা। বলল, তারা খদ্দের। মাল নিতে এসেছে। মাল পৌঁছে দেবার কথা ছিল, মাল যায় নি। মাল কোথায়

আছে বার করে দিতে বলল তাকে।

মা-সোয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তাদের মুখের দিকে। বিস্ময়ে হতভম্ব খানিকক্ষণ। তারপর বলল, তোমরা কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না।

তারা ধমকে উঠল, ঠিকই বুঝতে পারছে সে, বার না করে দিলে বিপদ হবে।

সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি-মূর্তি মা-সোয়ে। চেঁচিয়ে উঠল, তোমরা যাবে কিনা এখন এখান থেকে আমি জানতে চাই ? পরক্ষণেই ঠাণ্ডা হল একটু। ঈষৎ আগ্রহে বলল, ও যদি টাকা নিয়ে কথার খেলাপ করে থাকে, ওকে তুলে নিয়ে জঙ্গলে পুঁতে রাখ গে যাও, আমি কাউকে কিছু বলব না—ও লোক ভাল না।

পাঁচ-জোড়া চোখ ছেঁকে ধরে ছিল তাকে। এ ওর মুখের দিকে তাকাল একবার। একজন জিজ্ঞাসা করল, এই নেশা কতক্ষণ থাকবে ?

একটু ইতস্তত করে মা-সোয়ে জবাব দিল, কাল তুপুর নাগাত।

ওদের চোখগুলো ঘোরাল হল আবারও। অনির্দিষ্টভাবে ঘরের চারদিকে খোঁজাখুঁজি করল একটু। উবা-স'কে ধরে নাড়াচাড়া ঝাঁকাঝুকি করল একদফা। তারপর চলে গেল। এখানে আর কত সময় নষ্ট করবে তারা—এই লোকটা তো থাকলই এখানে।

মা-সোয়ে জানে কোথায় গেল তারা। চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ। বুকে আবার হাতুড়ির ঘা পড়ছে।

ওরা দৃষ্টির আড়াল হয়েছে মনে হতেই ঘরের দরজা আবজে দিয়ে রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের পথ ধরে ছুটল সে।

নিবারণ দাস নিবিষ্ট মনে বোতলে মাল ঠেসে রাখছিল। তিনটে বোতল ভরা হয়েছে, আরো তুটো বাকি। একাজে কোনরকম ক্লান্তি নেই তার, অবহেলা নেই। হাতের কাজ পরিপাটী করে শেষ না করে সে ঘুমুতে পারে না।

হাত থেমে গেল। কড়া নাড়ার শব্দ বাইরের দরজায়। কড়া-নাড়ার ধরনটা চেনা লাগছে না। এ সময়ে তাকে বিরক্ত কেউ করে না বড়।

উঠে হাত ধুয়ে হাত মুছে দরজাটা ভেজিয়ে বাইরের ঘরে এসে দরজা খুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ একটা। নিবারণ বিপদ চেনে, বিপদের গন্ধ পায়।

নিবারণ দাস কার নাম ?

আমার···।

পাঁচটা লোকই ভিতরে ঢুকে পড়ল। একজন গলা খাটো করে জানাল,

তারা উবা-স'র কাছ থেকে আসছে—উবা-স পাঠিয়েছে তাদের। মাল নিতে এসেছে, টাকাও এনেছে। বেশি মাল চাই—

নিবারণের পায়ের নীচে মাটি দুলছে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন স্থূল ধাপ্পাও না বোঝার কথা নয় তার। কিন্তু চিন্তার অবকাশ নেই, ভাবনার অবকাশ নেই। বিনা প্রস্তুতিতে, একেবারে অতর্কিতে শেষের চরম মুহূর্ত উপস্থিত।

নিবারণ ঘুরে দাঁড়াল। তাক থেকে একে একে শেল নামাতে লাগল। ওরা ভাবছে, ওগুলোর আড়াল থেকেই ঈপ্সিত বস্তু বার হবে। কিন্তু কিছুই বেরুল না। নিবারণ মুখের দিকে চেয়ে রইল।

এ সব কী!

আরো দেখাব? এমন সংযমের পরীক্ষা নিবারণ আর বোধহয় জীবনে দেয় নি।

তার কানের কাছে একজন মুখ এনে বলল, তুমি বুঝতে পারছ না আমরা কি জন্যে এসেছি?...মাল চাইছি, নেশার মাল। তোমার কি চক্ষু ভয় নেই।

নিবারণ বিমূঢ় মুখে চেয়ে আছে।

পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে একজন তার নাকের সামনে দুলিয়ে দিল। বলল, মাল বার কর।

নিবারণ আরো নির্বাক, আরো বিমূঢ়।

স্ব-মূর্তি ধারণ করল লোকগুলো। করবে নিবারণ জানে। আর অব্যাহতি নেই তাও জানে। পোশাকের আড়াল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বেরুল। কে তারা সেই পরিচয়ও। একজন এগিয়ে এসে বেশ গোটা কয়েক ঝাঁকুনি দিল নিবারণকে। কঠোর তর্জন করে উঠল, কোথায় কি আছে বার কর—

নিবারণ বোবা।

শেলগুলো তচনচ করে তারা বাইরের ঘরটা অনুসন্ধান করে নিল আগে। তারপর নিবারণকে একটা ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে দিল। চল, ভিতরে সার্চ করব।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী যেমন অন্তিম মুহূর্তে অনেক সময় অবশ অঙ্গের সাড় ফিরে পায়, নিবারণ দাসও এই শেষ মুহূর্তে বহুদিনের বিস্মৃতি-বিলগ্ন অতীতটাকে হঠাৎই ফিরে পেল যেন। কালাপানি পাড়ি দেবার আগে সে যেমন ছিল তাকে, নগেনকে খুন করতে যাওয়ারও অনেক আগে যে সুস্থ, নিশ্চিন্ত মানুষটা তার মধ্যে ছিল—তাকে। বাঁচার তাড়নায় সেই নিবারণই এক অব্যক্ত হতাশায় সকলের মুখের দিকে তাকাল একবার।

কিন্তু ওরা যাকে ধরেছে, সে সেই নিবারণ নয়, এই নিবারণ। কারো মুখে একটা মায়া-দয়ার রেখা পর্যন্ত নেই।

ঠেলতে ঠেলতেই ভিতরে নিয়ে এল ওরা তাকে। এবারে ওই ঘরটায় ঢুকবে, তারপরেই সব শেষ।

অনেক বড় বিস্ময় বাকি ছিল তখনো।

ঘরে ঢুকে হঠাৎ বিমূঢ় সকলে। নিবারণ দাসও, যারা এসেছে তারাও।

চৌকিতে বসে মা-সোয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে এদিকেই চেয়ে আছে। নিবারণ কি ভুল দেখছে ? স্বপ্ন দেখছে ? একটা বোতলের চিহ্নও নেই, কোনো কিছুরই চিহ্ন নেই।

লোকগুলোকে দেখে আচমকা ঘাবড়ে গিয়ে অস্ফুট একটা ভীতিসূচক শব্দ করে উঠল মা-সোয়ে। ধরা আর কেউ পড়ে নি, ধরা যেন শুধু সেই পড়েছে।

· তোমরা !

পুলিসের লোকেরা হতভম্ব। তারা ভেবে পাচ্ছে না, মেয়েটা কখন এল, কোথা দিয়ে এল। দলের প্রধান এগিয়ে এসে বাহু ধরে চৌকি থেকে টেনে নামাল তাকে। জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুই এখানে কেন ? কোথা দিয়ে এলি ?

মা-সোয়ে পাংশুমুখে পিছনের উঠোনের দিকে তাকাল শুধু একবার। অর্থাৎ, কোথা দিয়ে এল সেটাই দেখিয়ে দিল।

দুজন লোক এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে টর্চ ফেলে দেখেও নিল।

ছোট ঘর। আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নেই। অনুসন্ধান করতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। বাইরেটা দেখে এল আর একবার। ব্যর্থতারও আক্রোশ আছে এক ধরনের। মেয়েটা এখানে কেন জানা দরকার। সে-ই কিছু করেছে কিনা জানা দরকার।

আবারও হাত পড়ল কাঁধে। আবারও ঝাঁকানি। আবারও কঠোর প্রশ্ন, মাল কোথায় লুকিয়েছিস ?

মুখ তুলে প্রশ্নটাই যেন বুঝতে চেষ্টা করছে মা-সোয়ে। নিবারণ নির্বাক দ্রষ্টা। সে যা দেখছে ঠিক দেখছে কিনা এখনো সংশয়।

তুই এ সময়ে এখানে কেন ? গর্জে উঠল আর একজন।

এ প্রশ্নটা না বোঝবার কথা নয়। মা-সোয়ে তেতে উঠছে। ঈষৎ রূঢ় জবাব দিল, আমার খুশি আমি আসব, তোমাদের কী ?

ঠাস করে সজোরে গালে চড় পড়ল একটা। আঙুলের দাগ কটা টকটকিয়ে

উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জানি, বল্ শিগগির এখানে কেন এসেছিস—ওর নেশার জিনিস কই ?

সেই মুহূর্তে চোখে আগুন ঝলসে উঠল মা-সোয়ের। এক ঝটকায় হাত দুয়েক সরে দাঁড়াল। তারপর অব্যক্ত আক্রোশে দু হাতে করে বুকের জামাটা অন্তর্বাসসুদ্ধ টেনে ছিঁড়ে দু ফাঁক করে দিল একেবারে। জলন্ত তরল আগুন নিঃসৃত হল যেন কণ্ঠ থেকে।—নেশার জিনিস কোথায় দেখতে পাচ্ছ না ? কেন আসি বুঝতে পারছ না ? দেখ দেখ দেখ, কত দেখবে নেশার জিনিস, কত বুঝবে বুঝে যাও কেন আসি !

বক্ষবাস বিচ্ছিন্ন এক আকস্মিক নগ্নতার ঘায়ে একসঙ্গে থমকে গেল সকলে। হকচকিয়ে গেল। নিবারণও।

উন্মত্ত রোষে অগ্নি-মূর্তি নারী চোখের আগুনে আর বুকের আগুনে সামনের সব কটা মুখ একসঙ্গে ঝলসে দিয়ে বলে উঠল, আমার খুশি আমি এখানে আসি, তাতে তোমাদের কী ? আমার খুশি আমি টিরকীর কাছে যাব না, তাতে তোমাদের কী ? টিরকীর জন্যে তোমরা আমার পিছু নেবে কেন ? কেন কেন কেন ?

বিকারগ্রস্ত রোগীর মত কণ্ঠস্বর চড়তেই লাগল মা-সোয়ের। তীব্র, তীক্ষ্ণ, জ্বালাময়ী।—আর কি জানতে চাও তোমরা ? আর কি বুঝতে চাও তোমরা ? উবা সকে আমি ওই রকম ঘুম পাড়িয়ে এখানে আসি। আমি তার নেশার সঙ্গে খারাপ জিনিস মেশাই। তামার জল মেশাই, ঘরের ঝুল মেশাই, মাকড়সার জাল মেশাই। আমি আমি আমি ! টিরকীর ফন্দিতে উবা-সকে ঘুম পাড়িয়ে আমি তার কাছে না গিয়ে এখানে আসি ! এইখানে ! টিরকীকে বল গে যাও—উবা-স'র নেশা ভাঙিয়ে তাকেও বল গে যাও—ওদের নিয়ে তোমরা জাহান্নমে যাও !

যেখানেই হোক, তারা চলে গেছে অনেকক্ষণ।

গেছে কিনা দেখার জন্যেই নিবারণ যেন বাইরের দিকটায় এসেছিল। কিন্তু এসে আর ঘরে ঢোকে নি, সেই থেকে বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। রাত বাড়ছে।

বুকের ভিতরে কত কালের কত যুগের বিস্মৃতপ্রায় একটা উৎসের মুখ খুলে গেছে। কি সেটা, কিসের উৎস, নিবারণ জানে না। নিবারণ তার আলোড়নটা উপলব্ধি করছে শুধু। অব্যক্ত, বোবা আলোড়ন।

অনেকক্ষণ বাদে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল। মা-সোয়ে স্থির

মূর্তির মত বসে আছে চৌকির ওপর। বুকের বিচ্ছিন্ন বাস যতটা সম্ভব টেনে ঠিক করে নিয়েছে। শ্রান্ত অবসাদগ্রস্ত—কিন্তু শান্ত, স্থির। এই মা-সোয়েকেই কি নিবারণ দেখে আসছে আজ ক বছর ধরে?

কি জানি। নিবারণ জানে না।

পায়ে পায়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। মা-সোয়ে মুখ তুলল। তাকাল।

চৌকির একধারে বসল নিবারণ। আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে বলল, এভাবে আমাকে বাঁচালে কেন?

মা-সোয়ে চেয়েছিল। চেয়েই রইল। অস্ফুট জবাব দিল, উবা স'র জন্য। কিন্তু বেঁচে খুশি হয়েছ?

ঘন-কালো দুটো চোখ নিবারণের মুখের ওপর আটকে আছে। চকচক করছে। জবাবের প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু নিবারণের গলার কাছে কি যেন আটকেছে। কণ্ঠস্বর বিচ্যুত হয়েছে।

উত্তর শোনা গেল না বটে, কিন্তু জবাব মিলল। নিজের ওই দুই চোখেই জবাবটা উপলব্ধি করে নিল মা-সোয়ে। তার দৃষ্টিটা বদলাল। প্রত্যাশায় নিবিড় হল। বলল, তাহলে আমাকেও তুমি ভিক্ষা দাও এবারে—উবা-সকে ফিরিয়ে দাও বন্ধু, তাকে ফিরিয়ে দাও—নেশা দিয়ে তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। আমাকে বাঁচতে দাও, ও ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই!

কালো দুই চোখ জলে ভরে গেল। গলার স্বর বুজে এল।

নিবারণ আর দেখতে চাইছে না। আর শুনতে চাইছে না। সমস্ত ভিতরটা দুমড়ে দুমড়ে ভাঙছে তার। একটা জমাট-বাঁধা বাষ্প সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে বুক নিঙড়ে হাড়-পাঁজর মুচড়ে গুমরে গুমরে ঠেলে উঠতে চাইছে ওপরের দিকে। কিন্তু দুচোখ খরখরে শুকনো—এ মর্মচ্ছেদী যাতনার অবসান তার হবে কেমন করে?

নিবারণ উঠে দাঁড়াল। মাথা নেড়ে আশ্বাসও দিতে চেষ্টা করল একটু। তারপর বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়াল। মাথার ওপর তারা-ভরা আকাশ।... তমস্বিনী রাত্রি।

চার দিনের দিন সকালে উবা-স এল। সঙ্গে মা-সোয়ে। নিবারণই ডেকে পাঠিয়েছে দুজনকে। উবা-স'র বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি এখনো ভাল করে। তার কাছে প্রায় সবটাই দুর্বোধ্য এখনো।

নিবারণ মা-সোয়েকে জিজ্ঞাসা করল, যাবার ব্যবস্থা সব রেডি?

মা-সোয়ে হাসিমুখে মাথা নাড়ল। রেডি।

বেশ। উবা-স'র দিকে তাকাল নিবারণ। বলল, এরপর একটা ভাল জায়গা দেখে স্থিতি হয়ে বসো। যা-হোক কিছু কাজকর্ম করো। আর, ওর ওপর নির্ভর করো।··তোমার বউয়ের ওপর। বুঝলে?

উবা-স ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। নিজের অগোচরে মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

চৌকির ওধার থেকে নিবারণ একটা রঙ-চটা টিনের পেঁটরা এনে মা-সোয়ের হাতে দিল। সঙ্গে চাবিও। বললে, এটা নিয়ে যাও।

যাবার আগে কিছুদিন চলার মত টাকা হাতে দেবে মা-সোয়ে জানত। সে না চাইলেও নিবারণ ভরসা দিয়েছিল, ভবসা দিয়ে অবিলম্বে ওদের এখান থেকে যাবার ব্যবস্থা কবতে বলেছিল। কিন্তু এটা কি দিল ঠিক বুঝে উঠছে না।

কি আছে দেখার জন্য তোরঙ্গটা খুলেই ফেলল মা সোয়ে। ওপরের কয়েক ভাঁজ কাপড সরাতেই দু চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম। উবা স'রও। অজস্র টাকা। থরে থবে নোট সাজানো। এত টাকা একসঙ্গে তারা চোখে দেখে নি কখনো। কল্পনাও কবে নি।

মা-সোয়ে আঁতকে উঠল প্রায়, এত কেন! এত নিয়ে কি করব আমরা?

নিবারণ বলল, নিয়ে যাও। সাবধানে নিও।

মাথা ঝাঁকিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা কবল মা সোয়ে। বিহ্বল আকৃতি।— তোমার জন্যে কি থাকল বন্ধু? তুমি কি রাখলে?

নিবারণ হাসছিল। হেসেই মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, অনেক থাকল, অনেক রেখেছে।

বিশ্বাস কববে কিনা মা-সোয়ে বুঝে উঠছে না ঠিক। ·অবিশ্বাস করার মত নয়। ও-রকম হাসি ওই মুখে আব কখনো দেখে নি মা-সোয়ে। ওই হাসি দেখেই বিশ্বাস করল, নিশ্চিন্ত হল, তারপর নিজেও হাসতে লাগল। আনন্দ ধরে না। হঠাৎই দু হাত বাড়িয়ে নিবারণেব মাথাটা ধরে মুখের কাছে টেনে নিয়ে এসে কানে কানে ফিসফিস করে বলল, আমি বলি নি বন্ধু তুমি ভাল লোক?

মাথাটা ছেড়ে দিল। মা-সোয়ে হাসছে। দুই গাল বেয়ে চোখের জলও গড়াচ্ছে খেযাল নেই।

উবা স হাঁ কবে দেখছে দুজনকে।

নিবারণ তেমনি হাসছে। এখন আর চোখ দুটো অত খরখরে শুকনো নয়। জল না আসুক জলের আভাস দেখা দেয়। চোখের কোণ দুটো চিকচিক করে। সিরসির করে।

সিরসির জাহাজে বসেও করেছে নিবারণের। যত বার ওদের কথা ভেবেছে ততবার করেছে। আর এই কালো সমুদ্র কালো জলের ওধারে যত বার আর একজনের কথা মনে পড়েছে, ততবার করেছে। নিবারণ দেশে চলেছে। কালো সমুদ্র দেখতে দেখতে চলেছে। কিন্তু সমুদ্র আর অত কালো লাগছে না তার চোখে। এক যুগ আগে আসার সময় যত কালো লেগেছিল ততো কালো লাগছে না। এক যুগ ধরে এই সমুদ্র-ঘেরা দ্বীপের ওপর বাস করে যত কালো লাগত, তত লাগছে না।

রমণীর ভালবাসা নিবারণ পেয়েছে কিনা জানে না। কিন্তু নিবারণের ভাবতে ভাল লাগছে, এই কালো জলের ওধারে ছোট্ট এক ঘরের কোণে সমুদ্রপরিমাণ ভালবাসা বুকে করে উন্মুখ প্রতীক্ষায় তার জন্যেও কেউ একজন বসে আছে।···প্রায় মা-সোয়ের মতই কেউ একজন।

নিবারণ তার কাছেই ফিরে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ভাগ

সমুদ্র সফেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাহিনী ও চরিত্র-সমাবেশ সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

বাংলার মোহনা ছাড়িয়ে কালাপানি।

কালাপানির অতলান্ত কালো ত্রাস। তার ওধারে দ্বীপের সারি সমুদ্রগর্ভ বিদীর্ণ-করা দুশ্চর কঠিনের বিপুল মহিমা। পাহাড়ে ঘেরা। অরণ্যে ছাওয়া। সুন্দর, শ্যামগম্ভীর। প্রকৃতির প্রগল্‌ভ যৌবনের তন্ময়তা পাহাড়ে, জলে, জঙ্গলে।

কিন্তু এই সুন্দরের তলায় তলায় যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তেমনি এক ভয়াল কুৎসিতের মহড়া।

কবে এখানে সভ্য মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েছিল প্রথম, ইতিহাসে তার হদিস মেলে না। গল্প আছে, আদিবাসীদের আদিপুরুষ মাভায়া তোমালা স্বজাতীয়দের পাপভারে জর্জরিত হয়ে বেশির ভাগ মানুষ পশু পাখি জলে ডুবিয়ে এই হাল করেছে দেশের। গোটা পাহাড়ী দেশটাকে সে ছোট ছোট অগণিত দ্বীপে ভাগ করে চির-বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ রেখে গেছে।

গল্প এত অল্পে শেষ হয় না। আরো আছে। মেন্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে এই বিচ্ছেদের ফলে স্বজন-বিরহ-তপ্ত আদিবাসীদের আর্ত আকূতি এসে নাকি পৌঁছেছিল অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের কানে। কোথায় অযোধ্যা আর কোথায় আন্দামান সে প্রশ্ন তুলে আখ্যানকে খাটো করে লাভ নেই। গল্প-কথা, শ্রীরামচন্দ্র সঙ্কল্প করেছিলেন, এক অতিকায় সেতু নির্মাণ করে ভারতবর্ষের সঙ্গে আদিবাসীদের এই বিচ্ছেদের ব্যথা ঘোচাবেন। কিন্তু সঙ্কল্প তাঁর পূর্ণ হয়নি। হোক না হোক, একটা সংযোগের চেষ্টা যে চলেছিল পৌরাণিক যুগ থেকে, সেটা বোঝা যায়।

আন্দামান নামের সঙ্গে এই পৌরাণিক আখ্যানের কোনো যোগ আছে কি না জানা নেই। তবে থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। কারণ, রামায়ণ-ভক্ত মালয়বাসীদের মুখে এখানকার মানুষদের নাম শোনা যায় হাণ্ডুমান। শাদা কথায় বাঁদর মানুষ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওই মালয়বাসীরা এখানে হানা দিয়ে এই বাঁদর-মানুষদের জাহাজে বোঝাই করে দাসরূপে চালান দিয়েছে।

পাটলিপুত্রে সম্রাট অশোকের দরবারে জনকতক ভারতীয় বণিক রিক্ত মুমূর্ষু অবস্থায় এসে নালিশ জানাচ্ছে জল-পথের দুর্ধর্ষ হিংস্র দ্বীপবাসীদের বিরুদ্ধে—ইতিহাসে সে খবর আছে। জলাভাবের দরুন দ্বীপে জাহাজ লাগানোর ফলে বর্বর নারকী মানুষের আক্রমণে সর্বস্বান্ত হয়ে প্রাণ নিয়ে তাদের কয়েকজন মাত্র

ফিরে এসেছে। পণ্ডিতদের অনুমান, সেই বর্বর মানুষেরা এই দ্বীপের মানুষ। যাই হোক, সেই সুদূরকাল থেকে সভ্য মানুষ জলপথে এখানে এসেছে পৃথিবীর নানা দিক থেকে। এসেছে গ্রীস থেকে, রোম থেকে, ইজিপ্ট থেকে, চীন থেকে, জাপান থেকে। কিন্তু আরণ্য-জীবনের বিঘ্ন বরদাস্ত করেনি আদিম মানুষেরা। করতে চায়নি। সংঘাত বেধেছে। হিংস্র বিভীষিকায় তারা প্রতিরোধ করেছে বার বার।

সব শেষে বসতি স্থাপনের স্বপ্ন নিয়ে এসেছে ইংরেজ। বাসনা তাদেরও ব্যর্থ হয়েছে। ক্লেশ, ব্যাধি আর এই বন্য-মানুষদের প্রতিকূলতায় স্বপ্ন তাদের খান্‌খান্‌ হয়েছে। কিন্তু তবু আশা ছাড়েনি এই এক জাতি।

আঠারশ সাতান্ন সালটি ভারতের ইতিহাসে রক্ত-চিহ্নিত।

সিপাই বিদ্রোহের পর নির্বাসন-দণ্ড নিয়ে দলে দলে এখানে চালান হয়ে এসেছিল ভারতের প্রথম মুক্তিকামী বিদ্রোহীরা। তারপর আসতে শুরু করেছিল অন্যান্য গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত আসামীরা। অল্পের জন্য ফাঁসির দড়ি এড়াতে পেরেছে যারা। কিন্তু এখানে আসার পর সাধারণ খুনী আসামীর সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীর তফাৎ ছিল না কিছু। অত্যাচারের লাগাম হাতে ইংরেজ সকলকে জুড়ে দিয়েছিল জনপদ গড়ার কাজে। জঙ্গল উড়িয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে, পাহাড়ী আঁধার ঘুচিয়ে অস্থি-মজ্জা দিয়ে এই জনপদ গড়েছে ভারতীয় আসামীরা; ক্ষমাহীন নির্যাতন আর নিপীড়নে বার বার তারা মুখ থুবড়ে পড়েছে। শাসনের কশাঘাতে আবার উঠেছে, আবার কাজ করেছে। তারপর আবার পড়েছে! আর ওঠেনি। এখানে মানুষ মরেছে পায়ের নীচে কীটের মত।

পালাবে কোথায়?

জঙ্গলের পথে অসুখ বা অনশন-মৃত্যু এড়ালেও শেষ পর্যন্ত জংলীর হাতে প্রাণ যাবে। জলে নামলে হাঙরে টেনে নেবে। আর পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে বা আধমরা হয়ে ফিরে এলেও সোজা ফাঁসি-কাঠে গিয়ে ঝুলতে হবে। উপনিবেশ গঠন-মত্ত ইংরেজের সে নৃশংসতার তুলনা নেই!

—সেই থেকে তন্ময় হয়ে ভাবছ কি অত? এখনো ভয় করছে?

সচকিত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, আমার দিকে চেয়ে অল্প অল্প হাসছে ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ড।

খাঁটি ইংরেজ। ওই যারা অত্যাচার করে গেছে একদিন, তাদের কারো বংশধর হওয়াও বিচিত্র নয়। শূন্যপথে এতক্ষণ ধরে ভাগ্যহত এক যুগের বেদনায়

ডুব দেওয়ার ফলে আমার চোখেও অবিশ্বাসের ছায়া পড়েছে কিনা ভেবে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম। পাশাপাশি বসা সত্ত্বেও এই বায়ু-গতি গজনের মধ্যে কিছু বলতে যাওয়া বা শুনতে যাওয়া বিড়ম্বনা। ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম, ভয় করছে না।

ক্যাপ্টেন আবার জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কি ভাবছিলে?

এবার জবাব দিতে হল। বললাম, যেখানে চলেছি সে জায়গার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছিল।

ক্যাপ্টেন অবাক।—মনে পড়ছিল কি রকম? তুমি কি আগে এসেছ নাকি এখানে?

বললাম, না, যখনকার কথা ভাবছি তখন আমি জন্মাইনি। সে সব বইয়ের কথা।

ক্যাপ্টেন হাসল। যে নরম হাসি আমাকে গোড়ায় আকৃষ্ট করেছিল, ঠিক তেমনি। বলল, এখন আর সে সবের চিহ্নও দেখবে না কোথাও, জস্ট্ এ লাভলি প্লেস, দিন কতক থাকতে ভালো লাগবে এই পর্যন্ত, আমার তো খুব ভালো লাগে।

জায়গাটা তার ভালো লাগার বিশেষ কারণটি আমার একেবারে অজানা নয়, কিছুক্ষণ আগের কথাবার্তায় সে আভাস প্রায় স্পষ্টই পেয়েছে ক্যাপ্টেন। কাজেই চোখাচোখি হতে তার শাদাটে মুখে লালচে আভা দেখা গেল। সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল সে।

ভালবাসার ব্যাপারে ইংরেজকে বেপরোয়া রকমের ফরওয়ার্ড জানতুম। কিন্তু এই রঙিন ব্যাপারটায় সবাই যে রাঙায়, মনের আনন্দে সেটুকু প্রত্যক্ষ করছিলাম। জায়গাটা ভালো লাগবে কিনা জানিনে, ক্যাপ্টেনকে ভালো লেগেছে। সামনা-সামনি আলাপ মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার। কিন্তু পরিস্থিতি আর পরিবেশ বিশেষে একজনকে ভালো লাগার পক্ষে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ছেড়ে সাড়ে পাঁচ মিনিটও বোধ করি যথেষ্ট।

অবশ্য সান্টু ঘোষ, অন্যথায় সনৎ ঘোষ এই ক্যাপ্টেনটির সম্বন্ধে পুরোপুরি একটা রোমান্টিক আখ্যান আমাকে শুনিয়েছিল প্রায় ছ'মাস আগে। পোর্টব্লেয়ারে ওই সনৎ ঘোষের ডেরাতেই আতিথ্য নেবার কথা আমার। কিন্তু যে ক্যাপ্টেনের কথা সে বলেছিল, আর যে ক্যাপ্টেনকে চোখের সামনে দেখছি এই সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে, ঠিক যেন এক নয় তারা।

সান্টু ঘোষের মতে এতবড় চৌকশ পাইলট খুব বেশি নেই এদেশে। বোমারু প্লেনের মস্ত পাইলট ছিল নাকি যুদ্ধের সময়। নাম ডাকও ছিল তেমনি।

বোমা ফেলে একেবারে তচনচ করেছে এক একটা দেশ। যেমন সাহস তেমনি বেপরোয়া। প্লেন হ্যাণ্ডেল করে ছোট্ট খেলনার মত। কতই বা বয়েস, বড় জোর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। এরই মধ্যে এমনি প্লেন ছাড়াও সি-প্লেন বলো, অ্যাম-ফিবিয়ান বলো—সব রকম প্লেন চালাতে সমান ওস্তাদ।

হবে না কেন, সতের-আঠার বছর বয়েস থেকেই তো এই করছে। নইলে অমন হাতীর মাইনে যুগিয়ে ওকে এখানে নিয়ে আসে! যেমন বরাত—। ক্যাপ্টেনের প্রণয় বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করে সানন্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল সাণ্টু ঘোষ। একঘেয়ে লাগছিল বলে দিনকতক হাত বদলাবার আশায় বেচারী এখানে এসে জুটেছিল—কিন্তু মোক্ষম আটকেছে। আর ছাড়ন-ছোড়ন নেই। একেই বলে প্রেমের ফাঁদ—সাত রাজ্যি চষে শেষে বঁড়শি গিলল কি না এরকম একটা জায়গায় এসে! তাও বাঙালী মেয়ের বঁড়শি! মেয়েটা জাদু জানে।

ক্যাপ্টেনের প্লেন চালানোর ব্যাপারে সাণ্টু ঘোষের মতামতটুকু সম্ভবত সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। পোর্টব্লেয়ারের কোনো সরকারী অফিসে মোটামুটি গোছের কেরানী এই সাণ্টু ঘোষ। প্লেনে দুই একবার গেছে এসেছে এই পর্যন্ত। ওই দক্ষতার সার্টিফিকেট খুব সম্ভব মহাদেবের মুখে শোনা।

মহাদেব-বাক্য সাণ্টু ঘোষের কাছে বেদবাক্য।

পোর্টব্লেয়ার ছেড়ে গোটা আন্দামানের সবাই নাকি চেনে ওই একটি লোককে। অর্থাৎ, মহাদেবকে।

মহাদেবের সঙ্গে আমার আলাপ এবং হৃদ্যতা কলকাতায় নিজের বাড়িতে। সাণ্টু ঘোষের সঙ্গে যে দু'বার এসেছে কলকাতায়—দু'বারই আমাদের বাড়িতে উঠেছে। একা সাণ্টু ঘোষের ভরসায় শেষ পর্যন্ত পা বাড়াতুম কি না সন্দেহ। ওই মানুষটির দরাজ আমন্ত্রণে বেশ একটা প্রলুব্ধ আলোড়ন অনুভব করেছিলাম।

মহাদেব প্রসঙ্গ পরে আসছে। অমন ডাকসাইটে ক্যাপ্টেনের বাঙালী মেয়ের প্রেমের ফাঁদে পড়ার কথা শুনে অবাক হতে দেখে সাণ্টু ঘোষ মোলায়েম হেসে বলেছিল, তল্পি-তল্পা গুটিয়ে ঝপ করে চলে এসো একবার, সব জানবে। আন্দামানে এলে যা কিছু জানার তিনটি দিনের মধ্যে সব জানা হয়ে যাবে। এমন কি ঘরে বসেও যদি তুমি গোপন-কিছু ভাবো, বাইরে এসে দেখবে তাও জানাজানি হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক প্রণয়-কথা শোনার জন্য কোথাও আমাকে যেতে হয়নি। কলকাতায় বসেই সেখানকার জানাজানির হাওয়াটা উপলব্ধি করা গেছে। কবে একদিন কালাপানি পাড়ি দেব আর তারপরে সেই রস-বৈচিত্র্যে

অবগাহন করব, অত ধৈর্য সান্টু ঘোষের নেই। তার বলার উদ্দীপনায় মাঝের আটশ' মাইল কালাপানি কালো বিন্দুর মতই সামনে পড়েছিল…।

সান্টু ঘোষের রসিকতার সবটুকু বাদ দিলেও, চারদিকে দিগন্তস্পর্শী জল-ঘেরা দ্বীপের রাজ্যে এক মেয়ের আট বছরের জীবনচিত্র ভাবতে গেলে যথার্থ অবাক হতে হয়।

…সে চিত্র যেমন নগ্ন তেমনি স্পষ্ট।

প্রথমে পদ্মা পেরিয়ে তারপর কালাপানি পেরিয়ে বাবা মা আর ছোট দুটো ভাইয়ের সঙ্গে সেই মেয়েকে ওখানে আসতে হয়েছিল। শুধু বেঁচে থাকার আশ্বাসটুকুই সোনার আশ্বাস বলে আঁকড়ে ধরেছিল তার বাবা। সে আশায় ফাটল ধরতে সময় লাগেনি। সরকারী ব্যবস্থা অন্য রকম। নতুন করে বসতি স্থাপন করতে হবে অন্য কোনো দ্বীপে, নিজের হাতে ক্ষেত খামার করে বাঁচতে হবে। লাঙল-গরু নেই, কিন্তু হাত তো আছে। হাত আছে আর কোদাল আছে। কিন্তু ওর বাবার মেরুদণ্ডে তখন অত জোর নেই।

তবে উপোস করো।·· কিন্তু উপোস কেউ করতে পারে? তার থেকে চোখ খোলো, চোখ খুলে দেখ। উপায় কি কিছু নেই?

ইন্দুমতীর বাবা দু'চোখ খুলে দেখেছিল। দেখে উপায় বার করেছিল।

এখানকার সংস্কৃতিশূন্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সেটা সাধারণ চলতি ব্যাপার। আন্দামানে নতুন বয়সের সুদর্শনা মেয়ে যার আছে তার আবার ভাবনা! একজনকে বিয়ে করার জন্য মোটা টাকা নিয়ে পাঁচজন দৌড়ে আসবে।

টাকার বিনিময়ে ইন্দুমতীর প্রথম বিয়ে হয়েছিল আধা অবস্থাপন্ন একটি মালোয়াডী ছেলের সঙ্গে। কিন্তু বসে খেলে সে টাকা ফুরোতে ক'দিন আর লাগে। ইন্দুমতীর বাবার তখন আরো চোখ খুলেছে। মেয়েকে কোর্টে এনে বিয়ে ভেঙে দিয়েছে ঠুনকো পেয়ালার মত। ও সমাজে এও হামেশাই ঘটছে। আরো বেশি টাকার বিনিময়ে ইন্দুমতীকে এরপর যেতে হয়েছে এক প্রৌঢ় মালোয়াডী ব্যবসায়ীর ঘর করতে। ওর বাবা বছর ঘোরার অপেক্ষায় দিন গুনেছে আবার। কিন্তু তার আগেই তাকে চোখ বুজতে হয়েছে চিরদিনের মত।

দ্বিতীয় বিয়ে ভেঙেছে ইন্দুমতী নিজেই।

তারও তখন চোখ খুলেছে। নিজের কদর বুঝতে শিখেছে। এক সমাজে যা সম্ভব হয়েছে, অন্য সমাজেই বা তা হবে না কেন? হলই বা অভিজাত। হাওয়া তো একই। এরপর করবাইনস্ কোভের অভিজাত মেয়ে-পুরুষের স্নান-লীলায় প্রাচুর্য-উপচানো এক কস্টিউম-পরা মেয়েকে দেখে হকচকিয়ে গেছে

সবাই। পোর্টব্লেয়ারে একমাত্র স্নানবিলাসের জায়গা করবাইনস্ কোভ

মেয়েরা অন্ধকার দেখেছে চোখে, আর পুরুষদের চোখে কালো জলের রঙ বদলেছে। মেয়েদের সেখানে সুইমিং কস্টিউম পরাটাই নাকি ইন্দুমতী চালু করেছে।

ইন্দুমতীর চাকরি পেতেও সময় লাগেনি খুব। লাগবে কেন, ওর বাবা কি এদিকে চোখ চেয়ে দেখেছিল! ইস্কুলের নিচের ক্লাসের বিদ্যে নিয়ে সেখানে চাকরি করে যাচ্ছে হাজার হাজার লোক। ইন্দুমতী তো ইস্কুলের পড়া শেষ করেই এনেছিল প্রায়। তাই চাকরি পেয়েছে। চাকরিতে উন্নতিও অবশ্য তাড়াতাড়ি হয়েছে। কিন্তু উন্নতি হলে ও আর কি করবে···।

অতঃপর শুধু করবাইনস্ কোভ নয়, পোর্টব্লেয়ারের অনেক নিরিবিলি পাথর পাহাড় আর সী-বীচ-এ অনেক রোমান্স দেখেছে সেখানকার লোক। ফোটোসমেত দিল্লীতে পর্যন্ত পৌঁছেছে সেই রসের খবর। ইন্দুমতীর সঙ্গে দ্বীপের পদস্থ সরকারী অফিসারদের অনেক প্রগল্‌ভ মুহূর্তের অনেক চিত্র-দলিল মহাদেবের প্ররোচনায় সরাসরি দিল্লীর কর্মকর্তাদের দপ্তরে চালান গেছে সেখান থেকে। দু'চার জন অফিসারকে নাকি বদলি পর্যন্ত হতে হয়েছে শুধু এই কারণে। মহাদেবের শত্রুতার লক্ষ্য অবশ্য ইন্দুমতী নয়, উপলক্ষ বলা যেতে পারে। অবাঞ্ছিত অফিসারদের নাজেহাল করার ব্যাপারে মহাদেব নির্মম পলিটিসিয়ান। কিন্তু এই করে মহাদেব কি শত্রুতা করেছে ইন্দুমতীর? করতে পেরেছে? কিছুমাত্র না। বরং কদর বাড়িয়েছে অনেক। ক্ষতি যার হয়েছে তার হয়েছে। ইন্দুমতীর কী?

ওখানকার ওই অভিজাত গণ্ডিও ইন্দুমতীর ভালো লাগেনি বেশি দিন। অন্তত এই চাকরি যে ভালো লাগছে না তাতে কোনো ভুল নেই। প্লেন চলাচলের পর থেকেই অন্যদিকে চোখ গেছে তার। বারকতক পোর্টব্লেয়ারে এসে হেওয়ার্ডও তাকে দেখেছে বইকি। স্নানের সময় করবাইনস্ কোভেই তো কত দেখেছে। হেওয়ার্ডও স্নান-বিলাসী।

সরাসরি ইন্দুমতী গেস্ট হাউসে এসে হাজির হয়েছে এক সন্ধ্যায়। জিজ্ঞাসা করেছে, সাহেব, তোমার প্লেনে চাকরি দেবে আমাকে?

হেওয়ার্ড অবাক। প্লেনে কিসের চাকরি?

সে তুমি জানো, রিসেপশনিস্ট করে নাও—

বিব্রত মুখে হেওয়ার্ড জানিয়েছে, এটা যাত্রী প্লেন ঠিক···তা ছাড়া তার কোনো হাতও নেই।

এর পরের রোমাঞ্চকর যোগাযোগও করবাইনস্ কোভে। ইন্দুমতী হাল

ছাড়েনি, সুযোগের প্রত্যাশায় ছিল। বেশ খানিকটা দূরে সাঁতরে গিয়ে একটা বড় পাথরের ওপর চুপচাপ বসেছিল হেওয়ার্ড। কস্টিউমপরা ইন্দুমতীর ভিন্ন মূর্তি। সেও হাজির সেখানে। তারপর প্রায় পাল্লা দিয়েই সাঁতরে ফিরেছে দু'জনে। কাণ্ড দেখে পারের স্নানার্থীরা রোমাঞ্চিত।

বুক জলে এসে ইন্দুমতী ঘুরে দাঁড়িয়েছিল হেওয়ার্ডের মুখোমুখী। হাঁপাচ্ছিল বেশ। সে যৌবন-প্রাচুর্যের ওঠা নামা যারা ছিল সেখানে তারাই দেখেছে। ইন্দুমতীর চোখমুখ আর দাঁতের আভায় নিঃশব্দ হাসির ঝলক।

হেওয়ার্ড অভিভূত।—তুমি অদ্ভুত মেয়ে বটে!

সকলকে সচকিত করে হেসে উঠেছিল ইন্দুমতী। তারপর চোখে চোখ রেখে দম নিয়েছে একটু।—চাকরি দেবে তাহলে?

চাকরি দেওয়া সম্ভব ছিল না বলেই চাকরি হয়নি। কিন্তু হেওয়ার্ড নিজেকে সমর্পণ করেছিল প্রায়। সে বৈচিত্র্যও অবাঞ্ছিত ছিল না ইন্দুমতীর। যে পর্যন্ত এগিয়েছিল তাতে অনেকে অনেক কিছু আশা করেছিল…।

ক্যাপ্টেনের কথায় চমক ভাঙল।

বহুদূরে নিচের দিকে আবছা একটা ছায়ার মত দাগ দেখিয়ে বলল, ওই পোর্টব্লেয়ার, আর মাইল পঞ্চাশ হবে এখান থেকে। ওখানে গিয়ে সমুদ্রের ওপর প্লেন নামাব আমরা। এবারে তুমি জায়গায় যাও, আমার সহকারীকে আসতে দাও।

যন্ত্রপাতি বাঁচিয়ে সন্তর্পণে উঠে এলাম এঞ্জিনের খুপরি থেকে। আবার সেই ভয় মেশানো রোমাঞ্চ অনুভব করছি একটু একটু। উড়োজাহাজ জলে নামবে এই অনভ্যস্ত চিন্তাটাই অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল গোড়া থেকে। এঞ্জিনের পরের খুপরিতে বেতার-যন্ত্রাদি নিয়ে নিবিষ্টচিত্ত অপারেটর এবং তার একজন সঙ্গী। চা-কফি পরিবেশনও এই সঙ্গীটিকেই করতে হয়। তৃতীয় খুপরি এবং সব শেষের খুপরিটিতে যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা। এ যাত্রায় যাত্রী বলতে আমি একা। একেবারে লেজের ধারে গিয়ে বসলাম হাত পা ছড়িয়ে। নিচের দিকটা এখান থেকেই পরিষ্কার দেখা যায়।

এ প্রসঙ্গ ওই দ্বীপের সম্প্রবর্তমানের কয়েকটি নারী-পুরুষকে নিয়ে। যাদের দেখতে চলেছি। যাদের দেখেছি। অথচ, যাদের ঠিক অমনটি দেখব বলে একবারও ভাবিনি। তাই এ প্রসঙ্গে এগোতে হলে যাত্রার শুরু থেকেই শুরু করা দরকার আবার। কারণ, যাদের নিয়ে লেখার প্রেরণায় এই লিখতে বসা,

ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ড শুধু তাদের একজন নয়, বিশেষ একজন।

প্রয়োজনে চলতি ধারায় হঠাৎ সব কিছুর মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে যে, তাকে যদি নায়ক বলতে হয়, ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ডকে এই কাহিনীর নায়ক বলতেও আপত্তি নেই। তাই তার সঙ্গে যোগাযোগের বৈচিত্র্যটুকু স্পষ্ট হওয়া দরকার। সাণ্টু ঘোষের মুখে শোনা সর্বগুণের আধার নিপুণ বিমান চালক হেওয়ার্ডকে সেখানে কেউ খুঁজে পাবেন না। কিন্তু অন্য কিছুব স্পর্শ পাবেন হয়ত।

গোড়াতেই বলে রাখি, এই যাত্রার ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বরং আসার কথা ছিল সাণ্টু ঘোষের। তার সঙ্গে তারপব ধীরে সুস্থে সমুদ্র-পথে পাড়ি দেব কি না, পরে ভেবে দেখার বিষয় ছিল সেটা। কিন্তু গেল বারের জাহাজে তার বদলে তার লম্বা এক চিঠি এসে হাজির। মূল বক্তব্য, মাস খানেক হল, পাথরে পা ফসকে পা ভালো রকম জখম হয়েছে। অতএব তার আসা আপাতত দুরাশা। কিন্তু আমি যদি শূন্য-পথে যেতে চাই, এই শেষ সুযোগ। খুব সম্ভব এই-ই শেষবারের মত উড়তে চলেছে ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ড।

কারণ, তাব ওড়ার পাখা ভেঙেছে।

কিন্তু একেবারে যে ভেঙেছে সেটা সে এখনো ভালো করে জানে না। এলে জানবে। তার পব ভাঙা পাখা নিয়ে ঝটপট করতে করতে কোনরকমে ফিরে যাবে। তারপর আর আসবে না।

লিখেছে, কেনই বা আসবে? মেয়েটা যাদু জানে বলেছিলাম না? সেই যাদুর মায়া শেষ হয়েছে। নতুন খেলায় আন্দামান গরম এখন। এ সুযোগ ছেড়ো না, অবশ্য এসো—।

যাদুর মায়া দেখার জন্য না হোক, একবার যাওয়ার বাসনা বিলক্ষণ ছিল। ঝোঁকের মাথায় ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ডের সঙ্গ নেওয়াই স্থির হয়ে গেল। জাহাজে একা পাঁচদিন ধরে যাওয়ার মত ধৈর্য নেই। দু'শ তেষট্টি টাকা দিয়ে টিকিট বুক করে ফেলার পর ভাবনা, অর্থাৎ, দুভাবনা বস্তুটা গুটিগুটি এগিয়ে আসতে লাগল।

আজকের দিনে আকাশ-পথে আটশ' থেকে আট হাজার মাইল যাওয়াটাও প্রায় সহজ ব্যাপার। কিন্তু এই প্লেন বায়ু সাঁতরে শেষে নামবে গিয়ে সোজা সমুদ্রের ওপর। এই ব্যাপারটাই খুব সহজভাবে নিতে পারা যাচ্ছিল না। অবশ্য এর নিরাপত্তা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর কম করিনি। যারা জানে তারা বলেছে, ও জলে নামা আর ডাঙায় নামা একই ব্যাপার। যারা জানে না তারা অভয় দিয়েছে, ডাঙার থেকে জলে ল্যাণ্ড করা আরো বেশি নিরাপদ।

যাই হোক, যাচ্ছি যেখানে সেখানে রানওয়ে যখন নেই, জলে নামা ছাড়া

গত্যন্তরও নেই কিছু। তবু মন থেকে জলে-পড়ার ভয়টা একেবারে তাড়ানো যাচ্ছিল না। তাছাড়া শিডিউল্ড প্লেন নয়, নিয়মিত সার্ভিসও নেই কিছু। পাঁচ রকমের মাল-পত্র নিয়ে, এবং সেই সঙ্গে পায় যদি, কিছু যাত্রী নিয়ে একেবারে বেসরকারীভাবে আকাশে ওড়ে। ওড়বার আগে বিজ্ঞাপন বেরোয় কাগজে। তাই দেখে যাত্রী জোটে। আমি অন্তত জুটেছিলাম, আর ভেবেছিলাম আরো অনেকে জুটবে। সান্টু ঘোষ অবশ্য বলেছিল, ওই প্লেন চলাচলের ব্যাপারটা এখন যাত্রী বা মাল-সংগ্রহের ওপর নির্ভরশীল নয়। সেটা নিভর করছে ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ডের ওপর। ওখানকার ওই মায়ার বাঁশি বেজে উঠলেই সে নাকি উড়বেই আকাশে, মাল বা যাত্রী জুটুক বা না জুটুক।

তখন অত্যুক্তি মনে হয়েছিল। কিন্তু যাবার আগের দিন বিকেলে বেশ মুষড়ে পড়লাম। কোম্পানীর অফিসে খবর নিয়ে জানা গেল, তখন পর্যন্ত আর দ্বিতীয় যাত্রী হয়নি। ম্যানেজার অবশ্য আশ্বাস দিলেন রাতের মধ্যে গোটা দুই বুকিং হতে পারে। কিন্তু আমি ভরসা পেলাম না খুব। বার বার মনে হতে লাগল বোকার মত একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে একাই পা বাড়াচ্ছি। প্লেন যদি যায়, তার পাইলট থাকবে, কো-পাইলট থাকবে, রেডিও এঞ্জিনিয়ার থাকবে, গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার থাকবে। তারাও মানুষ, প্রাণের মায়া তাদেরও কম নয় আমার থেকে। বার বার সে কথাটা স্মরণ করা সত্ত্বেও আর একজন যাত্রী না থাকার অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠা গেল না। যেখানে যাওয়া এবং যেভাবে যাওয়া, সে কথা ভেবে আর একজনও যাত্রী না পাওয়াটা একটুও শুভ সূচনা বলে মনে হল না।

সমস্ত রাত জল হয়ে সকালের দিকে ঠাণ্ডা পড়েছিল বেশ। ভোর রাতে কাঁপতে কাঁপতে ট্যাক্সি করে এরোড্রামে এসে পৌঁছেছি। এখানেও প্রায় অপাঙক্তেয় অবস্থা। বড় বড় প্লেনগুলির যাত্রীদের সকল ব্যবস্থায় বেশ একটা সমারোহ আছে। কিন্তু সে তুলনায় আমার অস্তিত্ব নিষ্প্রভ-প্রায়।

অফিসের অর্থাৎ আমার প্লেনের লোকজনও তখন পর্যন্ত কেউ এসে জোটেনি। কোথায় কোন দূরের এক কোণে পড়ে আছে প্লেন কে জানে। ভিতরে ভিতরে ক্রমশ দমে যাচ্ছিলাম। আশা করছিলাম, গত রাত্রির জলের দরুন প্লেন হয়ত শেষ পর্যন্ত নাও ছাড়তে পারে। অন্যান্য প্লেন অবশ্য যাচ্ছে। যাক। আন্দামানের আবহাওয়া সব জায়গার সঙ্গে এক নয়। তাছাড়া, সকলকে তো আর জলে নামতে হবে না!

ভোর হতে কোথা থেকে ম্যানেজার এসে উদয় হলেন। ব্যস্তসমস্তভাবে

বললেন, সব রেডি, চলো।

অতএব যাত্রা স্থির।

চেয়ে দেখি ম্যানেজারের পিছনে আরো চার-পাঁচজন কারা এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জন তাদের মধ্যে ভারতীয় নয়। ম্যানেজার তাদের মধ্যে প্রথমেই যে রোগা ঢ্যাঙা লোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, সে ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ড।

যেটুকু জোর ছিল মনে, কাণ্ডারী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল।

সাণ্টু ঘোষের বর্ণিত সমস্ত রকম প্লেন-চালনায় নিপুণ এক দুর্ধর্ষ বোমারু পাইলটের এমন শাদা-মাটা ভালো মানুষের কাঁচা-মূর্তি হতে পারে একবারও ভাবিনি। আগে একে দেখা থাকলে এ-যাত্রায় বেরুতাম না নিশ্চয়। একেবারে ছেলেমানুষ দেখতে, তার ওপর শিথিল স্তিমিত ভাব একটা। বরং তার পাশের নাদুস-নুদুস শ্বেতাঙ্গটি হেওয়ার্ড হলে এমন লাগত না।

সৌজন্য বিনিময়ের পর ম্যানেজারের উদ্দেশে একটাই প্রায় করুণ প্রশ্ন নির্গত হল, আর কোনো প্যাসেঞ্জার হযেছে ?

ম্যানেজার ব্যস্ত। ঘাড় নাড়লেন কি নাড়লেন না। রোগা শরীর একটু সামনের দিকে হেলিয়ে মৃদু হেসে স্পষ্ট করে জবাব দিল ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ড—না, গোটা প্লেনটাই তোমার জন্যে চার্টার্ড বলতে পারো!

মনে হল তার চোখে ঈষৎ কৌতুকের ছায়া। গতকাল যাত্রী সম্বন্ধে ম্যানেজারের কাছে আমার খোঁজখবর নেওয়াটা জেনেছে কিনা কে জানে। চুপ করে গেলাম। প্লেন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে সেই পথটাও অতিরিক্ত দীর্ঘ মনে হল। তারপর কাছাকাছি এসেই থমকে যেতে হল আবার।

এমন কুশ্রীদর্শন প্লেন এর আগে আর কখনো দেখিনি।

অতিকায় দুটো পাখাওয়ালা একটি হিংস্র বাদুড় যেন শিকার ফসকে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এঞ্জিনটা প্রায় মাটি ছুঁয়ে আছে, লেজের দিকটা একতলা সমান উঁচু। সাধারণ প্লেনের ঠিক উল্টো।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমি যে এত ভীতু নিজেই জানতুম না। প্লেনে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা এই প্রথম নয় আদৌ। সব মিলিয়ে এমন একটা অবাঞ্ছিত অনুভূতির উদ্রেক হতে পারে একবারও ভাবিনি।

মনে পড়ে, আন্দামানে যাচ্ছি শুনেই মা আঁতকে উঠেছিলেন প্রায়। তাঁর ধারণা, সেখানকার জলে-জঙ্গলে জংলীরা তীর-ধনুক নিয়ে ওঁত পেতে থাকে এখনো। ফাঁক পেলেই তারা মানুষ মারে আর মানুষ খায়। সাণ্টু ঘোষ আর

মহাদেবকে দু'দুবার যাতায়াত করতে দেখেও দুশ্চিন্তা মুছে ফেলতে পারেননি। যাওয়া স্থির হতে আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, বউমা, ওর যাওয়া বন্ধ করো, এসব আমার ভালো লাগছে না। মাকে অনেক বুঝিয়ে সুস্থ করা গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর 'বউমা, ওর যাওয়া বন্ধ করো' কথা কটার সুবটা কেমন যেন কানে লেগে ছিল।

তারপর এই নিঃসঙ্গ যাত্রী আর বৃষ্টিঝরা রাতের শেষে ভোরের কাঁপুনি।

এই লকপকে চেহারার ক্যাপ্টেন আর এমন কিম্ভূত-দর্শন অ্যামফিবিয়ান প্লেন। যেটা আবার যাত্রাশেষে হুডমুড়িয়ে নামবে গিয়ে অতল সমুদ্রের ওপর।

ফাঁসির আসামী কেমন করে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ায় জানা নেই। বিশ্বাস, তারা টের পায় না কখন কেমন করে এসে দাঁড়ায়।

কেমন করে কার ইঙ্গিতে পিছনের দোতলা সমান উঁচু সরু সিঁড়ি ধরে এই যন্ত্র-জীবটিব গহ্বরে এসে ঢুকেছি আমারও স্মরণ নেই।

বিপুল গর্জন তুলে প্লেন উড়েছে একসময়।

আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি নিশ্চেতনের মত। একটা নয়, দুটো কম্বল মুড়ি দিয়েছি। যাত্রী যখন একজন, প্লেনে বাড়তি কম্বলের অভাব নেই।

মোটামুটি আত্মস্থ হতে বেশ সময় লেগেছিল বোধ হয়। এক সময় পাশের কাচের (অভঙ্গুব) জানালা দিয়ে নিচে চোখ পড়তে দেখলাম মাটি নেই, শুধু জল আব জল। বাংলার মোহনা ছাড়িয়ে কালাপানির ওপর দিয়ে চলেছি।

ডবল কম্বল জড়িয়েই মাঝেব খুপবি ছেড়ে পিছনের দিকে এসে দাঁড়ালাম। এত উঁচু থেকে মনে হল, পাটিব মত পড়ে আছে সমুদ্র। ঢেউ চোখে পড়ে না। দাঁড়িয়ে দেখছি তন্ময় হয়ে। কিন্তু দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে বেশ। চারদিক বন্ধ, তার মধ্যে দুটো কম্বল ভেদ করে কনকনে ঠাণ্ডা ঢুকছে কি করে ভেবে পেলাম না। ক্রমশ ঠাণ্ডায় জমে যাবার উপক্রম একেবারে। সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপছে, দাঁতে দাঁতে লেগে যাচ্ছে। এমন দুঃসহ ঠাণ্ডার কবলে জীবনে পড়িনি। তার ওপর শরীর ঘুলিয়ে উঠছে থেকে থেকে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি বেশিক্ষণ, বসে পড়েছি। কিন্তু বসে থাকাও সম্ভব হচ্ছে না আর।

একটু বাদে অয়্যারলেস অপারেটারের সঙ্গী ভদ্রলোক খাবার দিতে এসে জানালো, বার হাজার ফুট ওপর দিয়ে চলেছি আমরা।

কোনরকমে চিঁ-চিঁ করে অবস্থাটা বোঝালাম তাকে। শুনে একটু নিরীক্ষণ করে দেখল সে। খাবারের বাক্স নিয়ে ফিরে যেতে যেতে সংক্ষিপ্ত প্রেসক্রিপশান জারি করে গেল, শুয়ে পড়ো।

শোবার চেষ্টা বার কতক করেছি। লম্বা গদি-আঁটা বেঞ্চ্ হলেও মাঝে মাঝে উঁচু পার্টিশনে প্রত্যেকের সীট ভাগ করা। দেহে হাড় না থাকলে হয়ত ওরকম কিছুতে শোয়া সম্ভব। লোকটা যাওয়ার একটু পরেই দেখি ক্যাপ্টেন এসে হাজির। অসুস্থতার খবর পেয়েই এসেছে বোঝা গেল। চুপচাপ একটু মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

ভয়ানক খারাপ লাগছে। আর, এই শীত সহ্য করতে পারছি না।

কোমরে দুই হাত তুলে দিয়ে আবার খানিক দেখল চেয়ে চেয়ে। জিজ্ঞাসা করল, বুকে চাপ লাগছে কোনরকম?

না, শুধু অসহ্য কাঁপুনি।··· আর সমস্ত শরীরটা ঘুলোচ্ছে।

কিছু না বলে ক্যাপ্টেন চলে গেল।

হতাশ হয়ে আমি গা এলিয়ে দিলাম আবার। ভারি নিষ্করুণ মনে হল এদের সকলকে। কিন্তু সে শুধু কয়েক মিনিটের জন্য। তার পরেই সবিস্ময়ে দেখি, ধূমায়িত কাগজের গ্লাস হাতে ক্যাপ্টেন আবার এসে ঢুকল। গ্লাসে কফি। বলল, আস্তে আস্তে খেয়ে নাও এটুকু।

হাত বাড়িয়ে কফি নিলাম। ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, খেয়েছ কিছু?

—খাবার মত অবস্থা নয়।

কিছু না বলে চলে গেল এবং এবারে সেই খাবারের বাক্স নিয়ে ফিরে এলো। নিজে হাতে বাক্স খুলে দিয়ে বলল, নাও ধরো।

আপত্তি জানালাম।—পেটে এখন থাকবে না কিছু, কফির জন্য ধন্যবাদ।

ক্যাপ্টেন হাসল। আর সেই মুহূর্তে তাকে ভালো লাগল আমার। বলল, না থাকলেই বা, জাস্ট্ ট্রাই।

পাশেই বসে পড়ল সে। নিজেই খাওয়া শুরু করল প্রথম। আমিও যে একেবারে খেতে পারলুম না এমন নয়। সুস্থ বোধ করছি একটু। কিন্তু শীতের কাঁপুনি কমছে না। ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, প্লেনে এই প্রথম জানি?

না···তবে এরকম প্লেনে এই প্রথম বটে।

কি রকম?

জলে নামবে তো এটা···

চিবুনো থামিয়ে ক্যাপ্টেন মুখ তুলল।—তাতে কী? জলে জাহাজ চলে না?

সহজ কথাটার মুখে একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম। প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললাম, হঠাৎ এই কোল্ড-স্ট্রোকে বড় কাতর হয়ে পড়েছি।

বলেই দ্বিগুণ সঙ্কোচে থমকে যেতে হল। আমার গায়ে ডবল কম্বল। আর

যে মানুষটা সামনে বসে তার আচ্ছাদনের মধ্যে হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্ট। আর কিচ্ছু না। সঙ্কোচের কারণ অনুমান করে ক্যাপ্টেন হেসে ফেলল। সেটুকু কাটিয়ে তোলার জন্তেই যেন মিষ্টি করে বলল, পিছনের দিকটায় ঠাণ্ডা সত্যি বেশি …আচ্ছা রোসো, দেখি কি করা যায়।

টক করে উঠে চলে গেল সে। একজন মানুষের এটুকু দরদী সান্নিধ্যেই অনেকটা চাঙা হয়ে উঠেছি। এরকম পারিস্থিতিতে এতক্ষণের বোবা নিঃসঙ্গতারও ভিতরটা দুমড়ে যাচ্ছিল। হোক ইংরেজ, হোক বিজাতীয়, তার ওই শাদা চামড়া আর শাদাটে দেহের অভ্যন্তরে যার স্পন্দন, তার রঙে রকমফের নেই।

সেই প্রথম যে লোকটি খাবার নিয়ে এসেছিল সে জানালো, ক্যাপ্টেন ভিতরে ডাকছে। উঠে দাঁড়াতে আবার বলল, কম্বল দুটো খুলে রাখো, অসুবিধে হবে— তাছাড়া দরকারও হবে না।

অয়্যারলেস-র খুপরিতে ঢুকে দেখি টুলের ওপর কো পাইলট বসে। তার সামনেই এঞ্জিনের খুপরি। সংকীর্ণ পরিসর, হাত চারেকও হবে না বোধ হয়। পাশাপাশি দু'জন পাইলট বসার দুটো ছোট্ট সীট। একটিতে বসে ক্যাপ্টেন প্লেন হাতে নিয়েছে আবার। ঘাড় ফিরিয়ে পাশের সীটটা দেখিয়ে বলল, এখানে এসে বসো—বাট্ বি কেয়ারফুল নট টু টাচ এনিথিং—বি ভেরি কেয়ারফুল।

সন্তর্পণে জড়সড় হয়ে উঠে গিয়ে বসলাম তার পাশের আসনে। চারদিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রে সমাকীর্ণ। সামনে পাশে মাথার ওপর। নড়তে চড়তে ভয়। এই বুঝি কিছুতে গা লেগে গেল। ক্যাপ্টেন কিন্তু ওরই মধ্যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে নড়া-চড়া করছে, বোতাম টিপছে, হ্যাণ্ডেল ঘোরাচ্ছে, হাত দিয়ে এক-একটা কাঁটা ঘোরাচ্ছে।

—ভালো লাগছে?

জবাব দেব কি। যেটুকু বোঝার আমার দিকে চেয়েই তার বুঝে নেবার কথা। একটা হিম-শীতল চাপ-ধরা কোটর থেকে একেবারে ঝলমলে জীবনের আলোয় এসে বসেছি যেন। রোদ যে এমন সঞ্জীবনী আরামদায়ক হতে পারে আগে আর কখনো উপলব্ধি করিনি। চারদিকের অভঙ্গুর কাচে প্রতিহত দুর্দম গতির মধ্যে এ রোদটুকু যেমন মিষ্টি তেমনি লোভনীয়। নিচে, বহু নিচে, অসীম জলের ছবি। ওপরে ডাইনে বাঁয়ে খোলা আকাশ। দূরে দূরে মেঘের কারিগরি। নিবিষ্টচিত্তে কে যেন রঙ-বেরঙের মেঘ নিয়ে খেলা করছে। মেঘের সেই বর্ণচ্ছটা আর অফুরন্ত আকার-সমারোহ দেখা দু'চোখে যেন কুলোয় না।

এ মেঘ দেখলে কালিদাসের মেঘদূত হয়ত অন্যরকম হত।

অনেকক্ষণ বাদে বললাম তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, এ দিনটা আমার মনে থাকবে। শীত ছাড়াও, ভিতরে একা একা ভয়ানক মুষড়ে পড়ছিলাম।

চেয়ে দেখি, ক্যাপ্টেন হাসছে। এমন শিশুসুলভ নরম হাসি যেন কম দেখেছি। একটু বাদে সামনের খোলা আকাশের দিকে চোখ রেখে খুব হালকা করে বলল, দেখো, তোমাকে একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না—প্রায় সাড়ে তের হাজার ফুট ওপর দিয়ে চলেছি এখন আমরা, এ অবস্থায় অঘটন যদি কিছু হয়ই, একজনই কি আর একশ জনই বা কি—অত ঘাবড়াবার কি আছে?

তার মুখের ওপর থেকে চোখ ফেরানো গেল না সহজে। কোনো সাহসের কথা বলল না, কোনো বীরত্বের কথাও নয়। আর নিজে বুঝি না এমন কথাও নয়। এর বদলে সগৌরবে বলতে পারত নিজের ঝঞ্ঝাময় জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। বলতে পারত বোমারু জাহাজে প্রাণ হাতে করে মৃত্যুময় সঙ্কটের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা।

বললে কানে যেত, রোমাঞ্চও জাগত, কিন্তু এমন করে বুকে পৌঁছুতো না বোধ হয়।

মনে হল, নিজের মনে কিছু যেন ভাবছে ক্যাপ্টেন। মনের মত কিছু। তার শাদা মুখে কোমল আভা। ঘাড় না ফিরিয়ে তেমনি হাসি হাসি মুখেই বলল আবার, জানো, এই প্লেনে একটি মেয়ে·· তোমারই মত বাঙালী···একেবারে একা চারবার আমার সঙ্গে কলকাতা আর আন্দামান যাতায়াত করেছে। একটুও ভয় পায়নি।

চেয়ে আছি। জবাবে বলা যেত, এখানে এই আলোর মধ্যে এসে আর তোমার মত একজনের সঙ্গ পেয়ে ভয়ডর আমারও রসাতলে গেছে। কিন্তু তার বদলে কথা ক'টা যেন খচখচিয়ে বিঁধল কোথায়। সান্টু ঘোষের চিঠির বারতা মনে পড়ছে।—ক্যাপ্টেনের ওড়ার পাখা ভেঙেছে, কিন্তু একেবারে যে ভেঙেছে সেটা সে এখনও জানে না, এলেই জানবে।

কোথাকার কে ওই বাঙালী মেয়ে দেখিওনি, জানিও না। আর, বাঙালী মেয়ের প্রতি কোনো শ্বেতাঙ্গ পুরুষের প্রণয়ও বড় করে দেখার কারণ ঘটেনি কখনো। তবু কেমন মনে হল, ওই বাঙালী মেয়ের কাছ থেকে এই লোকটি সত্যি যদি তেমন অশোভন আঘাত পায়, তাহলে সে লজ্জা বুঝি আমাকেও স্পর্শ করবে।

একবার ভাবলাম, এর এই সদয় ব্যবহারও সম্ভবত আমি ওই মেয়ের সজাতি বলেই। ভাবতে লাগলাম। কোনো ইংরেজ রমণীকে যদি আমার মনে ধরে

তাহলে ইংরেজ মাত্রকেই আমি দরদের চোখে দেখব কি না। জটিলতার মধ্যে পড়ে ভাবনা বাদ দিলাম। কেবল মনে হল, বাঙালী ছেড়ে নিগ্রো হলেও এই মানুষের ব্যবহারে এতটুকু তারতম্য হত না।

খট্ করে ওই মেয়েটির নাম পর্যন্ত বলে দিলে কি হয়? নিরীহ মুখে যদি জিজ্ঞাসা করি, কার কথা বলছ? ইন্দুমতী? সত্যিই আর বলা যায় না। ভব্যতার মাত্রা ছাড়াবে।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, আন্দামানে বেড়াতে যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

কোথায় থাকবে?

বললাম। ভাবলাম, সকলে সকলের হাঁড়ির খবর রাখে যখন সেখানে, চিনলে চিনতেও পারে সাণ্টু ঘোষকে। কিন্তু চিনেছে বলে মনে হল না। তাই আর একটা নাম করলাম। বললাম, মহাদেবকে চেনো? তারও বিশেষ আমন্ত্রণ আছে—

শোনামাত্র বিস্ময়ে প্রায় ঘুরে বসল ক্যাপ্টেন। দেখতে লাগল যেন নতুন করে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল, তাকে তুমি চেনো কি করে?

কলকাতায় এলে সে আমার বাড়িতেই অতিথি হয়।

চেয়ে আছে তেমনি। এর চোখে নিজের দর বেড়ে গেল কিনা বুঝছি না। একটু থেমে সে এবার আমার কথার জবাব দিলে, হ্যাঁ তাকে চিনি, ওখানে সবাই চেনে তাকে, এ রিয়েল লাইফ ফোর্স—

শুনে আর একটু এগোবার ইচ্ছে হল। বললাম, তার মুখে তোমার গল্পও অনেক শুনেছি, ভারি প্রশংসা করে তোমার।

কিন্তু প্রশংসা শুনে খুব প্রীত হয়েছে বলে মনে হল না। বরং একটু যেন বিব্রত দেখালো তাকে। হঠাৎ খেয়াল হল মহাদেবের মুখে ক্যাপ্টেনের কথা যেন অনেক শুনেছি বললাম, তার আর একটা অর্থও হতে পারে। অনেক শুনেছি, অর্থাৎ, যে মেয়েটার কথা একটু আগে সে বলল, তার কথাও অনেক শুনেছি—এই যদি ধরে নিয়ে থাকে! এবারে আমার বিব্রত হবার পালা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সামনের দিকে চোখ রেখেই ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, তার সঙ্গে তোমার এত খাতির যখন, কলকাতায় তোমারও ব্যবসা নিশ্চয়··?

না, ব্যবসা নয়।

শুনেছিলাম ইংরেজ জাত আলাপ আলোচনায় অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে

সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্যতিক্রমই দেখলাম। ব্যবসায়ী নই। কিন্তু কি যে, সেটাও মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। কারণ, এ নিয়ে ওই মহাদেবের কাছেই অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল বড় কম নয়। সাণ্টু ঘোষের মুখে লেখক কথাটা শুনেই মহাদেব এমন তাজ্জব হয়ে চেয়েছিল মুখের দিকে, যেন চিড়িয়াখানার অদ্ভুত কোন জীব দেখছে। অবাক বিস্ময়ে তড়বড়িয়ে উঠেছিল তারপর।—লেখক···! কিন্তু লেখার সময় পাও কখন? আর লেখই বা কি? এই তো দেখছি অবস্থা এখানকার, নিজের দেশে জায়গা দিতে না পেরে দলে দলে রিফিউজি পাঠাচ্ছ আন্দামানে, এর মধ্যে লেখই বা কি, আর লেখা পড়েই বা কে? রোজগার হয় লিখে?

তর্কের খাতিরে অন্তত এমন বেপরোয়া খোঁচার জবাবে অনেক কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই বলিনি, বা বলতে পারিনি। কারণ, যে বলেছে, সে কোনরকম আঘাত দেবার জন্যে বলেনি। স্বভাবে বলেছে। যা ভাবে তাই বলে, আর যা সত্যি বলে মনে করে তাই বলে।

ক্যাপ্টেনের প্রশ্নটা প্রকারান্তরে এড়িয়ে যেতে হল তাই। লেখক শুনলে ইনি আবার কোন্ ধরনের বিস্ময় প্রকাশ করে বসবেন ঠিক কি।

এঞ্জিন ঘর থেকে উঠে এসে পিছনের খুপরিতে বসেও ওই মহাদেবের মূর্তিটাই চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল বার বার। ক্যাপ্টেন ওকে বলেছে ওখানকার লাইফ-ফোর্স। কাছাকাছি দু' দু'বার যেমনটি দেখেছি তাকে, খুব মিথ্যে বলেনি বোধ হয়। একটা প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতা যেন সর্বক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় মানুষটাকে। শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না পাঁচ মিনিটও। কথা বলছে অনর্গল, উত্তেজিত হয়ে উঠছে, হাসছে অজস্র, সেই সঙ্গে ছটফটও করছে। এটা দেখব, ওটা জানব, সেটা করব। দেখার জানার করার নেই আর কিছু? তবে গোটাও তল্পিতল্পা। চল আর কোথাও। নয়ত ফেরো যেখান থেকে এসেছ সেইখানে।

স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ। মুখের তামাটে রঙে একটু উগ্র ছাপ। শেল্ ফিসিং-এর মস্ত ব্যবসা। বাঁধা লাইসেন্স তার, সমুদ্রের লম্বা একটা দিক ইজারা নেয় প্রতি বছর, বর্ষা অন্তে সমুদ্র কিছুটা শান্ত হলেই ডুবুরী নামায় এক সঙ্গে চল্লিশ পঞ্চাশ জন। শেল্ তোলে মণে মণে। ট্রোকাস, টারবো, আরো কতো কি। জাহাজ বোঝাই করে বিদেশে চালান দেয় সে সব। বাইরে এর কদর খুব।

কলকাতার বাড়িতে প্রথম আলাপের পরেই সাণ্টু ঘোষকে কস করে জিজ্ঞাসা

করে বসেছিল, এখানে যে থাকতে বলছ, বন্ধু জানে তো আমি লোকাল বর্ন ?

হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হয়ে সান্টু ঘোষ থতমত খেয়ে গিয়েছিল। আমিও বিব্রত বোধ করছিলাম একটু। লোকাল বর্ন শুনে নয়, প্রশ্নটা শুনে। সান্টু ঘোষকে ছেড়ে সরাসরি আমাকেই জিজ্ঞাসা করেছিল মহাদেব, লোকাল বর্ন কাদের বলে জানো ?

—জানি। এ প্রসঙ্গ আর বাড়তে দেওয়া সমীচীন বোধ করিনি। কলকাতায় যে-কোনো বড় হোটেলে থাকার মত সঙ্গতি আছে ভদ্রলোকের। এতটুকু দ্বিধা দেখলে সোজা প্রস্থান করবে। বললাম, ওই শব্দটার এখানে কোনো মানে নেই, তোমার হয়ত অসুবিধে হবে এখানে থাকতে, কিন্তু আমরা খুব খুশি হব।

সত্যি খুশি হব কিনা, মুখের দিকে চেয়ে সেটাই যেন যাচাই করে নিচ্ছিল মহাদেব। তারপর হেসে ফেলেছিল।—অল্‌রাইট, তোমাদের খুশি করতে আমার আপত্তি নেই। সান্টু ঘোষকে দেখিয়ে বলেছিল, এর কেয়ারে এসেছি, যাবই বা কোথায়—দু'মিনিট কথা বলতে না পেলে আমি হাঁপিয়ে উঠি।

মহাদেব বাঙালী।

কিন্তু আন্দামানে ওদের বাঙালী বলে না কেউ। ওখানকার ভদ্রসমাজ অন্তত বলে না। বলে লোকাল বর্ন। সংক্ষেপে এল. বি.। অর্থাৎ কয়েদীর বংশধর।

ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে সেখানে পুরুষ কয়েদী যেত, মেয়ে কয়েদী যেত। তাদের বিয়ে হতে বাধা ছিল না। নতুন করে ঘর-সংসার পেতে বসতে বাধা ছিল না। তাদের ছেলেপুলে বংশধরেরা লোকাল বর্ন। আর কোনো জাত-বর্ণ নেই তাদের। তারা শুধু লোকাল বর্ন। তাদের সংখ্যা কম নয় এখন। মস্ত একটা গোষ্ঠী বলা যেতে পারে। স্থানীয় ভদ্রসমাজে তারা প্রায় অপাঙক্তেয়, ব্রাত্য। সে-সমাজে তাদের স্বীকৃতি নেই, মর্যাদা নেই খুব।

এই লোকাল বর্নদেরও এ নিয়ে তাপ উত্তাপ ছিল না বড়। শিকার নেশা জুয়া আর মারামারি—জীবনকে এই চার পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছিল তাদের আবাল-বৃদ্ধ। কিন্তু এখন শুনছি দিন বদলাচ্ছে। লেখাপড়া শিখছে তারা। ওদের মধ্যে গুটিকতক শিক্ষিত জনের তাড়নায় শিক্ষা, চাকরি বা রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে মিটিং করে, দিল্লীর দরবারে আরজি পাঠায়, নালিশ রুজু করে সরকারী বিধি-ব্যবস্থায় এতটুকু ফাঁক দেখলেই। সেখানকার পদস্থ এবং কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকদের মনে মনে বিষম রাগ এই মহাদেবের ওপর। ওই দ্বীপের রাজ্যে যত অশান্তির মূলে নাকি সে-ই। টাকা আছে, শিক্ষা দীক্ষা আছে,

অনায়াসে ওখানকার ভদ্র সমাজটির সঙ্গে মিশে যেতে পারত। মেশেও, কিন্তু মিশ খায় না। ইচ্ছে করেই রূঢ় ব্যবধান সৃষ্টি করে রাখে। অন্তত রাখতে চেষ্টা করে যে, সেটা প্রথম বারের আলাপে নিজেকে লোকাল বর্ন ঘোষণা করা থেকেই স্পষ্ট অনুমান করা যেতে পারে।

মহাদেব লোকাল বর্ন।

বিদ্রোহের মাশুল দিতে এসেছিল পিতামহ। সিপাই দাঙ্গার শেষ পর্যায়ের চালান। আর ফেরেনি। প্রায় বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করেছিলেন এক মারাঠী কয়েদী মেয়েকে। তাঁরই বংশধর মহাদেব। লোকাল বর্ন। কিন্তু আলাপ আলোচনায় ওই স্বাধীনতাকামী পূর্বপুরুষদের প্রতি কোনদিন এতটুকু শ্রদ্ধার অনুভূতি দেখিনি মহাদেবের মনে। বরং একটা ক্ষোভ লক্ষ্য করেছি। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কও হয়েছে অনেক। কিন্তু স্বাধীনতার জন্যেই হোক, বা মানুষ খুন করেই হোক, যারাই দণ্ড নিয়ে গেছে ওই নির্বাসন দ্বীপে—তাদের কারো প্রতিই এতটুকু সহানুভূতি নেই তার।

কারণ স্পষ্ট। কারণ, লোকাল বর্ন সৃষ্টির জন্য তারাই দায়ী। ওই দ্বীপের সমাজে ঘৃণ্য হেয় এক জাতের উদ্ভব ঘটিয়েছে তারা।

*

* *

হঠাৎ প্লেনের আওয়াজটা অন্য রকম লাগতে দেখি, অনেক নিচে নেমে এসেছি।

ছোট বড নানা আকারের অসংখ্য ঝোপের মত দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের ওপর। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে সেগুলো, বড হয়ে উঠছে। জঙ্গল ছাওয়া পাহাড বোঝা যাচ্ছে। দু'শ চারটা দ্বীপ নিয়ে আন্দামান। তার মধ্যে নামমাত্র ক'টা দ্বীপে মানুষের বসতি। বাকিগুলোতে সভ্য মানুষের পা পডেনি এখনো। ভাবতেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে ভিতরটা। এত কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি দেখাচ্ছে সব যেন এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ঢিল ছোঁড়া যায়।

পিছনে বসে থাকা সম্ভব হল না। তাডাতাডি অয়্যারলেস-এর খুপরিতে চলে এলাম। কেমন করে প্লেন জলে নামায় ক্যাপ্টেন, সেটাও দেখা যাবে। এরই মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ একেবারে বদলে ফেলেছে ক্যাপ্টেন। শাদা ধবধবে নেভি পোশাক আর নেভি ব্যাজ।

পাহাডের বোঁয়াগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। দ্বীপগুলোকে আর পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি মনে হচ্ছে না ততো। এত নিচে নামার ফলে স্পিডও

স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাচ্ছে। পাহাড় ঘেঁষে চক্রাকারে ঘুরছে প্লেন। প্রায় ছুঁয়ে যাচ্ছে যেন। একবার লেগে গেলে কি হবে ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

সভয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালাম।

কিন্তু এ ক্যাপ্টেন ভিন্ন মানুষ। একাগ্র, কর্মতৎপর। স্টিয়ারিং ধরা হাতে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই।

জল স্পর্শ করল প্লেন। স্পর্শ করছে আর উঠছে। শাস্ শাস্ শব্দ হচ্ছে জল কাটার। দুই পাখার মাথায় দুটো উল্টো ডিঙির মত ঝুলছে কি যেন, জলের ওপর প্লেনের স্পিড কণ্ট্রোল করছে ও দুটো। এর পর বিপুল গর্জনে এবং তীব্র গতিতে গোটা সমুদ্রের শান্তি যেন খুঁড়ে খুবলে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিতে লাগল এইটুকু প্লেন। আধ ঘণ্টার ওপরে লাগল সেই গতি বশে এনে পারের দিকে আসতে।

চারদিকে চেয়ে সৌন্দর্যের বিপুল বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

কালাপানি…!

কালাপানি নাম কেন ?

কালো জল বলে কেন লোকে!

নীল আকাশের থেকেও তকতকে নীল। আগাগোড়া স্বচ্ছ নীল সমুদ্র। অবশ্য পরে মেঘলা আকাশে কালাপানির বর্ণান্তর দেখেছি। আলকাতরার থেকেও গাঢ় কালো দেখায় তখন। আর, বঙ্গোপসাগরের আকাশ বছরের বেশির ভাগ সময়ই তো মেঘে ঢাকা!

কিন্তু এই প্রথম সৌন্দর্য স্মৃতি ভোলবার নয়। আকাশ পাহাড় জঙ্গল সমুদ্র সব যেন এক সুন্দরের তপস্যায় মগ্ন। এই আন্দামান এতকাল বিভীষিকা ছড়িয়েছে সাগর পারের মানুষদের মনে!

প্লেন চলেছে পারের দিকে। আমি অভিভূত।

যে জায়গায় পদার্পণ করলাম, তার নাম মেরিন-প্লেস। সংক্ষেপে মেরিন। পরিবেশ নামের অনুরূপ। জাহাজ ঘাট যেমন হয়। আশেপাশে জাহাজের অফিস। বীচ্-এ লোক জমেছে মন্দ না। প্লেনে আসার ফলে অনেকেরই চোখে মুখে একটু সশ্রদ্ধ কৌতূহল দেখা গেল। তাদের ভিতর থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সানন্দ-অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো সাণ্টু ঘোষ। বলল বাঁচা গেল, আসবে কি আসবে না ভেবে ধুকধুক করছিল ভেতরটা। না এলে প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে যেত আমার।

আসব লিখেছি, আসব না কেন ? তোমার পা তো দেখছি সারেনি এখনো…

ড্যাম ইওর পা। ব্যস্তসমস্তভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার স্যুটকেস্ আর হোল্ডঅল নামিয়ে ট্যাক্সিতে তোলার ব্যবস্থায় এগোলো সে। সঙ্গে সঙ্গে মুখের কামাই নেই।—আরে বাবা কেরানীর কাছেও এরোপ্লেনে চেপে লোক আসে আন্দামানে, হাঁ করে দেখছ কি, তুলে নিয়ে চাপাও না ট্যাক্সিতে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলছে। এখানে ট্যাক্সি আসে একেবারে বীচ্ পর্যন্ত। ঘুরে দাঁড়িয়ে সাণ্টু ঘোষ তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ওহে বাবু, আর আছে কিছু, না এ দুটোই?

ঘাড় নাড়লাম, আর কিছু নেই।

মহাদেবকেও নিঃসন্দেহে আশা করেছিলাম এখানে। তাকে না দেখে অবাক হলাম। সাণ্টু ঘোষকে জিজ্ঞাসা করব সে ফুরসতও পাইনি।

ক্যাপ্টেনের দিকে চোখ পড়তেও আশাভঙ্গের ধাক্কা খেলাম একটা। শুধু মহাদেবকেই আশা করিনি। আর এক মেয়েকেও এখানে দেখতে পাব ভেবেছিলাম। দেখেই যাকে চিনব। কিন্তু তার বদলে যাদের দেখলাম তাদের কথা সাণ্টু ঘোষও কোনদিন বলেনি।

জনা দুই বিমান-কর্মচারী এবং একজন প্রায়-বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ পুরুষের আগে আগে ক্যাপ্টেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে নীল-নয়না দুটি তরুণীর বাহু বেষ্টন করে। নীল আকাশের নিচে নীল সমুদ্রলগ্ন ঝকঝকে বীচে ধপধপে শাদা ফ্রকপরা হাস্য-মুখী মেয়েদুটিকে প্রাণোচ্ছল মনে হল। এই পরিবেশে যেমনটি মানায়। দেখছি···। দু'জন নয়, ক্যাপ্টেনের দক্ষিণ বাহুলগ্ন মেয়েটিই বেশি হাসিখুশি, চঞ্চল-মুখরা। তারই টুকরো টুকরো হাসি বীচের লোকদের সচকিত করছে। সুন্দরী কি না ঠিকমত ঠাওর হবার আগে দেহ-সৌষ্ঠবটুকু চোখে পড়ে। ক্যাপ্টেনকে এক একবার হ্যাঁচকা টানে অন্য মেয়েটির কাছ থেকে সরিয়ে আনছে আর হেসে উঠছে কলকল করে।

অপর মেয়েটিও হাসছে বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত শান্ত মনে হল তাকে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন। রোগাই বলা চলে। মুখের আদলে অনুমান, দু'টি বোন ওরা। পিছনের শ্বেতাঙ্গ পুরুষটি সম্ভবত ওদের বাবা। তাঁর মুখেও প্রশ্রয়ের মৃদু হাসি।

হাসছে ক্যাপ্টেনও। হাসিটা অনুরাগসিক্ত বলে মনে হল না আমার। স্নেহভাজন ছেলেমানুষের পাল্লায় পড়ে বয়স্করা যেমন হাসে। প্রীতি আছে, আনন্দও আছে, কিন্তু খুব একটা আকর্ষণ নেই যেন। এদিকেই আসছে তারা। গা-ছাড়া সেই শিথিল দুর্বল চলার ভঙ্গি ক্যাপ্টেনের। খানিক আগের একাগ্র

তৎপরতার চিহ্নও নেই আর। অলস চোখে ঘাড় ফিরিয়ে দুই একবার এদিক ওদিক তাকালো। আরো দু'তিনটি নারীমূর্তি দেখা যাচ্ছে বীচে। কিন্তু তাদের কেউ যে ইন্দুমতী নয় সেটা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

পাশ কাটাতে গিয়ে ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে পড়ল। হাসল একটু। জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে এখন ?

খুব ভালো ?

ভেবেছিলাম আর একবার ধন্যবাদ দেব। কিন্তু সেরকম কোনো কথা মুখে এলো না। তার সঙ্গিনী দু'জনের সকৌতুক কটাক্ষে নজরবন্দী হয়ে উল্টো শঙ্কা জাগলো, প্লেনের দুরবস্থাটা না ফাঁস হয়ে যায়। ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে আশ্বস্ত হলাম, কারো দুর্বলতা নিয়ে মজা করার'মানুষ সে নয়।

মেয়ে দু'টি তার হাত ছেড়ে ভব্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখছে কি আমার ধুতি-পাঞ্জাবি দেখছে সঠিক বোঝা গেল না। ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে হাস্য-চপল মেয়েটির অস্ফুট প্রশ্ন কানে এলো, তোমার প্যাসেঞ্জার…?

ক্যাপ্টেন ঘাড নাড়ল। তারপর সৌজন্যের খাতিরে পরিচয় জ্ঞাপন করল, ডোরা টমাস…মার্থা টমাস।

তারা মাথা নোয়ালো। সপ্রতিভ মুখে আমিও সেই রকমই চেষ্টা করলাম কিছু। সাণ্টু ঘোষ কাছে আসতে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম তাকে। যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে ক্যাপ্টেন বলল, এখানে আছ যখন আবার দেখা হবে, গুড বাই।

শ্লথ পায়ে সসঙ্গিনী অদূরের ট্যাক্সির দিকে এগোলো সে। কোনো কিছুতে যেন তাড়া নেই তার।

মেরিন ছাড়িয়ে আমাদের ট্যাক্সিও পাহাডী পথে উঠতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, মহাদেবকে দেখলাম না যে ?

একটু বিরক্তির ঝাঁঝেই জবাব দিল সাণ্টু ঘোষ, দেখবে কি করে, মদনের বাণ খেয়ে সন্ত ধ্যান ভেঙেছে, আপাতত উমার রূপে খাবি খাচ্ছেন তিনি—।

মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। এও প্রণয়ের ব্যাপারই কিছু, এটুকু থেকেই বোঝা গেল। কিন্তু বন্ধুত্ব অবজ্ঞা করার মত বড করে দেখা সম্ভব হল না সেটা। মহাদেবের কাছে অন্তত এরকমটা আশা করিনি।

সাণ্টু ঘোষ আবার বলল, পরশু তোমার টেলিগ্রাম পাওয়ার পর থেকেই তিনবার করে খুঁজেছি তাকে, কিন্তু সে কি আর এ জগতে আছে! আজ এই দ্বীপে যাচ্ছে, কাল ওই দ্বীপে—নতুন কলোনী করবে, নতুন জাত গড়বে দু'জনে

মিলে—কত কি করবে, তার দেখা পাওয়াই আজকাল ভাগ্যের কথা। বিকেলের দিকে ফিরবে শুনেছি, যাওয়া যাবে'খন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। আমি আসছি জানে না যখন, তার আর দোষ কি। কিন্তু সাণ্টু ঘোষের বলার ধরন দেখে বিস্মিত হচ্ছিলাম একটু। মহাদেব-প্রসঙ্গে বরাবরই সসম্ভ্রমে কথা বলতে শুনে এসেছি তাকে। যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে দু'পাশে দেখার দিকে মন দিলাম। ও-সব তো ধীরেসুস্থে শোনাই যাবে।

এঁকে বেঁকে বাঁধানো পাকা রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। দূরে দূরে এক একটা টিলার ওপর কাঠের বাড়ি, লাল টিনের চালা। চারদিকে সমুদ্র আর পাহাড়ী জংলা দ্বীপ। কিন্তু সাণ্টু ঘোষের তো এসব দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। সমানে মুখ চলতে লাগল তার। কখন উঠেছি কলকাতা থেকে, কেমন লাগল প্লেনে আসতে, একা আসতে ভয় হয়েছিল কি না।

সংক্ষেপে হ্যাঁ না করে জবাব দিতে লাগলাম। বেশি বলব কি, এখানে আসার পর সেই মানসিক অস্বস্তি মনে পড়তে নিজেরই বেশ সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল।

সাণ্টু ঘোষ কথার মোড় ফেরাল।—ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ডের সঙ্গে তোমার তাহলে বেশ ভাবসাব হয়েছে?

হ্যাঁ, চমৎকার লোক।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সাণ্টু ঘোষ।—বেচারী…।

মহাদেবের প্রণয় প্রসঙ্গ পরে শুনব বলে চুপ করেছিলাম। কিন্তু হেওয়ার্ডের বেলায় সবুর সইল না।—কি সব লিখেছিলে বল তো? সেই মেয়েটা সরে পড়ার মতলব করেছে?

পাণ্টা বিস্ময়ের তাড়া খেতে হল সাণ্টু ঘোষের কাছ থেকে।—তুমি শুনলে কি ছাই এতক্ষণ বসে! সরে পড়ার মতলবটি প্রায় শেষ করে এনেছে এতদিনে, ইন্দুমতী এখন মহাদেবের শরণাগতা।

বেশ বড় রকমের ঘা খেলাম একটা।—মহাদেব!…ইয়ে, আমাদের মহাদেব?

সাণ্টু ঘোষ ঝাঁঝিয়ে উঠল, সাহিত্য-করা ছেড়ে দিয়েছ নাকি?

হাঁ হয়ে গেলাম। এ শুধু অচিন্তিত নয়, অবিশ্বাস্য। এই সাণ্টু ঘোষই একদা পরম গৌরবে জ্ঞাপন করেছিল, আন্দামানে ইন্দুমতীর সব থেকে বড় শত্রু মহাদেব। বিস্ময় কাটতে সময় লাগল।

কতদিন হয়েছে এরকম?

তা মাস ছয় হল প্রায়, কলকাতা থেকে ফেরার পরে পরেই।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হেওয়ার্ড জানে সব ?

—হেওয়ার্ড তো আর কচি ছেলে নয় ! এই ছ'মাসে বার পাঁচেক এসেছে গেছে—শেষবার তো রাফ্‌সী থেকে প্লেন ওঠানো গেল না বলে দেড়-মাস থেকেই গেল—একেবারে না হোক আস্তে আস্তে বুঝেছে ঠিকই, বাকি যেটুকু আছে এবারে বুঝবে। তুমি বড় মোক্ষম সময়ে এসেছ।

হঠাৎ দমে চুপসে গেলাম একেবারে। ক্যাপ্টেনের কাছে এই মহাদেবের পরিচয় দিয়েই নিজের দর বাড়াতে চেষ্টা করেছিলাম। হেওয়ার্ডের সেই নীরবে চেয়ে থাকাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মহাদেব ভালো করেছে কি মন্দ করেছে, কিছুই জানিনে যখন, সে বিচার করছিনে। হেওয়ার্ড কি ভেবেছে সেটাই ভাবছি।

—হেওয়ার্ডকে রিসিভ করতে এসেছিল এই মেয়ে দুটো কে ?

গল্পের খোরাক পেল সান্টু ঘোষ। এক কথার জবাবে সোৎসাহে একশ' কথা ফেঁদে বসল সে। সার মর্ম, বড় মেয়েটা অর্থাৎ সুন্দরমত মেয়েটা ডোরা আর রোগা মেয়েটা মার্থা। টমাসের মেয়ে। টমাস অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। বিপত্নীক। সেলুলার জেলের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পেনশান নিয়ে জঙ্গলের কাজের বে-সরকারী ম্যানেজারী করেছেন কিছুকাল। এখন কিছু করেন না, হাই সোসাইটিতে কোপরদালালি করে বেড়ান শুধু, আর রামি খেলেন। রামি অর্থাৎ তাসের জুয়া। মেয়েও হয়েছে তেমনি। ছোট মেয়েটা ভালো গোছেরই। কিন্তু ডোরা এক নম্বরের দজ্জাল—সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াচ্ছে। যার টাকা আছে আর ফুর্তি করার শখ আছে সেই ইচ্ছে করলে টানতে পারে এই মেয়েটাকে। টমাসের ইচ্ছে ক্যাপ্টেনের কাছে একটা মেয়েকে গছায়। মার্থাকে দিয়ে আশা ভরসা নেই তার, ডোরা ইচ্ছে করলে ক্যাপ্টেনের কাঁধে ঝুলতে পারে বলে বাপের বিশ্বাস। কিন্তু সেও হয়ে উঠছে না বলে শেষ পর্যন্ত টমাসের সব রাগ গিয়ে পড়ছে মহাদেবের ওপর—।

মহাদেব আবার কি করল ?

করবে আবার কি ! মহাদেবের টাকা আছে, মহাদেবের স্টীম বোট আছে, মহাদেবের জিপ আছে, মহাদেবের স্কুটার আছে। এত সব আছে বলেই ডোরা টমাসের এত টান মহাদেবের ওপর। বাপের ধারণা, এই টানের দরুনই হেওয়ার্ডকে তেমন করে টানছে না তার মেয়ে। একটা আধ-ফর্সা বাঙালী মেয়ে যা পারল, শাদা-চামড়ার মেয়ে সেটুকু পারে না এ আর কোন বাপে বিশ্বাস করে। এটুকু থেমে সান্টু ঘোষ বলল, এর অনেক আগে থেকেই টমাসের সাজ্ঘাতিক

রাগ মহাদেবের ওপর—সে এক ভয়ানক কাণ্ড, পরে বলব'খন।

ভয়ানক কাণ্ড শোনার প্রতি আগ্রহ না দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মহাদেবও এই ডোরা মেয়েটিকে প্রশ্রয় দেয় বুঝি?

সাণ্টু ঘোষ জবাব দিল, আগে দিত। এখন ইন্দুমতীই সবটা জুড়ে বসেছে। তবে বোটটা জিপটা এখনো চাইলেই পায়…।

মস্ত একটা দোতলা কাঠের দালানের সামনে ট্যাক্সি থামল। জায়গাটার নাম হ্যাডো। স্থানীয় অভিজাতদের আবাস বেশির ভাগই এদিকটায়। মহাদেবও এদিকেই বাড়ি করেছে। গেস্ট হাউস, অর্থাৎ হেওয়ার্ড যেখানে থাকবে সেও আর একটু এগোলেই। এই বাড়িটায় পাঁচ-মিশালি ভাড়াটে থাকে। এক তলায় একটা মাঝারি সাইজের ঘর নিয়ে আছে সাণ্টু ঘোষ। বিয়ে করেনি এখনও। করবে এমন আশাও নেই। কুকারে নিজের রান্না নিজেই করে। পা ভাঙার পর থেকে এই বাড়িরই কে একজন বাজারটা করে দেয়। ঘরের দেয়ালে কালী এবং গণেশের দুখানি পট ঝোলানো। দেব-দেবীতে ভক্তি আছে সাণ্টু ঘোষের জানতুম না।

আমি আসব বলে একটা ফিতের চারপায়া সংগ্রহ করে রেখেছিল সে। খাওয়া দাওয়ার পর বিছানা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও বিশ্রাম করো এবার।

বিছানায় গা এলাতে গিয়ে মনে হল, বিশ্রামের প্রয়োজন কী? যত পথই এসে থাকি, এই সকালেও তো ছিলাম কলকাতাতেই! ভোর রাতে স্ত্রী চা করে খাইয়েছে। আর এখন তিনটেও বাজেনি—খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত সারা!

আধ ঘণ্টার মধ্যে সাণ্টু ঘোষকে একরকম তাড়িয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। খোঁড়া পা নিয়ে তার পক্ষে বেশি হাঁটা কষ্টকর। আর চলতে হলেও হয় উপরে উঠতে হবে নয়ত নিচে নামতে হবে। ভরসা দিলাম রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ধরে নেব।

কিন্তু ট্যাক্সির সংখ্যা এখানে কম। দরকার হলেই মেলে না। পায়ে হেঁটেই গেস্ট হাউস ছাড়িয়ে এক সময় মহাদেবের বাড়ির সামনে হাজির হওয়া গেল। ছোট্ট সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান একটু। আমাদের দেখে নিম্ন শ্রেণীর একজন লোক বেরিয়ে এলো। সাণ্টু ঘোষ মহাদেবের খোঁজ করতে পরিষ্কার বাংলাতেই জবাব দিল, খানিক আগে সাহেব হ্যাভলক্ আইল্যাণ্ড থেকে ফিরেছে, এসেই শুনেছে মা-শাইন সকাল থেকে দু'তিনবার লোক পাঠিয়েছে —তাই খুব সম্ভব তার ওখানেই গেছে।

বেরিয়ে এসেই অস্ফুট কটূক্তি করে উঠল সাণ্টু ঘোষ।—যত সব, এবারে

মেয়ের পাল্লায় পড়েই মরবে লোকটা।

বোঝা গেল মা-শাইন কোনো মেয়ে।—কি ব্যাপার?

সব জানবে, এসেছ যখন চোখ কান খোলা রেখে দু'দিন সবুর করো, সব জানবে।

বরাতগুণে এবারে ট্যাক্সি জুটল। উঠে বসতে ড্রাইভারের প্রতি সঙ্গীর নির্দেশ শুনলাম, অ্যাবার্ডিন।

এ'দিকটাই পুরনো শহরের দিক। পোর্টব্লেয়ারের বাজার, ব্যবসায়কেন্দ্র সব কিছু। পাঁচ মিশালি বসতিও আছে। কাঠের দোতলা বাড়ি। ছোট-বড় হলেও দেখতে এক রকম। লাল টিনের টালি। সব বাড়িরই টিনের টালি কেন, তার বিশেষ কারণ আছে। এখানে সব থেকে বড় অভাব খাবার জলের। বছরের বেশির ভাগই বৃষ্টির জল ভরসা। প্রথম কয়েক পশলা জলে ঢালু টিনের ছাদ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেলে নিচে ড্রাম পেতে গড়ানো জলটা ধরা হয়। তারপর ফুটিয়ে নিলেই হল। কুয়ো অবশ্য আছে, কিন্তু জল বড় থাকে না, শুকিয়ে যায়।

আগাগোড়া ঝকঝকে রাস্তা এদিকেও। কিন্তু দু'দিকের রাস্তার ওপর ঝুঁকে থাকা লাল টিনের টালিগুলোর দরুনই বোধ হয় দেখতে ভালো লাগে না। বিসদৃশ চাপা-ভাব একটা। বাড়িগুলোর একতলায় দোকান-ঘর ব্যবসা-পাতি, দোতলায় বাসের ব্যবস্থা। পাঞ্জাবী মাদ্রাজী মালোয়াড়ি বর্মী প্রভৃতি সব জাতের ঘন সমাবেশ। বর্মীর সংখ্যাই হয়ত বেশি। নির্বাসন দণ্ডের আমলেও শুনেছি প্রচুর বর্মী নারী-পুরুষ চালান হত এখানে। গোটা বর্মা দেশটার লোকসংখ্যা বাংলা দেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হবে কি না সন্দেহ। অথচ, অপরাধীর সংখ্যা বাংলা দেশ থেকেও অনেক বেশি হত। এই থেকে একটা দেশের মেজাজ অনুমান করা যেতে পারে।

ট্যাক্সি থামল একটা দরজীর দোকানের সামনে। ছোট্ট সাইনবোর্ড, ছোট কাঠের ঘর। সেই ঘরের ভিতর দিয়ে ভিতরে আর একটা ঘর। সেলাইয়ের পা-মেসিন চালাচ্ছে একটি লোক। তার একটি মাত্র হাত। অপর হাতটি কনুইয়ের ওপর থেকে কাটা। কিন্তু তার সেলাইয়ের তৎপরতা দেখে মনে হয়, দ্বিতীয় হাতের দরকারও নেই কিছু, ওটা বাড়তি। রুক্ষ জোয়ান চেহারা।

সান্টু ঘোষ এখানেও সুপরিচিত। তাড়াতাড়ি সেলাইয়ের টানটুকু সেরে নিয়ে উঠে এলো লোকটি। হিন্দীতে প্রশ্নোত্তর হল। হিন্দী সর্বজনীন বা বারোয়ারি ভাষা এখানকার। সকলেই বলে, সকলেই বোঝে। সে জানালো, মহাদেব এখানে এসেছিল, কিন্তু মা-শাইন জরুরী দরকারে সরাইখানায় শেঠ-এর

সঙ্গে দেখা করতে গেছে শুনে চলে গেছে। বোধ হয় সেখানেই গেছে।

এবারে সাণ্টু ঘোষ রীতিমত রেগে গেছে বোঝা গেল। বেরিয়ে এসেই গজগজ করে উঠল, মা-শাইন সরাইখানায় গেছে না তোমাকে কলা দেখাতে গেছে কে জানে!

লোকটার পরিচয় কৌতূহলোদ্দীপক। নাম থ-মিন। মা-শাইনের কেমন ধারা আত্মীয় না কি।—আত্মীয় না ছাই, এমন আত্মীয় ওদের সবাই। বরং ভাই-বন্দি ছিল বলতে পারো। হাসল সাণ্টু ঘোষ, ভাই-বন্দি বুঝলে?···কোনো পুরুষের সঙ্গে ভাবসাব একটু বেশি হয়ে গেলে পরিচয় কি দেবে মেয়েগুলো? বলে ভাইবন্দি, অর্থাৎ বন্ধু। তা ও বেচারী এখন বন্ধুও নয়, প্রায় কর্মচারী। কিন্তু মহাদেবের খুব প্রিয়পাত্র লোকটা, ওর শেল-ডাইভারদের মধ্যে সব থেকে এক্সপার্ট এই লোকটাই। বর্ষায় শুধু দরজীর কাজ করে, শেল-ফিসিং-এর সময়ে মোটা রোজগার ওর।

আমি অবাক।—একটা তো মাত্র হাত ওর, ডুবুরীর কাজ করে কি করে?

এক হাতেই যথেষ্ট। ড়ুটোই ছিল, একটা হাঙরে কেটেছে। হাসপাতালে মহাদেব আর আমি যখন দেখতে গেলাম ওকে, অন্য হাতে সেলাম করে বলল, সাহেব এই হাতটা আছে।

থ-মিন কিন্তু বাজে কথা বলেনি। খানিকটা এগিয়েই শেঠ-এর সরাইখানা। দরজার কাছে যে লোকটা বসে আছে সেই মালিক। এখানে মহাদেবের সন্ধান মিলল। ভিতরে আছে শুনে সাণ্টু ঘোষ প্রায় হতভম্ব। মদের দোকানের মালিক-শেঠ-এর সঙ্গে মা-শাইনের কাজ থাকতে পারে, কিন্তু মহাদেব এখানে আসবে না এ সে ধরেই নিয়েছিল।

কারণ আছে।

আন্দামানে জলের বদলে নাকি মদ চলত। চলত বলছি তার কারণ, বর্তমানে নিষেধ-আইন জারি হয়েছে এখানে। মদ খাওয়া নিষেধ নয়, আমদানী নিষেধ। যাই হোক, স্থানীয় লোকেরা, বিশেষ করে লোকাল বর্ন স্মাজটি মদ ছাড়া অচল। ও জিনিসটি না হলে কোনো উৎসব-পর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ নয়। এরই মধ্যে মহাদেব ছিল বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। সরকারী প্রায় কোনো কাজের সঙ্গেই যার কোনো আপস নেই, এই নিষেধজারি আইন পাস করানোর ব্যাপারে সে তাদেরই হাতে হাত মিলিয়েছে। ফলে অনেকেই, বিশেষ করে সরাইখানার মালিক এই শেঠ তার শত্রুস্থানীয়। প্রকাশ্যে এখানে এখন শরবত সোডা লিমনেড বিক্রি হয়, কিন্তু অপ্রকাশ্যে কি হয়, সে বিষয়ে সকলেই সন্দিহান।

এ হেন পরিবেশে মা-শাইনের সঙ্গে মহাদেব ভিতরে ঢুকে বসে আছে, শুনলে অবাক হতেই পারে সাণ্টু ঘোষ।

মৃদু হেসে আমাদের ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করল শেঠ। রাস্তা থেকে তিন চার সিঁড়ি ওপরে উঠে ভিতরে যেতে হয়। কিন্তু সবটা আর যেতে হল না। তার আগেই পা থেমে গেল।

সব শেষের পর্দা দেওয়া খুপরি থেকে জ্বলন্ত নারীকণ্ঠের বেদম ঘা খেয়ে দু'জনেই হকচকিয়ে গেলাম।

সাণ্টু ঘোষ বলেছিল, বড় জবর সময়ে এসেছি এই আন্দামানে। কিন্তু একেবারে যে মধ্য অঙ্কে এসে হাজির হয়েছি সেটা একবারও ভাবিনি।

কর্কশ জ্বালাময়ী নারীকণ্ঠ যেন গলে গলে কানের ভিতরে ঢুকতে লাগল। হিন্দীতে এক নারী দ্বিতীয় কারো উদ্দেশে বাক্যাগ্নি উদ্‌গিরণ করছে। তার শুদ্ধ মর্মার্থ, তুমি পাজী, তুমি বেইমান, তুমি ইতর, তুমি নেমকহারাম—তোমার জন্যে আমি কি করেছি সব ভুলে গেছ, একটা বাঙালী মেয়ে তোমাকে ভুলিয়েছে, ওই বজ্জাত মেয়েটার ফাঁদে পা দিয়েছ তুমি—তোমাকে খুন করা উচিত, তোমাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত—

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠলাম।

আর কাশতে গিয়ে গলা দিয়ে একটা বিদঘুটে শব্দ বার করে ফেলল সাণ্টু ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের ঝড় থেমে গেল। একটা তামাটে পুরুষ-হাত পরদা সরালো। তারপর গলা বাড়াল যে, সে মহাদেব।

কে, ভালো করে না বুঝেই বেরিয়ে এলো সেই খুপরি থেকে। বিস্ময়ের ধাক্কায় হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। উৎকট আনন্দে ফেটে পড়ল তারপর।—তুমি! তুমি এসে গেছ? হোয়াট এ সুইট সারপ্রাইজ! কখন এলে? কবে এলে? কই আমি তো কিছু জানি না।

জবাব দেব কি, তার দু'হাতের ঝাঁকানি সামলাতে প্রাণান্ত অবস্থা।

পরদা নড়ল আবার। বেরিয়ে এলো ভিতরে আর যে ছিল, সে। সভয়ে দেখলাম তাকে। পুষ্ট, ঋজু নারী মূর্তি। পরনে দামী সিল্কের লুংগি, গায়ে সাদা গলাবন্ধ আঁট জামা। পাতলা জামার ভিতর দিয়ে বুক-পিঠ জড়ানো সাদা অন্তর্বাস বড় বেশিরকম চোখে পড়ে। পিঠে ছড়ানো খোলা চুল। শান্ত গম্ভীর নেত্রে আমাদের দেখল একবার। কোনো দরকারী কাজে ব্যস্ত ছিল, বাধা পড়তে ঈষৎ বিরক্ত যেন। মহাদেবের দিকে একবারও না চেয়ে গম্ভীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

এরকম পরিস্থিতিতে সাক্ষাতের অমন ধারা আনন্দটা মহাদেবের হল কি করে মহাদেবই জানে। সাণ্টু ঘোষ ভুরু কুঁচকে তাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে নিল একটু। বলল, ওই মুখেই শেষ করেছে না দুই এক ঘা বসিয়েছে?

মহাদেব হেসে উঠল হা হা করে। দু'হাতে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। সন্তর্পণে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, রাস্তার ধার ঘেঁষে মা-শাইন চলেছে মন্থর গতিতে। সুঠাম চলনের ভঙ্গিতে আকর্ষণী মাধুর্য।

মহাদেব উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, তুমি সত্যি অবাক করেছ আমাকে, আই নেভার—

থেমে গেল। হঠাৎ স্মরণ হল যেন কিছু।—ও···হেওয়ার্ডের প্লেন এসেছে আজ, না? চকিতে তাকালো একবার সাণ্টু ঘোষের দিকে।—রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা নয়, জিপটা ধরে নিচ্ছি, ওকে নিয়ে এসো স্ট্যাণ্ডের দিকে—।

সরাইখানার ওধারের সিঁড়ির আড়ালে স্কুটারটা আগে চোখে পড়েনি। শশব্যস্ত আনন্দে মহাদেব স্কুটার হাঁকিয়ে এগিয়ে চলল। মা-শাইন যে দিকে গেছে তার উল্টো দিকে।

একটা হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে সাণ্টু ঘোষ বলল, হৈ হুল্লোড় চাইছিলে, চলো এবার—

দু'পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, দেখলে মা-শাইনকে?

দেখলাম।

কেমন।

মারাত্মক।

মুচকি হেসে সাণ্টু ঘোষ মন্তব্য করল, খুব ভুল বলোনি, এমনিতে বেশ ভালো এরা, কিন্তু ক্ষেপলে মারাত্মকই বটে, বুকে সোজা ছুরি বসাতে পারে।

ঘাবড়ে গেলাম একটু।—কিন্তু এ তো রীতিমত ক্ষেপেছে?

রীতিমত নয়, সামান্য। রাত্রিতে হয়ত দেখবে এ ওর বাড়িতে, নয়ত ও এর বাড়িতে ডিনার খাচ্ছে।

আমার বিস্ময়টুকু তার আনন্দের খোরাক হল বেশ। উৎফুল্ল মুখে বলল, দেখবে, সব দেখবে, সবে তো শুরু! তোমরা ভাবো আন্দামান এখনো বুঝি সেই নির্বাসনের জায়গা—এখন এর আগাগোড়া আস্ত একটি লীলাক্ষেত্র, বুঝলে?

বুঝলাম। এখানে পা ফেলতে না ফেলতে রোমাণ্টিক হাওয়ার যে ভাবগতিক দেখছি, সাণ্টু ঘোষকে আর না উসকানোই উচিত ছিল। কিন্তু কৌতূহল নাছোড়বান্দা। জিজ্ঞাসা করলাম, এই মা-শাইনটি কে হে···দু' নম্বর নাকি?

সাণ্টু ঘোষ ফিরে তাকালো। ভুরু কুঁচকে পাণ্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, দু'নম্বর মানে?

এক নম্বর তো শুনলাম ডোরা টমাস···।

হুঁঃ! অজ্ঞতার বহর দেখে প্রায় নিরাশ হল সাণ্টু ঘোষ।—এই চোখ নিয়ে কি করে সাহিত্য করো বুঝি না। ওই ফিরিঙ্গি মেয়েটাকে লুংগির ট্যাকে গুঁজে নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসায়ের হিসেব কষতে পারে মা-শাইন। ও-ই এক নম্বর ছিল এতকাল, এখন দু' নম্বর হয়েছে ইন্দুমতীর জন্যে। ঝাল কার ওপর নিজের কানে শুনলে না! ফকিরুদ্দিন বলে—

কে ফকিরুদ্দিন, বা কি বলে সে, শোনার অবকাশ হল না। সামনে মহাদেবের জিপ দেখা যেতে ইশারায় থামতে বললাম তাকে। বাধা পেয়ে সাণ্টু ঘোষ বিড়বিড় করে বলে উঠল, এখানে সবাই সব কিছু জানে, তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

জিপ হাঁকিয়ে মহাদেব সোজা তার বাড়ি নিয়ে এলো আমাদের। হাঁক ডাক করে খাবার ব্যবস্থা করল। বাড়ি দেখালো, বাগান দেখালো। কথা বলল অনর্গল। শেষে উঠে দাঁড়াল আবার।—বসে থাকে না, চলো দ্বীপ দেখিয়ে আনি তোমাকে।

জিপ ছুটল আবার। তিন জনেই সামনে বসেছি। উঁচু-নীচু আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী রাস্তা। কিন্তু তারই মধ্যে স্পীডের বহর দেখে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। লোকালয়ের বাইরে পাহাড়ী ফাঁকা রাস্তায় পড়তে জিপের গতি আরো বাড়লো। এর মধ্যে দ্রষ্টব্য যা কিছু তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে মহাদেব। আকাশ সমুদ্র পাহাড় আর জঙ্গলের নানা ছাঁদের অপরূপ মিলন। দু'চোখ ভরে দেখার মতই; কিন্তু দেখব কি, জিপের গতিতে গা শিরশির করছে!

শেষে সাণ্টু ঘোষই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করল কিছুটা। সামনের দিকে চোখ রেখে নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞাসা করল, ওহে, লাইফ ইনসিওরেন্স টিন-সিওরেন্স করা আছে তো ভালো মত?

দু'জনেই ঘাড় ফেরালাম তার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে বলছ?

নয়তো আর কাকে! বলছি, এ যাত্রা যদি প্রাণটা নিয়ে না-ই ফিরতে পারো এখান থেকে, ওদিকে খেয়ে পরে বাঁচবে তো কিছুদিন?

মহাদেব হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর স্পীড কমিয়ে লজ্জিত ভাবে বলল, জোরে চালাচ্ছি নাকি খুব? কি জানি, আমি ঠিক খেয়াল করিনি···।

আবার ওর বাংলোয় ফিরলাম যখন, রাত হয়েছে। শ্রান্ত লাগছে। এই ক'ঘণ্টায় সমস্ত দ্বীপটাই যেন চষা হয়ে গেল একবার। মহাদেব জিজ্ঞাসা করল, কাল কি প্রোগ্রাম বলো—।

সে তোমরা জানো।

মহাদেব সোৎসাহে প্রস্তাব করল, কাল হ্যাভলক্ থেকে ঘুরে আসা যাক চলো।

ঘুরিয়ে আপত্তি জানালো সাণ্টু ঘোষ। বলল, ওর জন্য আজ আর কাল দু'দিন ছুটি নিয়েছি আমি—।

এক পলক তাকে দেখে নিয়ে মহাদেব বলল, গ্র্যাণ্ড! তাহলে তুমিও চলো।

থাক্।

শ্লেষের মত শোনালো। তার দিকে চেয়ে মহাদেব কিন্তু দিব্বি হাসছে।—থাক্ তাহলে, পরশু হবে'খন, কাল এখানেই ঘোরাঘুরি হোক।

একেবারে রাতের খাওয়া দাওয়া চুকতে জিপে করে আবার ডেরায় পৌঁছে দিয়ে গেল সে। ঘরে ঢুকেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সাণ্টু ঘোষ একবার কালী এবং গণেশ মূর্তির সামনে চোখ বুজে হাত জোড় করে দাঁড়াল খানিকক্ষণ করে। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে বসল।

অনেকক্ষণ ধরে যে কৌতূহল জমে ছিল সেটা'আর চাপা সম্ভব হল না।—হ্যাভলক্ কি ব্যাপার হে?

ক্ষুদ্র জবাব দিল, এই কাছেই দ্বীপ একটা।

সেখানে কি···?

সেখানে স্বর্গরাজ্য তৈরীর জল্পনা কল্পনা চলেছে।

ইন্দুমতী সেখানেই আছে বুঝি?

আপাতত। অফিস কানা করে একধার থেকে ছুটি নিয়ে একের পর এক দ্বীপ চেখে বেড়িয়েছে। এখন হ্যাভলকই ঠিক শুনছি, এবারে এসে চাকরিতে ইস্তফা দেবে বোধ হয়। পোর্টব্লেয়ারে ওই একটিই লোকের মত লোক ছিল, এবারে তার মাথাটিও খেয়েছে বেশ করে!

লোকের মত লোকটি কে সহজেই বোঝা গেল। মহাদেবের প্রসঙ্গে বরাবর গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখেছি এই সাণ্টু ঘোষকে। কিন্তু এবারের ব্যতিক্রম গোড়া থেকেই চোখে পড়েছে। শুধু ব্যতিক্রম নয়, ভাবে আভাসে একটা প্রচ্ছন্ন রূঢ়তাও প্রকাশ পেয়েছে। ওদের দু'জনের বন্ধুত্বের মাঝখানে ও-রকম একটা

মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বলেই বোধ হয়।

ইন্দুমতীর প্রতি তার গভীর বিতৃষ্ণা অনেকবারই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এবারে সেটুকু আরো স্পষ্ট হল যেন। প্রায় রুক্ষ প্রশ্ন ছুঁড়ল একটা, মহাদেবের ফিফ্‌থ-হ্যাণ্ড-লাভারকে দেখবার জন্য তোমারও যেন বেশ একটু আগ্রহ দেখছি?

আগ্রহ এখন হয়নি, বা এত সব জানার পরেও হয়নি। আগ্রহ হয়েছিল সেই প্লেনে হেওয়ার্ডের পাশে বসার পর থেকেই। কিন্তু সেকথা চেপে পাণ্টা বিস্ময় প্রকাশ করতে হল, ফিফ্‌থ-হ্যাণ্ড-লাভার?

নয় তো কী? হাতে গুণে সরোষে একে একে ইন্দুমতীর প্রণয়ীদের ফিরিস্তি দিয়ে গেল সাণ্টু ঘোষ। অনেকক্ষণ ধরে।

সব শোনার পর খারাপ লাগছিল সন্দেহ নেই। খারাপ অবশ্য হেওয়ার্ডকে ছেড়ে মহাদেবের প্রতি ঝোঁকার কথা শোনার পর থেকেই লেগেছিল। কিন্তু এ যেন বড় বেশি নগ্ন। অবাক লাগল, এতসব জানার পরেও মহাদেব কি করে আকৃষ্ট হতে পারে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, মহাদেব যে এসবে মেতেছে, তার ব্যবসায়ে ক্ষতি হবে না?

শুয়ে পড়ে সাণ্টু ঘোষ জবাব দিল, ব্যবসায়ের এমনিতেই বারটা বেজে এসেছে—প্লাস্টিকের কল্যাণে শেল-এর চাহিদা এখন অর্ধেকও নয়, হুড়হুড় করে দাম নেমে গেছে!···ব্যবসায়ের আর তেমন দরকারই বা কি, টাকা অনেক আছে।

পরদিন সাণ্টু ঘোষের বেরুনো হল না। আগের দিন বেশি ঘোরাঘুরির ফলে পায়ের ব্যথা বেড়েছে।

সকাল-বিকাল দ্বীপের সর্বত্র একাই ঘুরে বেড়ালাম মহাদেবের সঙ্গে। বিকেলে বেরিয়ে হঠাৎ একটু হেসে সে বলল, তোমার বন্ধুব কিন্তু আজকাল ভয়ানক রাগ আমার ওপর।

এসব কথায় মন্তব্য করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সহজ পথ ধরাই সুবিবেচনার কাজ। তেমনি হালকা জবাব দিলাম, তোমাকে ভালবাসে খুব—।

হাতের স্টিয়ারিংয়ের দিকে চোখ রেখে মহাদেব অন্যমনস্কের মত কি ভাবল একটু। সচেতন হয়ে হেসে উঠল পরক্ষণেই। বলল, বোধ হয়···।

মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছি, সাণ্টু ঘোষের রাগের কারণ শুনব এবার। অর্থাৎ, ইন্দুমতীর কথা শুনব। শুনব, মেয়েটাকে এতকাল ভুল বুঝেছিল মহাদেব, ভুল বুঝেছিল সবাই। অন্য সকলের ভুল ভাঙুক না ভাঙুক, মহাদেবের ভুল ভেঙেছে। মহাদেব বলবে, ইন্দুমতীর মধ্যে এমন কিছু দেখেছে সে, যা দেখার

মতই। এতকাল দেখিনি কেন সেটাই আশ্চর্য। বাইরেটাই সব নয় মানুষের, বিশেষ করে মেয়েদের। মহাদেব বলবে, যেটুকু সব নয় সেটুকুই সে দেখেছে। দেখতে পেয়েছে। মহাদেব বলবে, নারীর সেই মাধুর্যটুকুর কাছেই তার সমর্পণ।

মহাদেব বেপরোয়া জানি। এখানকার সমাজে যে শ্লেষ বিদ্রূপের কানাকানি চলছে তাকে নিয়ে, তাই থেকে সে বরং পাচ্ছে উত্তম আর উদ্দীপনা। যেখানে রেষারেষির আনন্দ, সেখানে কৈফিয়তের প্রশ্ন নেই। কারণ সেখানে হৃদয়ের যোগ নেই কিছু। কিন্তু আমি ভালবাসি তাকে, আপনজন মনে করি। এখানে কোনো প্রতিকূলতা নেই বলেই মহাদেব দুর্বল। সে দুর্বলতায় আপনজনের সমর্থনের নিভরতা তার কাম্য বইকি।

কিন্তু বৃথাই এ মনোবিশ্লেষণের তুষ্টি। ইন্দুমতী-প্রসঙ্গের ধার কাছ দিয়েও গেল না মহাদেব। চুপচাপ খানিকক্ষণ জিপ চালিয়ে হঠাৎ বলল, আচ্ছা একটা মানুষ যে ভিতরে ভিতরে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ—দশগুণ হয়ে বাঁচতে পারে বিশ্বাস করো?

বেয়াড়া প্রশ্নের মাথা মুণ্ডু বোঝা গেল না। মহাদেব বলল আবার, এরা যদি সেটুকু বুঝত, তাহলে সত্যি হয়ত ভালবাসত আমাকে। সব কাজ ফেলে তোমার ওই সান্টু ঘোষও আমাব সঙ্গে হ্যাভলকে ছুটে আসত তাহলে। একজনের বাঁচার ছোঁয়া দশজনে পেলে নিজেব বাঁচার জোরটাই যে দশগুণ বড হয়ে ওঠে এ আমি ওদের বোঝাবো কি করে! আমি নিজেই কি জানতুম আগে।

এই ভাবপ্রবণতার প্রতি আপাতত আমার কোনো আকর্ষণ নেই। তাই চুপচাপ বসে রইলাম খানিক। নতুন দ্বীপে তার নতুন বসতি গড়ার স্বপ্নে ইন্দুমতীর মোহ একটা বড জায়গা জুড়ে আছে বলে আমারও বিশ্বাস। মহাদেব সেই মোহকে আড়াল করছে ভেবেই এতবড কথাও ঠুনকো লাগল। একটু আগে ভেবেছিলাম, সমর্থনের আশায় আমার চোখে ইন্দুমতীর মহিমাই বড করে তুলবে সে। সেটা বরং এর থেকে অনেক সহজভাবে নেওয়া যেত, তার বদলে আদর্শগত কথা শুনে ভিতরে ভিতরে একটু ক্ষুণ্ণও হলাম বোধহয়। হালকা করেই বললাম, চারগুণ দশগুণের খবর রাখিনে, সম্প্রতি তুমি দ্বিগুণ যে হয়েছ, সে খবরটা এখানে আসা মাত্র শুনেছি।

বিস্মিত নেত্রে মহাদেব ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে। ওর অজ্ঞাতেই বোধহয় জিপের গতি কমে গেল অনেকটা। স্বপ্নরাজ্য থেকে বাস্তবে পা ফেলে দাঁড়াল সে। হাসির আভাসে এবারে কাছের মানুষ মনে হল তাকে। সামনের দিকে চোখ ফিরিয়ে মুচকি হেসে বলল, ঠিকই শুনেছ, মানুষকে দ্বিগুণ করার গুণ

আছে ওই মেয়ের—কিন্তু সে আর সাণ্টু ঘোষ জানবে কি করে, সে তো ক্ষেপেই অস্থির!

এবারে সোজা-পথে আসছে বোধহয়। কিন্তু উচ্ছ্বাসের এ সুরও কেন জানি বরদাস্ত হল না কানে। খোঁচা দেবার ইচ্ছেটা এড়ানো গেল না। সাণ্টু ঘোষের চিঠিতে ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ডের ওডার পাখা ভাঙ্গার টিপ্পনী ভুলতে পারিনি। সাদাসিদে ভাবে বললাম, সাণ্টু ঘোষের কথা ছেড়ে দাও, সে রাগলে যেমন ক্ষেপে ওঠে, খুশি হলে তেমনি হাততালি দেয়।···কিন্তু তুমি যাকে পাচ্ছ ভেবে দ্বিগুণ হয়ে উঠলে, আর কেউ যে তাকেই আবার হারাচ্ছে ভেবে অর্ধেক হয়ে গেল, জানলে কি করে?

মহাদেব চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, আবার। মুখে মুহূর্তের বিমূঢ় ছায়া। তারপর হাসতে লাগল। ওর অন্যমনস্কতায় একটা পাঁচালো পাহাড়ী রাস্তার ধার ঘেঁষে চলেছে জিপ। অনেকক্ষণ ধরেই সেটা অস্বস্তিকর লাগছে। আর একহাত বাঁয়ে ঘেঁষলে একশ হাত নিচে গড়াতে হবে। সকৌতুক মন্তব্য করল, এতক্ষণে বোঝা গেল তুমি লেখক বটে।

—যদি বুঝে থাকো জিপটা রাস্তার মাঝখানে টানো। তার দিকে চেয়ে সত্যিই হাসি পেয়ে গেল। একটু বাদে বললাম, আর বোঝা গেল, তুমি জবাব এড়াতে চেষ্টা করলে।

ফেরার পথে গাড়িটা আগে ঘুরিয়ে নিল মহাদেব। তারপর নিস্পৃহ মুখে বলল, জবাবের কি আছে···তুমি হেওয়ার্ডের কথা বলছ নিশ্চয়?

হ্যাঁ না কিছুই বললাম না।

মহাদেব আবার জিজ্ঞাসা করল, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে নাকি?

বললাম প্লেনে হঠাৎ কাহিল হয়ে পড়তে আলাপ ছেড়ে বেশ শুশ্রূষাই হয়েছে বলতে পারো। তা বলে এসব কথা কিছু ওঠেনি—

অস্ফুট স্বরে হাসল মহাদেব।—সে আর কি করে উঠবে···তাছাড়া লোকটা ভারি ভালো আর ভদ্র যে।

নিখাদ প্রশংসা শুনেও মনটা কেন জানি ভরল না। কিন্তু এর পরে আর কথা বাড়াতে যাওয়াটা অশোভন হতে পারে ভেবে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে মহাদেব হঠাৎ আবার হাসল একটু। তার পর খুব মোলায়েম করে বলল, এখানকার হৃদয়ের ব্যাপারে যা কিছু চর্চা সব শোনা কথার ওপরে হয়ে থাকে। তুমিও অনেক কিছু শুনেছ বোধ হয়···থাকলে আরো শুনবে।

কথার শুরু থেকেই অস্বস্তি বোধ করছি। কিন্তু মহাদেব থামল না। বলে গেল, তাছাড়া যাকে নিয়ে এত কিছু রটনা এখানে, তাকে তো চোখেও দেখোনি এখন পর্যন্ত। অবশ্য দেখার মত যে কিছু তা বলছি না···দোষ ত্রুটি তো আছেই। কিন্তু এক তরফা শোনার দলে না ভিড়ে এখানকার ভালো মন্দ সব কিছু নিজেই একটু যাচাই টাচাই করে নাও না আগে—আছ যখন তাড়া কিসের, সবে তো এলে···।

শ্লেষের আভাসমাত্র নেই, তবু বিঁধল। সাণ্টু ঘোষের রাগের প্রসঙ্গ থেকে ইন্দুমতীর প্রসঙ্গ আসবে, আর তাই থেকে মহাদেবের দুর্বল দিকটা দেখব—সেইটুকুই প্রত্যাশিত ছিল। সেরকমটা হল না বলেই প্রচ্ছন্ন ক্ষোভে ওকে ঘাঁটাতে গিয়ে যা শুনতে হল সে জন্যে নিজেই দায়ী। মুখ বুজে হজম করা আর বোকার মত একটু হাসতে চেষ্টা করা ছাড়া আর করার নেই কিছু। আর পাঁচজনের চোখে মহাদেব যেমনই হোক, নিজের কাছে সে যে দুর্বল নয় সেটুকুই উপলব্ধি করতে হল চুপচাপ।

হ্যাভলক দ্বীপে যাওয়ার কথা ছিল পরদিন, কিন্তু যাওয়া হল না। নিজের কি কাজে আটকে গেল মহাদেব। লোক মারফৎ খবর পাঠালো কাল যাবে, বিকেলের দিকে আমি যেন তার বাংলোয় আসি।

অফিসের তাড়ায় দাড়ি কামাতে কামাতে সাণ্টু ঘোষ টিপ্পনী কাটল, কাজ কি কম নাকি! যত বড় মহাজন ততো তার ঝামেলা। সব দিক সামলে তবে তো বেরুবে!

তাকে আর একটু চড়িয়ে দিতে খারাপ লাগল না।—কিন্তু তোমার মতে তো সামলাবার মত আপাতত একটাই দিক ওর?

সাণ্টু ঘোষ হাসতে লাগল। কেন জানি মনে হল, যাওয়া স্থগিত হওয়ায় মনে মনে খুশি হয়েছে। কিন্তু এমনই একটা স্থূল রসিকতা করে বসল তারপর যে সভয়ে প্রসঙ্গ পরিহার করে অফিসের তাড়া দিতে হল তাকে। বলল, তুমিও যেমন···একা শ্রীরাধিকাকে সামলাতে হয়েছিল বলে কি আর সব গোপিনীদের ছেড়ে কথা কয়েছিল ঠাকুরটি!

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একা ঘরে ভালো লাগছিল না। ঠিক দেশের আবহাওয়া নয় এখানে যে ভরাঁপেটে একপ্রস্থ দিবা নিদ্রার আয়োজন ভালো লাগবে। কোনো কাজ না থাকলে বা বৃষ্টি না হলে পা আপনি বাইরের দিকে টানে এখানে।

মন্থর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গেস্ট হাউস ছাড়িয়ে আসতে সমুদ্র চোখে পড়ল। গেস্ট হাউস আঙ্গিনার পাশ দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা এবড়ো খেবড়ো পথ সোজা সমুদ্রের দিকে নেমে জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। পরে শুনেছি জঙ্গল নয়, এখানকার বোটানিকাল গার্ডেন ওটা। ছন্দোবদ্ধতা নেই তেমন, জঙ্গল বলেই মনে হয় দূর থেকে।

অনেকটা পথ নেমে এসেও একা একা ওখানে ঢুকতে মন সরল না। পশ্চিম দিকে মানুষ মারা জারোয়াদের অনেক ভয়াবহ গল্প শুনেছি সাণ্টু ঘোষের মুখে। জংলি বসতি যদিও বিচ্ছিন্ন দ্বীপে, কিন্তু দিকটা তো পশ্চিমই বটে। শনশন্ করে একটা বিষাক্ত তীর এসে বুকে বিঁধলে ঠেকাচ্ছে কে! পোর্টব্লেয়ারের লোকেরা শুনলে হেসে উঠবে! কিন্তু সমুদ্রলগ্ন এই উচ্ছৃঙ্খল সবুজের নিরিবিলি সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে এ ধরনের ভয়ের রোমাঞ্চটুকুও উপভোগ্য।

অন্যদিকে বেশ খানিকটা দূরের পাথুরে ফাঁকা জায়গায় প্রায় তিন তলা সমান উঁচু চারদিক খোলা কাঠের গোলমত একটা বসার জায়গা। ঘেরানো কাঠের থামের মাথায় টুপীর মত টালির ছাত। দূর থেকে দেখা যায়। সাণ্টু ঘোষ এর নাম দিয়েছে হাওয়া-ঘর। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত নাকি হাই-সোসাইটির এক জোড়া মেয়ে-পুরুষকে হাওয়া খেতে দেখা যাবেই ওখানে। প্ল্যান করে হাওয়া খেতে এসে অন্য জোড়াকে হাওয়া-ঘরের দখল নিয়ে বসে থাকতে দেখে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়—এমনও হামেশা ঘটে শুনেছি।

ছোট বড় পাথর ডিঙিয়ে কাছে এসে ওপরে উঠার লোভ সংবরণ করা গেল না। এই নির্জনে চুপচাপ বসে থাকার মতই জায়গা। কিন্তু বসার বেঞ্চ নেই, কাঠের মেঝেতেই বসতে হয়। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র পাহাড় জঙ্গল আকাশ—সবই দেখা যায়। সাণ্টু ঘোষের হাওয়া-ঘর নামটা সার্থক। হাওয়ায় হাওয়ায় একাকার। খানিকক্ষণ বসে থাকলে কানে তালা লেগে যায়। দূরে দূরে লাল টিনের ছাত দেওয়া দুই একটা কাঠের বাড়ি দেখা যাচ্ছে ঝোপ ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে।

এর বিপরীত দিকে, অর্থাৎ বোটানিকাল গার্ডেনের দিকে চোখ আটকে গেল হঠাৎ। নির্জনতা উপভোগে ছেদ পড়ল। ছোট ডালপালাগুলো নড়ছে বেশ জোরেই। কে বা কারা বেরিয়ে আসছে। উঠে এসে তাড়াতাড়ি রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। প্রথমেই হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল যাকে, জারোয়াও নয়, জানোয়ারও নয়—ডোরা টমাস। তার উচ্ছল হাসির শব্দ এ পর্যন্ত ভেসে এলো। হাসতে হাসতে দু'হাত কোমরে তুলে সে জঙ্গলের দিকেই ঘুরে দাঁড়াল

আবার।

ওর পরে বেরুলো টমাসের দ্বিতীয় কন্যা মার্থা। সেও হাসছে প্রচুর, তবে হাসিটা শোনা গেল না। বেদম হয়ে পড়েছে বোধ হয়। বাইরে এসেই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ার ভঙ্গিতে ডোরাকে জড়িয়ে ধরল সে।

ডাল পালা নড়ছে এখনো। এবারে কে আসছে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। কিন্তু হেওয়ার্ডের দিকে চেয়ে এরা ছোটাছুটি করছিল কেন বোঝা গেল না। মুখে পাইপ গুঁজে আর দু'হাত ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে হেওয়ার্ড নিশ্চয় এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আগে আসতে চায়নি। কম্‌পিটিশান সম্ভবত দুই বোনের মধ্যে। কিন্তু ডোরার সঙ্গে পারবে কেন মার্থা। হেওয়ার্ডের সেই শ্লথ স্তিমিত গতি, সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটছে।

হাওয়া-ঘরের এই মূর্তির দিকে তারই চোখ পড়ল প্রথম। ধুতি পাঞ্জাবী দেখেই বোধ হয় দূর থেকেও চিনতে বেগ পেতে হল না। চিনেছে যে হাত তুলে জানান দিল সেটা। হাত তুললাম আমিও।

দুই বোন ফিরে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে। তারপর তারাও হাত তুলে হৃদ্যতা জ্ঞাপন করল। অতটা আশা করিনি, কিন্তু পরিবেশ বিশেষে সবই ভালো লাগে! হাত নাচিয়ে শশব্যস্ত তাদের উদ্দেশেও জবাব পাঠালাম এদিক থেকে।

ডোরা ছোটাছুটি শুরু করল আবার! কিন্তু মার্থা বোধ হয় আর পাল্লা দিতে রাজি নয় তার সঙ্গে। হাত উঁচিয়ে সে আমাকে দেখালো কি হাওয়া-ঘর দেখালো সে-ই জানে। তারপর পায়ে পায়ে আসতে লাগল এদিকে।

সশঙ্কে প্রতীক্ষা করছি! সান্টু ঘোষ জানলে বা শুনলে আবার কি মন্তব্য করবে কে জানে! কাছে এসে মার্থা ঘাড় উঁচিয়ে সৌজন্যসূচক অনুমতি চাইলে, আসতে পারি?

অভিব্যক্তির দ্বারা যতটুকু সম্ভব আনন্দ জ্ঞাপন করলাম। ওপরে উঠে এসে মার্থা ধপ করে মেঝেয় বসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে তখনো। পরিচিতের মতই নিঃসংকোচে বলল, ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠিনে—সি ইজ্‌ প্রিটি ওয়াইলড!

উচ্ছল বাতাসে ঝাঁকড়া লাল চুল ওর মুখে এসে পড়ল। চুল সরিয়ে আর স্কার্ট হাঁটুর ওপর ভালো করে টেনে দিয়ে হাসি মুখে তাকালো।—ওদের বললাম, তোমরা ঝাঁপাঝাঁপি করো, আমি ততক্ষণ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে আসিগে। থেমে আবার নিরীক্ষণ করল।—তুমি কবি নাকি? আর ইউ এ পোয়েট?

দাঁড়িয়ে কথা বলা অশোভন। একটু এগিয়ে এসে বসলাম। এই মেয়েদের

ধরন-ধারণ জানা নেই খুব। তবু শুনেছিলাম তোয়াজের ভক্ত এরা।···কারাই বা নয়! পরিবেশ মাহাত্ম্যেই বোধ করি আর সঙ্কোচও নেই তেমন। হালকা সুরে জবাব দিলাম, কবি নই, তবে এখন হতে ইচ্ছে যাচ্ছে বটে।

খুশি হল। কটা-চোখ মুখের ওপর ফেলে হেসে উঠল।—একা দাঁড়িয়ে ছিলে তাই জিজ্ঞাসা করলাম। দূরের নারীপুরুষের দিকে তার দু'চোখ ঘুরে এলো এক চক্কর। হেওয়ার্ড একটা বড় পাথরে পিছন ফিরে বসে পাইপ টানছে। অদূরে ডোরা চপল পায়ে ঘুরে ঘুরে মাটি থেকে কুড়োচ্ছে কি।

—চমৎকার দিন, না?

আলাপের সূত্র বোধ হয়। কিন্তু আমার চমৎকারই লাগছিল। প্রথম দিন বীচ-এ পদার্পণ করেই যেমন দেখেছিলাম একে, এখন সামনা সামনি বসে তেমনটি দেখছি না বটে। দূরের ওই স্বাস্থ্যভরপূর চঞ্চল মেয়েটির তুলনায় এ খুব চোখে পড়ার মত নয়। মুখে এবং দুই বাহুতে অজস্র তামাটে তিলের মত দাগ! তবু খাবাপ লাগছে না। নিষ্প্রভ মুখে সরল কমনীয়তাটুকু আমার চোখে অন্তত ভালই লেগেছে।

—হ্যাঁ চমৎকার।

নাম জেনে নিল। নিজের নামটাও বলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, এখানে থাকতে এসেছ?

—না বেড়াতে।·· এই প্লেনেই ফিরে যাব আবার।

উৎসুক নেত্রে তাকালো মার্থা, প্লেন জার্নি লাভলি···না?

বিব্রত মুখে ঘাড় নাড়লাম। লাভ্লি বটে।

অসংকোচে মনের খেদ ব্যক্ত করে ফেলল মার্থা।—তোমাদের দেশে আমার যেতে ইচ্ছে করে খুব। ক্যালকাটা চমৎকার জায়গা শুনেছি। কিন্তু কোথাও যাওয়া হয় না, আজন্ম এখানেই পড়ে আছি। বলতে বলতে হেসে উঠল।

সহজতা চিত্তাকর্ষক। হাসিটুকুর মধ্যেও যেন অসহায় সরলতার স্পর্শ। জবাব দিলাম, কলকাতা বলো আর আন্দামান বলো সবই তো আমাদের দেশ··· আর তোমাদেরও। কলকাতা চমৎকার জায়গা কি না আমরা সব সময় ঠিক বুঝি নে, তবু যেতে ইচ্ছে করে যখন, হেওয়ার্ডের সঙ্গে একবার গিয়ে ঘুরে এলেই তো পারো?

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে যেন বুঝতে চেষ্টা করল প্রথম। তার পর ঘাড় দুলিয়ে বলল, নাঃ আমার যাওয়া হবে না···ডোরা ইচ্ছে করলে যেতে পারে, আগেরবার ক্যাপ্টেন ওকে বলেছিল, কিন্তু ও অদ্ভুত মেয়ে, এমন সুযোগ পেয়েও

গেল না—বাবা তো ওই জন্যে রাগ করে সেবার…

থমকে গেল। খেয়াল হল বোধ হয় সদ্যপরিচিতের কাছে এতটা বলা শোভন নয়। হেসে অন্য কথায় চলে গেল।—আসলে ওর আবার এ জায়গা ছেড়ে আর কোথাও ভালো লাগে না, দৌড় ঝাঁপ করতে না পেলে ও দুদিনে শুকিয়ে যাবে।

সস্নেহে বলল কথা ক'টা। যেন ও-ই বড, ডোরা ছোট। আবার সেই দূরের দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করতে গিয়ে দুই চোখ ওর থেমে গেল। একই পাথরের ওপর হেওয়ার্ডের পাশ ঘেঁষে ডোরাও এসে বসেছে।

মার্থার দিকে চেয়ে ক্ষণিকের নিস্পন্দ ভাব দেখলাম যেন একটু। আমার চোখেরও ভুল হতে পারে। কারণ, এক মুখ হেসে উঠে দাঁড়াল মার্থা, সানন্দে বলে ফেলল, বাবাকে বলতে হবে—এবারে বললে ডোরা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কলকাতা যেতে রাজী হবে বোধহয়।

অপ্রস্তুত পরক্ষণে। হেসে সামলে নিতে চেষ্টা করল আগের মতই। এই হাসিটুকুর তাৎপর্য অন্য রকম। অর্থাৎ, কি সব বকছি কিছু মনে কোরো না। হাত বাড়িয়ে হাত মেলালো, আমি যাই এখন, অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম তোমাকে—

বললাম, এরকম বিরক্তি লোভনীয়।

মুখের দিকে চেয়ে হাসল আবারও। স্বচ্ছ হাসি।—আচ্ছা, আবার দেখা হবে, গুড্ বাই!

নেমে গেল। আমি রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়ালাম। একটু হেঁটে একটু দৌড়ে লঘু পায়ে ওই পাথরের দিকে এগিয়ে চলল মার্থা। কেন জানি মনে হল, এই সপ্রতিভ চপলতা মার্থাকে মানায় না খুব। হাওয়া-ঘরে আসার সময় ওর শ্লথ চরণভঙ্গির সঙ্গে ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ডের ঝুঁকে চলা শিথিল চলনভঙ্গির বরং মিল আছে একটু। যা ক্যাপ্টেনকেই মানায়, আর মার্থাকেও মানায়।

পাথরের কাছে পৌঁছে পিছন থেকে সম্ভবত হালকা কিছু বলল মার্থা। কারণ হাসি মুখে দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়েছে তারা। তারপরেই লুটোপুটি কাণ্ড প্রায়। পাথরের ধারের দিকে একটু সরে গিয়ে মার্থার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে দু'জনের মাঝখানে টেনে আনল ডোরা। দু'জনেরই কোলের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল মার্থা। ডোরার কলহাসি শোনা গেল এখান থেকেও।

উচ্ছলতা নয়নাভিরাম।

কিন্তু হাওয়া-ঘর ছেড়ে ফিরে আসতে আসতে অন্য কথা ভাবছিলাম।

ভাবছিলাম, এ আনন্দের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের যোগ কতটুকু ? সাণ্টু ঘোষ দেখলে হয়ত চোখা চোখা মন্তব্য করে ফেলত কিছু। বলত, শোকের বিলাস জানে না ওরা, যেটুকু পায় হাত বাড়িয়ে নিতে জানে।

হেওয়ার্ড হাত গুটিয়ে বসে আছে কিনা জানি না। কিন্তু দু'টি যুবতী রমণীর বিস্মৃতিঘন সান্নিধ্যেও আত্মবিস্মৃত মনে হয়নি তাকে।...হয়ত এটাই তার আকর্ষণী-বৈশিষ্ট্য। আমার ভাবনা হেওয়ার্ডকে কেন্দ্র করে হলেও তার বিস্তার ওই মেয়ে দু'টিকে নিয়ে। একজনকে দেখেছি, আর একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সাণ্টু ঘোষের ধারণা, পয়সাওয়ালা খদ্দেরের হাতে হাতে বিকনো ছাড়া জীবনের আর কোনো তাৎপর্য নেই ওদের। শুধু সাণ্টু ঘোষ কেন, অনেকেই তাই ভাবে বোধ হয়। সাণ্টু ঘোষ এখানে সমষ্টিরই একজন।

কিন্তু সামান্য আলাপের ফাঁক দিয়ে ওই একটি মেয়ের মধ্যে পণ্যদ্রব্য নয়, মন বলে বস্তুটির সন্ধান পেলাম যেন। সে-মনের সবটাই এখনো চেনা-জানার বাইরে বটে, কিন্তু আশা-নিরাশার স্পর্শ-চেতন শাশ্বত কোনো নারীর মন যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একজনকে দেখে আর একজনকে বোঝা শক্ত। মার্থার ঠিক বিপরীত হতে পারে ডোরা। হওয়া বিচিত্র নয় অন্তত। পণ্য-সৌন্দর্যের মূলধন বলতে গেলে তারই। তবু মার্থা তার নারীর মনটি দেখিয়ে ডোরার সম্বন্ধেও একটু সচেতন করে দিয়ে গেল যেন। পিচ্ছিল পণ্যের দিকটা ভাবতে ইচ্ছে করল না আর। মনে হল, ওতে নিজেদের মানসিক সম্ভোগের তৃপ্তি আর প্রশ্রয়ও কম নয়।...আহ্বান সত্ত্বেও ডোরা হেওয়ার্ডের প্লেনে উড়তে রাজী হয়নি। শুনলে সাণ্টু ঘোষ বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস কেউই করবে না।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছি। মার্থার মুখ থেকে শুনলে সকলেই বিশ্বাস করত। ক্যাপ্টেনের আহ্বান যে ফেলনা নয়, মার্থার সরল বিস্ময়ে ভারি স্পষ্ট সেটুকুও। আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার কারণস্বরূপ ডোরার যে দুরন্তপনার কৈফিয়ৎ দিল মার্থা, সেটা সত্যি হলে বিনা আহ্বানেই ডোরার বরং প্লেনে গিয়ে ওঠার কথা। প্রথম দিনই সাণ্টু ঘোষ বলেছিল, যার টাকা আছে আর ফুর্তি করার সখ আছে সেই ইচ্ছে করলে টানতে পারে ওই মেয়েটাকে। নিছক সত্যি হলে হেওয়ার্ডের আহ্বান হয়ত নাকচ করে দিত না ডোরা। আর নিছক সত্যি হলে এবারে ডোরা কলকাতা যেতে রাজী হতে পারে ভেবে মার্থা খুশিতে অমন লাফিয়ে উঠত না হয়ত... ।

কিন্তু যাদের আনুকূল্যে এই অন্তর-চারণ বিকেলের দিকে আবার এক অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে তারাই যেন বেশ বড় রকমের হোঁচট খাওয়ালে একটা।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও সান্টু ঘোষ অফিস থেকে ফিরল না দেখে চিরকুট লিখে রেখে মহাদেবের বাংলোর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সেখানেও যে আবার রমণী-রীতির আর এক দিক দেখব ভাবিনি। আর এক দিক, অর্থাৎ, দুপুরের ভাবনা-ধারার বিপরীত দিক।

বাংলোর বেতের ফটকের সামনেই পা থেমে গেল।

মহাদেব বারান্দায় আর্ম-চেয়ারে শয়ান। তার চেয়ারের হাতলে আর পিঠে কাত হয়ে প্রায় অর্ধশয়ান ডোরা টমাস। নিটোল হাতের সবকটা আঙুল দিয়ে মহাদেবের চুলের মুঠি সাপটে ধরে বেশ জোরেই ঝাঁকাচ্ছে আর চপল বিরক্তিতে বলছে, ও-সব আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না, তুমি দেবে কি দেবে না সাফ কথা বলো!

অদূরের একটা সোফায় বসে মার্থা হাসছে মুখ টিপে। মহাদেবও হাসছে দিব্বি।

সকলের অগোচরে সরে পড়াই হয়ত উচিত ছিল। অন্তত চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তার বদলে বোধ হয় সঙের মতই দাঁড়িয়ে ছিলাম। মার্থাই দেখল প্রথম। তারপর যেন সচেতন করার সুরেই ডেকে উঠল, ডো-রা!

চুলের ঝুঁটি ঝাঁকানো থামিয়ে মুখ তুলল ডোরা। মহাদেব উৎফুল্ল মুখে ডাকল, এসো এসো—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, তোমার জন্যেই তো অপেক্ষা করছি!

চুল ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে আর্ম-চেয়ারের হাতলের ওপরেই ভব্য হয়ে বসল ডোরা। অপ্রতিভ মুখে মার্থার পাশ থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বাংলায় বললাম, তোমাদের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটালাম বোধ হয়…।

মহাদেব জবাব দিল, বাঁচালে—! ডোরার দিকে তাকালো সে, এঁরই কথা বলছিলাম, এবারে জিজ্ঞাসা করে দেখো… ও আলাপ নেই বুঝি?

ডোরা সৌজন্যসূচক মাথা নুইয়ে প্রায় নিস্পৃহ মুখেই মহাদেবের উদ্দেশে বলল, আলাপ তেমন না থাকলেও জানি ওঁকে…মার্থার সঙ্গে আজ ভালো করে আলাপ হয়েছে ওঁর, মার্থা বলেছে উনি খুব ভালো লোক।

গো-বেচারী গোছের কাউকে অনুকম্পায় ভালো লোক বললে যেমন শোনায় তেমনি লাগল। মার্থা চেয়ারে বসে দুলছে আর হাসছে মৃদু মৃদু। মহাদেব ওদের শুনিয়ে পূর্বোক্ত কোনো প্রসঙ্গের সমর্থন চাইল যেন, কেমন হে, কাল ভোরে আমাদের হাভলকে যাবার কথা আছে কি না?

বিব্রত হাসির আড়ালে জবাব এড়াতে চেষ্টা করলাম। খুব সহজ হয়ে উঠতে

পারছি না। ডোরাব এখনো আর্ম-চেয়াবের হাতলে বসে থাকাটা চোখে লাগছে। ওর প্রাচুর্যে পণ্যের ওজনের দিকটাই ভারী হয়ে দেহ-তটে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। হালকা তর্জনের স্বরে ও-ই বলে উঠল, কথা আছে তো কি হয়েছে, দু'দিন বাদে গেলে ওঁব আব কি—আসলে তুমিই তোমার সেই ডার্লিংকে ছেড়ে থাকতে পাবছ না আব।

মহাদেব হেসে উঠল, সেই নিরুপায় চেষ্টা আমিও করলাম। মার্থা অস্ফুট কণ্ঠে আবাবও ডোরাকে সচেতন কবতে চেষ্টা করল বোধ হয়, ইউ ডোরা…! হাস্য বিডম্বিত মুখে আমার দিকে দৃষ্টি ফেবালো মার্থা। তাব দুই চোখে হাওয়া-ঘবে দেখা সেই ধবনেব সরল অনুনয়। যেন বলতে চায, কিছু মনে কোরো না, ও অমনি· ।

কিন্তু কাবো কোনো ভাবাভাবিব ধাব ধাবে না ডোরা। আঁটসাঁট হয়ে ঘুরে বসে আমাকেই চডাও কবে বসল, কি বলো মিস্টাব, দু'দিন বাদে হ্যাভলকে গেলে তুমি রাগ করবে খুব?

উত্তবের আশায মহাদেবের দিকে তাকালাম। কিন্তু সে যেন মজা দেখছে। তাই ওকেই এবারে একটু মজা দেখানো যুক্তিযুক্ত মনে হল। সবিনয়ে বললাম, আমি রাগ কবব কেন, আমার শুধু দেখার তাডা, দু'দিন দেরি হলেও ক্ষতি নেই—আমার জন্যে অন্তত কোনো ডার্লিং বসে নেই সেখানে।

মহাদেব চোখ পাকিয়ে লাফিয়ে উঠল প্রায়, চ উ ·!

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে এলো ডোরা টমাস। আমার হাত টেনে ঝাঁকিয়ে দিল বার দুই তিন।—ইউ আর রিয়েলি গুড! চেয়ারের হাতলেই গিয়ে বসল আবার। দৃপ্তভঙ্গীতে মহাদেবের চোখে চোখ রেখে ক্ষুদ্র চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল, নাও হোয়াট…?

মার্থার দিকে চেয়ে দেখি সেও হাসছে বটে, কিন্তু ডোরার মত সকল-প্রত্যাশার আনন্দোচ্ছলতা কিছু দেখলাম না। হাল-ছাড়া একটা বড নিঃশ্বাস ফেলল মহাদেব, শেষকালে তুমি এই কাণ্ড করলে?

·কি করলাম কিছুই তো জানিনে এখনো, কি ব্যাপার?

না জানলেও অনুমানে ভুল হয়নি। আগামী কাল মহাদেবের স্টীম বোট ডোরাব জিম্মায় ছেডে দিতে হবে। হেওয়ার্ডকে নিয়ে তারা নিকোবর যাবে। যেতে একদিন, আসতে একদিন, আর হাতে একদিন—মোট তিন দিনের জন্য হ্যাভলক যাওয়া স্থগিত রাখতে হচ্ছে মহাদেবকে। মহাদেব তাতে রাজী নয়, সে বলছে, আগামীকালই সে হ্যাভলক থেকে ফিরে এসে পরশু বোট ছেড়ে দিতে

পারে। কিন্তু পরশুই নাকি নিকোবরীদের কি উৎসব একটা, তাই দেখতেই যাওয়া। অতএব পরশু হলে ডোরার চলে না। মহাদেব বলছে, আগামী কাল নিকোবরের জাহাজ ছাড়বে এখান থেকে, জাহাজে যেতে। ডোরার মতে তাহলে আবার যাওয়া আসার সব থ্রীল মাটি, ওরকম সাদামাটা ভাবে হেওয়ার্ডও যেতে রাজী হবে না। তাছাডা যেদিন যাবে সেদিনই ফিরে আসবে মহাদেব—ডোরা বোধ হয় সেটা আদৌ বিশ্বাস করে না। আমার অজুহাতে অব্যাহতি পেতে চেষ্টা করছিল মহাদেব, যাব যাব করে আবার তিন দিন দেরি করলে আমি নাকি রেগে যাব! কিন্তু আমার আবির্ভাবে এবং মন্তব্যে সে চেষ্টার মূলে ঘা পড়ল।

দুই ভুরু কুঁচকে মহাদেব ডোরাকে নিরীক্ষণ করল একটু। যেন যাচাই করে দেখে নিচ্ছে কিছু। তারপর বলল, বোট যদি ছেড়ে দিই হেওয়ার্ডকে ঠিক ঘায়েল করতে পারবে এবার?

মার্থা বিস্ময়াপ্লুত একটা শব্দ বার করল গলা দিয়ে। আমি দু'চোখ বাগানের দিকে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু ডোরা প্রায় নির্বিকার। মুখ মচকে নিরীহ কণ্ঠে বলল, আমি কেন ঘায়েল করতে যাব···মার্থার জন্যেই যাওয়া··· মার্থাকে জিজ্ঞাসা কর পারবে কি না।

মার্থা ফোঁস করে উঠল ইউ নটি গার্ল, আমি তো যাবই না ঠিক করেছি।

ডোরা নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে, পরে তেমনি শান্তশিষ্ট মেয়েটির মতই বলল আবার, না গিয়ে কি করবে, মহাদেবকে কম্প্যানি দেবে? ওর জন্যে ভাবতে হবে না, ওর হাতে এখনো মা-শাইন আছে। সহজাত চপলতায় হেসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মহাদেবের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, চলো এক্ষুনি, মিছিমিছি এতক্ষণ সময় নষ্ট—হারি আপ ম্যান! হেওয়ার্ডকে খবর দিতে হবে, বোটের তদারক করতে হবে, অনেক কাজ—।

কাজ সুরাহা করে দেবার জন্যেও মহাদেবের জিপ ভরসা। সামনে মহাদেবের পাশের আসনে আমি। ওরা দু'জন পিছনে বসেছে। আমাকে আগে ডেরায় নামিয়ে দিয়ে মহাদেব ওদের নিয়ে যাবে যেখানে যাবার।···সারাক্ষণই নিজেকে কেমন বেমানান লাগছিল এদের মধ্যে। অনভ্যস্ত চোখ-কান অতটা খোলাখুলি প্রগলভতায় রপ্ত নয়। থেকে থেকে মহাদেবকেও ভিন্ন মানুষ মনে হয়েছে। আমার ধারণা, মাঝখানে গিয়ে না পড়লেও মহাদেব ওদের বোট ছেড়ে না দিয়ে পারত না। দিত ঠিকই। আমার উপস্থিতিতে ওর চক্ষুলজ্জার দায়টা গেছে শুধু।

আর একটা কথাও মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। মহাদেব ঝানু পলিটিসিয়ান শুনেছিলাম। প্রেমের ব্যাপারে পলিটিসিয়ানরা কি করে জানা নেই। কিন্তু চাণক্য-নীতি গোটাগুটি পরিহার করে চলে বলে বিশ্বাস হয় না। মহাদেব ডোরাকে ঠাট্টা করেছিল, বোট ছেড়ে দিলে হেওয়ার্ডকে এ যাত্রায় বশীভূত করতে পারবে কি না। উক্তি মহাদেবের বলেই স্থূল ঠাট্টার সবটাই স্থূল কিনা সংশয়। হ্যাভলকের মায়া কাটিয়ে তিন দিনের জন্য বোট ছেড়ে দেওয়ার হেতু হয়ত ডোরার না-ছোড় জুলুমই নয় শুধু। আসল হেতু সম্ভবত, এদের সঙ্গী হবে যে মানুষটি সে হেওয়ার্ড। কারো প্রতি অবিচার করার নৈতিক দুর্বলতা যদি থাকেই মহাদেবের সে এই লোকটি। যাকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। অতএব বোট ছেড়ে দিয়ে এই মেয়ে-দুটোর সঙ্গে হেওয়ার্ডকে খানিকটা হালকা রোমান্সের মধ্যে ভিড়িয়ে দিতে পারলে নিজেও অনেকটা হালকা হতে পারে বই কি।

কিন্তু এসব মনোগড় বিশ্লেষণ আপাতত মুলতুবী রাখাই ভালো। দুপুরে ওই মেয়েদুটোর সম্বন্ধে মনোবিচরণের লাগাম ছেড়ে দিয়ে প্রায় খানায় পড়তে হয়েছে এই বিকেলের মধ্যেই। সোজা বাস্তব পাড়ি দিয়ে চলেছে সকলেই, কেউই হয়ত অত সব ভাবনা-চিন্তার ধার ধারে না।

*

* *

হ্যাভলক পরিদর্শন এবারেও বানচাল হওয়ার কারণটা বিশদ করে বলা গেল না সাণ্টু ঘোষকে। শোনামাত্র ফুটন্ত তেলে ফোড়ন ছাড়ার মত ফটফটিয়ে উঠবে জানা কথা। শুধু বললাম, দিন তিনেকের মধ্যে বেরুনো হবে বলে মনে হয় না··· ।

বেরুতে একেবারে না পারলেও বিরূপ হত না সাণ্টু ঘোষ। তাই এ নিয়ে আর জেরা করল না তেমন। রসের জোয়ারে মুগুর ছুঁড়লে, বিরহিনীর বিরহ-তাপটা বাড়িয়ে নিচ্ছে বোধ হয়··· ।

মনে মনে ভাবলাম, জন্ম লগ্নে জিভের ডগায় কি মধুই না জানি দেওয়া হয়েছিল ওকে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ বাড়তে না দিয়ে হাওয়া-ঘরে মার্থার সঙ্গে আলাপের খবরটা দিলাম ওকে। কারণ, আর কারো কাছ থেকে জানতে পেলে এই না বলাটা ওর রসনায় কোন চটুল রসে টগবগিয়ে উঠবে ঠিক কি!

সব শুনে একটা সুচিন্তিত নির্দেশ দিল যেন।—ওই শুকনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে আর কি হবে, ভাব যদি জমাতে হয় অন্য মেয়েটার সঙ্গে জমাও,

আনন্দ পাবে। তবে তোমাকে খুব আমল দেবে বলে মনে হয় না। তুমি খদ্দের কাঁচা··· ।

পরদিন অফিস-ফেরত জামা কাপড় বদলানোরও তর সইল না তার। দরাজ গলায় হাঁক দিল, কি হে, হ্যাভলক যাওয়া বন্ধ হল কেন? ইন্দুমতী দর্শনের জন্যে তুমি হাসফাঁস করলে কি হবে, দুলালের বোট যে এতক্ষণে নিকোবরের জলে সাঁতরাচ্ছে! নৌকাবিলাসের লোভে ও নিজেও সেই সঙ্গে কেটে পড়েছে কি না খবর নিয়ে দেখগে যাও— ।

হেসে বললাম, ভালই অফিস করে এলে দেখছি, কিন্তু ও আর কাটতে যাবে কেন, নৌকা-বিলাসের পর্ব তো সে ছাড়িয়ে উঠেছে শুনতে পাই।

—বাড়তি লাভ, বুঝলে? সবাই এখানে বাড়তি লাভের সমঝদার।

কিন্তু ওকে নিরাশ করে পরদিন সকালেই সশরীরে এই ঘরে হাজিরা দিয়েছে মহাদেব। এবং তার পরদিন বিকেলেও। অবশ্য শেষের দিন ঘরে ছিল না সান্টু ঘোষ।

স্কুটার হাঁকিয়ে এসেছিল মহাদেব। এসেই তাড়া দিল, চলো বেরুনো যাক— ।

ঘরের পাকা বাসিন্দাটি অফিস থেকে ফেরেনি তখনো। দ্বিধার কারণ অনুমান করেই মহাদেব তাগিদ দিল, একে ঘরকুনো মানুষ তায় পা খোঁড়া, তার আশা ছেড়ে দাও। তুমি তো আর ঘরে বসে থাকার জন্যে সমুদ্র টপকে আসনি, চলে এসো—

এ ধরনের ডাক শুনলে অনেক সাধারণ সঙ্কোচই সহজে কাটিয়ে ওঠা যায়। তাছাড়া ঘরে বসে থাকতে ভালই বা লাগবে কেন।

মহাদেব বলল, ভালো কথা, কাল ভোরে হ্যাভলক যাচ্ছি কিন্তু।

শুনলে সান্টু ঘোষ কি জবাব দিত সেই জানে। ওর সঙ্গদোষেই বোধহয় পরিহাসের লোভ ছাড়তে পারলুম না আমিও। বললাম, আমি তো আর কালের দিকে চেয়ে বসে নেই, যাবে যাবে— ।

রসগ্রহণে অপটু নয়। হেসে নিজের ওপরেই যেন বিরক্তি জ্ঞাপন করল, সত্যি বিদিকিচ্ছিরি দের হয়ে গেল!

স্কুটারে চেপে কিন্তু মনে হল কাজটা খুব ভালো হল না। কারণ, এরকম গতির মধ্যে শুধু জড়সড় হয়ে বসে থাকা—নড়তে ভয়, একটু এদিক-ওদিক হলে কোথায় কোন্ খাদে গিয়ে পড়ব, ঠিক নেই। উতরাইয়ের পথে সামনের অর্ধচন্দ্রাকৃতি রাস্তাটা পার হতেই সামাল দিতে চেষ্টা করলাম, আর একটু আস্তে

চালাও, এ জীবটিতে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই··· ।

এই প্রথম নয়, বেপরোয়া ড্রাইভিংয়ের মুখে আগেও বার কতক ওকে সচেতন করতে হয়েছে। লঘু আবেগ-প্রসূত নয় এ বেগ। তাই বিরক্তির বদলে শঙ্কা জাগে। ঈষৎ হেসে ঘাড় ফিরিয়ে একবার আমার দিকে তাকাতে চেষ্টা করল মহাদেব। আগের মতই এ দৃষ্টিতে সাহসের দম্ভ নেই, বরং অপ্রস্তুত হওয়ার ভাব আছে।

কিন্তু গতি মন্থর করানোর ফলটা মোটামুটি ভালো হল কি না বলতে পারিনে। এতক্ষণ দু' পাশের লোক সচকিত হয়ে সরে যাচ্ছিল। সে রকম গতিতে চললে সামনের অ্যাবার্ডিন বাজার পেরুতে তিন মিনিট লাগত কি না সন্দেহ। স্পীড কমানোর ফলে যে জায়গাটা এক নিমেষে পিছনে ফেলে যাওয়া যেত, ঠিক সেই জায়গাটিতেই স্কুটারটি এখন একেবারে থামাতে হল।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মা-শাইন।

দূর থেকেই আমাদের আসতে দেখেছে। দেখে ধীরে সুস্থে সিঁড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে।

মহাদেবের মুখ দেখার উপায় নেই, মনের খবর আঁচ করা গেল না। তবু প্রিয়-দর্শিনীর আবির্ভাব ঠিক প্রিয়া দর্শনের মত লাগল না বলেই অনুমান। রাস্তায় পা ঠেকিয়ে মহাদেব জিজ্ঞাসা করল, কি খবর ?

দুই এক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে মা-শাইন নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল, এমনি দাঁড়িয়ে আছি—। যেন কাউকে দেখে দাঁড়ায়নি, এমনি দাঁড়িয়েছে এসে। পিছনের ব্যক্তিটিকে অর্থাৎ আমাকেও দেখল এক পলক। দৃষ্টি ফেরালো তারপর।— কোথায় চলেছ ?

স্বভাব-বিরুদ্ধ নরম স্বরে মহাদেব বলল, কোথাও না, এমনি ঘুরতে বেরিয়েছি। পা দুটো স্কুটারের কাছে টেনে নিল একটু। গমন ইচ্ছার পূর্বাভাষ।

কিন্তু মুখে যে ভাবই প্রকাশ করুক, এত সহজে যেতে দেবার জন্য দোকানের সিঁড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়ায়নি মা-শাইন। সামনা সামনি পথ আগলে দাড়ানোর সঙ্গে এ দাঁড়ানোর তফাৎ নেই খুব। চেয়ে চেয়ে আর একটু দেখল মহাদেবকে। নিরাসক্ত নারীমুখের চকচকে চোখ দু'টিতেও শুধু যেন বিদ্রূপের আভাস একটু। মোলায়েম স্বরে বলল, ক'দিন ধরেই তো ঘুরছ। বন্ধু মেন-ল্যাণ্ড থেকে এসেছে শুনেছ, ভিতরে নিয়ে এসো, আলাপ করি।

ভিতরে ভিতরে ঘাম হতে লাগল। প্রথম দিনে এর মধুর ভাষণ এরই মধ্যে ভোলবার নয়।

আহ্বান জানিয়েই আমন্ত্রণকারিণী পিছন ফিরে সিঁড়িতে পা দিল। যেন এর আর অন্যথা হবার নয়।

মহাদেব নামার উদ্যোগ করতে আমিই আগে নেমে দাঁড়ালাম। তারপর দৃষ্টি বিনিময়। সামান্য হেসে মহাদেব যেন অভয়ই দিল আমাকে। ইশারায় বলল অনুসরণ করতে। ওর মুখে ভয় বা বিরক্তির চিহ্ন না দেখেও আশ্বস্ত হওয়া গেল না খুব।

চরণে চরণে দ্বৈত-প্রবেশ।

এখানকার বাসিন্দাদের কাছে বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী কলকাতা সবই মেন-ল্যাণ্ড। মা-শাইন বসার জন্য চেয়ার এগিয়ে দিল দুটো। একবার মনে হল, সেদিন পরদার আড়ালে তার স্বরূপের আভাস খানিকটা কানে শুনে ফেলেছি বলেই বোধ হয় এই আপ্যায়ন। কিন্তু না…। তার পরেই যেমন ধীর শান্ত দেখেছিলাম সেদিন, এখনও তেমনি।

পা-মেসিনে এক হাতে ঘাড় গুঁজে সেলাই করছিল থ-মিন। আমাদের দেখে, বিশেষ করে মহাদেবকে দেখে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালো।

সামনা-সামনি একটা টুল টেনে বসল মা-শাইন। নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করল। তারপর, কেন এসেছি ক'দিন থাকব, ইত্যাদি। উঠে দুটো কলাইকরা গেলাস হাতে বেরিয়ে গেল, এবং ফিরে এলো দু'মিনিটের মধ্যেই। দু'গেলাস চা দু'জনের হাতে দিয়ে আবার টুলে বসল।

শান্ত জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল আবার। চাকরি করি না ব্যবসা করি, কলকাতা জায়গাটা কেমন, আমাদের বাঙালী বলে কেন, কলকাতা বাংলা দেশের মধ্যে না বাংলা দেশ কলকাতার মধ্যে—

সহজ ভাবেই আলাপ করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু সহজ হতে পারছি না খুব। চেহারা-পত্রে একে রীতিমত সুশ্রী বলতে আপত্তি নেই। কিন্তু সমস্ত কমনীয়তায় যেন একটা পুরুষ শক্তির অটলতা মেশানো। এই শান্ত নম্রতাও প্রায় অস্বস্তির কারণ। ঘরে ডেকে আনার পর মহাদেবের সঙ্গে আর একটি কথাও বলল না মা-শাইন। কর্মরত মা যেমন শাস্তিভারে-অবনত দুষ্টু ছেলের দিকে তাকায়, তেমনি আড়ে আড়ে এক-একবার শুধু দেখছিল ওকে।

ভব্যতার দায়ে এখানে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে একবাক্যে এখানকার সব কিছুর ঢালা প্রশংসা করে গেল মা-শাইন। কোনদিকে কোনো অসুবিধে নেই, সরকারী বিধি-ব্যবস্থা সব চমৎকার, দিনকে দিন আরো উন্নতি হচ্ছে—বাজে লোকেরা ছল-ছুতোয় গোল পাকাতে চেষ্টা করে মাঝে মাঝে, নইলে

এই সরকারী রাজত্বে চমৎকার আছে সকলে।

বাজে লোকের কথা বলতে গিয়ে মা-শাইনের দু'চোখ আবার নিবদ্ধ হল মহাদেবের মুখের ওপর। মহাদেব নির্বিকার।

খুব বিনীত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে উঠে দাঁড়ালাম।

এদিকে এলে আবার আসতে অনুরোধ করল মা-শাইন।

বেরিয়ে আসার আগে মহাদেব মুখ খুলল। থ-মিনকে বলল, বাবুকে তোমার শেল-ফিশিং দেখাবে না একদিন ?

সেলাই থামিয়ে থ-মিন বিনীত জবাব দিল, এত ঢেউয়ে কিছু উঠবে কিনা সন্দেহ, তবে সাহেবের হুকুম হলে চেষ্টা করে দেখতে পারে।

কবে পর্যন্ত সুবিধে হবে তোমার ?

সাহেব যেদিন বলবেন।

মহাদেব ভাবল একটু, দিন কতক যাক, কেমন ?

জী।

এতক্ষণ যে ক'বার লোকটার দিকে চোখ গেছে, মনে হয়েছে বিশ্বসংসারে শুধু সেলাই ছাড়া আর বুঝি কিছু জানে না।

এবারে আপনা থেকেই স্কুটারের বেগ কমে গেল, মহাদেবকে সচেতন করে দিতে হল না। মনে হল, ভাবছে কিছু। এখানে এসে তার এই আত্মমগ্নতা আগেও চোখে পড়েছে। মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে একেবারে ডুবে যায়। কলকাতায় এরকমটা দেখিনি। কথা বলে কথা না বলার উপলব্ধিটুকু ভাঙতে ইচ্ছে করল না। চুপচাপ চলেছি। চুপচাপ নয় ঠিক···। ওই বর্মী মেয়ের কথাই ভাবছি অসংলগ্ন ভাবে। প্রথম দিন এখানে পদার্পণ করে তার যে মূর্তি দেখেছিলাম আর যে বিস্ফোরণ কানে শুনেছিলাম, আজ সে তুলনায় অনেক শান্ত, অনেক ঠাণ্ডা, অনেক আত্মস্থ। কিন্তু সেদিনের সেই রাগ আর বিস্ফোরণ সত্ত্বেও নারীসুলভ কিছু যেন দেখেছিলাম। সেদিনের বিমূঢ় চোখেও সবল-মাধুর্য দর্শনের গোপন তৃপ্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু আজকের এই স্বল্পক্ষণের শান্ত অতিথি-পরায়ণতা আর সভ্য-ভব্য আলাপচারীব মধ্যেও মনো-বিভ্রমী সেই নারীর দিকটার সন্ধান মিলল না। এ যেন তার থেকে অনেক কঠিন, অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, অনমনীয়।

··সান্টু ঘোষ বলেছিল, রাগলে বুকে সোজা ছুরি বসাতে পারে। সেদিন যথার্থই রেগেছিল ওই বর্মী মেয়ে। কিন্তু মন্তব্যটা সেদিন উপমা বলেই মনে হয়েছিল। আজ একটা স্ফুলিঙ্গও দেখিনি রাগের। অথচ আজ মনে হয়েছে,

পারে বটে।···বোট চাইতে এসে ডোরা টমাস ইন্দুমতী বিহনে মহাদেবকে সঙ্গ দেওয়ার কৌতুক-পরিহাসে একে নিয়েই কটাক্ষ করেছিল। মার্থাকে বলেছিল, মহাদেবের জন্ম ভাবতে হবে না, ওর হাতে এখনো মা-শাইন আছে।

·· কিন্তু ঠিক এই মা-শাইনকে দেখেনি হয়ত ডোরা টমাস।

আর একজনের কথা বিশেষ করেই মনে আসছে এই সঙ্গে। যাকে চাক্ষুষ দেখিনি এখনো, হ্যাভলকে গেলে যাকে দেখার সম্ভাবনা। ইন্দুমতী··। উড়ো জাহাজের নামডাকওয়ালা এক বিদেশী পাইলটকেই অনায়াসে বশীভূত করেনি। মহাদেবকে টেনে নিয়েছে এই মা-শাইনের কাছ থেকেই। ইন্দুমতীকে দেখার এত আগ্রহ বোধ করি আগে হয়নি। হেওয়ার্ড বা মহাদেব-প্রণয়িনী বলে নয়— মা-শাইনের সফল প্রতিদ্বন্দ্বিনী যে ইন্দুমতী, সে কেমন রমণী?

অনেক পথ ঘুরে শেষে যে জায়গায় এসে থামল মহাদেব, তার সামনেই দিগন্ত-ছোঁয়া সমুদ্র। বলল, আর ঘোরে না, এসো বসা যাক্।

এ জায়গাটার নামই করবাইন্‌স কোভ। কলকাতায় সাণ্টু ঘোষের মুখে শোনা এখানকার অভিজাতদের সেই স্নান-বিলাসের জায়গা। হাই সোসাইটিতে ইন্দুমতীর অভিসার শুরু যেখান থেকে। তার স্নানোচ্ছলতায় যেখানে মেয়েরা অন্ধকার দেখেছিল চোখে আর পুরুষদের চোখে কালো জলের রঙ বদলেছিল। পাল্লা দিয়ে সাঁতরে এসে হেওয়ার্ড যেখানে লবণ-সাগরে দাঁড়িয়ে প্রেম-সাগরে খাবি খেয়েছে।

এত সুন্দর যে দু'চোখের পাতা পড়ে না। নানা ছাঁদের হাজার হাজার নারকেল গাছের সারি। পরিপাটি করে সাজানো। বীচের কাছেই স্নানার্থীদের জন্ম কাঠের দোতলা বিশ্রামাগার। চারদিক খোলা, রেলিংঘেরা দোতলায় বেঞ্চি পাতা। একদিকে বিশাল একটি জায়গা জুড়ে চাপ চাপ কালো পাথরের শোভাযাত্রা, সমুদ্রের ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। তিন দিকের অশান্ত জল দুরন্ত ক্ষোভে ক্রমাগত আছড়ে ভাঙছে পাথরের গায়ে। সামনেও বহু বিচ্ছিন্ন কালো পাথর সমুদ্রের ভিতর থেকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত পাথর বলেই এখানে স্নান নিরাপদ, পাথরে ঘা খেয়ে মরার জন্ম এর ধারে কাছেও হাঙর আসবে না।

মহাদেব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগছে আন্দামান বলো—।

খুব সুন্দর।

সুন্দর, না? সামনের দিকে চেয়ে সত্যি সুন্দর কি না তাই যেন যাচাই করে নিল। মুখে অসহিষ্ণু হাসির মত দেখা যাচ্ছে একটু। বলল, এখানকার

মানুষগুলো যদি একটু আধটুও এরকম হত! সবাই যেন মুখোশ পরে আছে একটা—যে যার স্বার্থ নিয়ে আছে, অ্যাবসল্যুটলি এ গড্‌লেস প্লেস!

হঠাৎ এরকম একটা ক্ষোভের মুখে পডব ভাবিনি। আমার তখনো ধারণা, মা-শাইনকে কেন্দ্র করেই কোনো ভাবনার জটিলতায় এতক্ষণ মগ্ন হয়েছিল সে। কিন্তু না। দোকান থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে ওই বর্মী মেয়ে তার মন থেকে মুছে গেছে বোধ হয়। পরের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল, হ্যাভলকে বসতি গড়ার ছক ধরেই তার অন্তরিন্দ্রিয় ঠোক্কর খাচ্ছে থেকে থেকে। এখানকার মানুষদের প্রতিকূলতা আর পরোক্ষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তাড়নাতেই উষ্ণ হয়ে উঠেছে সে।

কিন্তু এ সময়ে এ ধরনের নীতি-কথায় নিজেও উৎসাহ বোধ করছিনে তেমন। শোনার কৌতূহল আপাতত মা-শাইনকে নিয়ে। আলোচনাটা সন্তর্পণে সেদিকেই ঘোরাতে চেষ্টা করলাম।—কিন্তু ওই বর্মী মেয়েটি তো বললে সবাই এখানে সুখে আছে, ভালো আছে!

ঘাড় ফিরিয়ে মহাদেব মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। ফস করে জিজ্ঞাসা করল, এখানে মদ আমদানী বন্ধ হয়েছে জানো?

ঘাবড়ে গেলাম প্রায়।—শুনেছি···

গড়গড়িয়ে বলে গেল মহাদেব, আগে এক বোতল মদের খরচ পড়ত চার টাকা, এখন এখানে সেটা চোলাই করতে খরচ পড়ে পাঁচ আনা। মদ ছাড়া এখনো ছেলেমেয়ের বিয়ে পর্যন্ত হয় না যেখানে, সেখানে এর অর্থ বোঝো? বাইরে দেখছ দরজীর ব্যবসা, ভিতরে ঢুকলে অন্য ব্যাপার দেখতে। সরকারের দাক্ষিণ্যে বড়লোক হয়ে গেল সব, খারাপ বলবে কেন?

আমি বিমূঢ়।—জানাজানি হয় না?

কার দায় পড়েছে জানাতে! প্রায় তীক্ষ্ণ শোনালো কণ্ঠস্বর, জানালে যোগান আসবে কোথা থেকে? আর জানলেই বা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কে? কাগজে কলমে মদ আমদানী বন্ধ করা হল—সেই সুনামটুকুই তো লক্ষ্য! থামল একটু। একটা বড় নিশ্বাস ফেলে অপেক্ষাকৃত শান্ত মুখে বলল, একা মা-শাইন হলে আমিই বাধা দিতে পারতুম—ঘরে ঘরে চলছে এই ব্যবসা।

মদ চোলাইয়ের একটা বিবরণ শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। জঙ্গলের অভাব নেই আন্দামানে, এর মধ্যে কোথায় কখন গুড় জ্বাল হচ্ছে আর মদ চোলাই হচ্ছে কে জানবে? কিন্তু জঙ্গল তো আর বাড়ি-ঘর নয়, সেখানে গাছ থেকে পোকা মাকড় জোঁক পড়ে ঝুরঝুরিয়ে। গেল বাড়ে মড়ক লেগেছিল

নাকি অনেক বস্তিতে। মা-শাইন বলেছে, গুড়ের সঙ্গে আস্ত একটা সাপ সেদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার দলের ব্যাপার নয় তাই বলেছে। বলেছে—যদি পারো ধরে ধরে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করো ওই পাজীগুলোকে।

চারদিকের এই অসীম সৌন্দর্যের ওপর কে যেন কালি ঢেলে দিল একপ্রস্থ। মুখে কথা সরল না অনেকক্ষণ।

এরপর মনে যে কথাটা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল বারবার, সেটা জিজ্ঞাসা না করে থাকা গেল না।—কিন্তু এরকম একটা মেয়ে তোমার কাছে কি চায়, কি আশা করে?

ব্যক্তিগত প্রশ্ন শুনে মহাদেব যেন নিজের মধ্যে ফিরে এলো এবার। সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নীরবতাটুকু রসিয়ে তুলল আগে। পরে জবাব দিল, আমাকেই চায় আর আমাকেই আশা করে! একটু থেমে আরো যেন জটিল করে তুলল প্রসঙ্গটা, বলল, আর আমিও ভালই বাসি ওকে···।

চোখে চোখ পড়তে হা-হা করে হেসে উঠল।—অগাধ জলে পড়লে যে!··· ভাবছ, তাহলে আর এভাবে কেটে পড়ছি কেন, এই তো?

জবাব না দিয়ে শোনার আশায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। তার একটা হাত নিজের অগোচরে কতগুলো বালু এনে জড়ো করছিল! সেগুলো ছড়িয়ে দিল আবার। কি ভেবে মুখোমুখি ঘুরে বসল একেবারে।—আচ্ছা তুমি দুটো মাকড়শার ভালবাসার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছ কখনো?

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় গিয়ে পড়বে ভেবে না পেয়ে ঘাড় নাড়লাম শুধু, করিনি।

—আমি করেছি, ভারি মজার ব্যাপার। মজার ব্যাপারটাই যেন আগে উপভোগ করে নিল খানিক।—মেলার আনন্দে বিভোর হয়ে দুটো দুটোকে ঘিরে নাচে অনেকক্ষণ ধরে, দেখলে মনে হবে এমন প্রেমিক এ দুনিয়ায় আর কেউ নয়। কিন্তু মেলার পরে কি হয় জানো?

সকৌতুকে সে আবারো আমার জানার দৌড়টাই যেন পরখ করে নিল একটু। তারপর বলল, মেয়ে মাকড়শাটা পুরুষ মাকড়শাটাকে মেরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে একেবারে।

মহাদেব হাসতে লাগল প্রচুর।

•

ফিরতে রাতই হল আজও। মহাদেব ভিতরে ঢোকে নি, পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। ঘরে ঢোকার আগেই কানে এলো, সাণ্টু ঘোষ হরিণের মাংসের

বিরিয়ানী আর ফাউল কোর্মার ব্যবস্থা করছে কার সঙ্গে। ডাকল, এসো, তোমার কথাই হচ্ছিল, একে চেনো ?

চেনার কারণ নেই। দেখলাম।

পরনে খাকী হাফপ্যাণ্ট, হাফশার্ট, পায়ে ব্রাউন ক্যাম্বিশের জুতো, কাঁচা পাকা চুলে পরিপাটি সিঁথি, বয়েস পঞ্চাশের ওধারে। কাঠের মেঝের ওপর ঝুঁকিয়ে বসে আছে। রোগা শরীর, নিষ্প্রভ চাউনি। আমার উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জ্ঞাপন করল, গুড্ নাইট মিস্টার।

সাণ্টু ঘোষ হেসে উঠল, গুড নাইট তো যাবার আগে বলে হে ফকির, বলো গুড ইভনিং।

শীর্ণ কব্জি উল্টে হাতের বিবর্ণ শাদা রঙের রিস্টওয়াচে সময় দেখে লোকটি কাঠ জবাব দিল, ইভনিং অনেকক্ষণ খতম হয়েছে, এখন ন'টা বাজে রাত।

ফকিরচাঁদ নয় ফকিরুদ্দিন। আন্দামানের পাকা রাঁধিয়ে, হেড কুক বললেই এক বাক্যে সকলে ফকিরুদ্দিনকে চিনবে। আট-দশজন খানসামা আছে ওর অধীনে, যেখানে যেমন দরকার ও-ই পাঠায়, আর বড খানাপিনার ব্যাপার হলে তো ফকিরুদ্দিন ছাড়া অচল। দেশে বউকে খুন করে আন্দামানে চালান হয়ে এসেছিল, আর যায়নি। জেলে রান্নার বিদ্যেয় হাত পাকিয়েছে, এখন সেটা আর্ট এ দাঁড়িয়েছে প্রায়।

চোখের সামনে জলজ্যান্ত কোনো খুনী আসামী দেখিনি এর আগে।

কিন্তু শোনা গেল তার খুনটা নেহাতই নিরামিশ গোছের ব্যাপার একটা। চাবিওলা ছিল, রাগের মাথায় চাবির গোছা দিয়ে মেরে বসেছিল বউকে, একেবারে মারবে বলে মারেনি। কিন্তু মরেই গেল···আর তারপরে কতকগুলো লোক মিথ্যে সাক্ষি দিল। সেই রাগেই দেশে ফেরেনি আর। এখন তো ও ছাড়া আন্দামানের হাই সোসাইটি কানা—হাই সোসাইটির একেবারে ঘরের খবরও ফকিরুদ্দিনের জিভের ডগায়। হবে না কেন ? তার দলের রাঁধুনী কোন্ বাড়ির হেঁসেলে না ঢুকেছে ?

এসব আলোচনা ফকিরের সামনে বসেই হল। কিন্তু তাতে এতটুকু ভাববিকার দেখা গেল না তার। আমিই বরং একটু আধটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম !

ফকির আবার ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল, হাওয়াই জাহাজের সাহেবেরা সাড়ে ন'টায় খাবে বলেছে, অতএব এখন না উঠলে নয়।

সাণ্টু ঘোষ ওপরপড়া হয়ে আর একদফা প্রশংসা করল হেড কুক ফকিরুদ্দিনের। প্লেন এলেই তো ফকিরুদ্দিনের ডাক পড়ে সাহেবদের কাছে, ও

না থাকলে হেওয়ার্ড সাহেবের একদিনও খানা রুচত কিনা সন্দেহ! বলল, কি দকায় যাওয়ার আগে সাহেব তোমাকে কত করে বখশিশ করে যায় বাবুকে শুনিয়ে দাও না ফকির—।

—বখশিশ নয়, টীপস্‌। মর্যাদাবোধে প্রায় গম্ভীর প্রতিবাদের মত শোনালো তার গলা। আমার দিকে ফিরে দুটো আঙুল তুলে বলল, ট্যু টেন-রুপি নোটস্‌।

মুখভাবে বিস্ময় জ্ঞাপন করতে হল একটু।

সে বিদায় নেবার আগের মুহূর্তে সান্টু ঘোষ কাজের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল আবার।—বাবুকে তোমার হাতের খানা দু'চারদিন ভালো করে খাওয়াতে হবে কিন্তু ফকির, পরিষ্কার মত ঢেকেঢুকে পাঠাবে, খরচ-পত্র যা পড়ে আমি দেব, তাছাড়া তোমার জংলীর ব্যবস্থাও হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা—আমার দিকে ঘাড় ফেরাল সান্টু ঘোষ, তুমি হ্যাভলকে যাচ্ছ কবে? কাল?...কালই ফিরছ তো আবার? ফকিরের দিকে ফিরে খানার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেলল।—কাল রাতেই তাহলে নমুনাটা দেখিয়ে দাও একবার, সমস্ত দিন বাবু কাল ভিন্‌-দ্বীপে ঘোরাঘুরি করে আসবেন।

জংলী অর্থাৎ এখানকার মদ। স্থানীয় লোকেরা জংলী বলে। স্বীকৃতি জানিয়ে লোকটা চলে যেতে বললাম, এ আবার কোত্থেকে কাকে জোটালে?

সান্টু ঘোষ হাসতে লাগল, বলল, পয়সা তো দেবই বললাম, না দিলেও অবশ্য ওই জংলীর লোভেই এনে দিয়ে যেত।—এরই মধ্যেই ও উঠত ভাবো নাকি, নেহাৎ ওই ক্যাপ্টেনের দলটি এসেছে বলে। ঠায় দু'টি ঘণ্টা বসে থাকত একটা টাকার জন্যে—ক্যাপ্টেন এলেই অন্য মেজাজ ওর।

কি জানি কেন, ওর হাত দিয়ে আহার্য আনার ব্যবস্থাটা মনঃপূত হল না। বললাম, কি দরকার ছিল এর ··

—না হে সত্যি ভালো রাঁধে, কাঁহাতক একঘেয়ে ভালো লাগে। তাছাড়া খুব করিতকর্মা লোক, এক বোতল করে জংলী পেলে এই ঘরে বসে তোমাকে প্রত্যেক দিনের গোটা আন্দামানটাকে আয়নার মত পরিষ্কার দেখিয়ে দেবে—কোথায় কি হচ্ছে আর কোথায় কি হতে পারে সব ওর নখ-দর্পণে।

এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে ভালো লাগল না। হয়ত জায়গা বিশেষে এই গুণেরই কদর বেশি। খাওয়ার প্রসঙ্গে আর ফকিরুদ্দিনের প্রসঙ্গে এতক্ষণ বেশ খুশি মেজাজেই ছিল বন্ধুটি। এইবার গম্ভীর দেখালো তাকে। নিস্পৃহ মুখে প্রশ্ন করল, আজ কোথায় ঘুরলে··· ?

মা-শাইনের দোকানে ঢুকেছিলাম শুনে আগ্রহ বাড়ল। খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা

করতে লাগল, কি কথা হল, মহাদেবের প্রতি তার হাবভাব কেমন দেখলাম, ইত্যাদি। পরে মন্তব্য করল, মেয়েটা খুব খারাপ নয়, বুঝলে···।

যে বন্ধুবাৎসল্যের দরুন সাণ্টু ঘোষের এত রাগ ইন্দুমতীর ওপর, তারই মুখে মা-শাইন সম্বন্ধে এ মতামত অন্তত আশা করিনি। বললাম মদ চোলাইয়ের ব্যবসায়ে বড় লোক হচ্ছে শুনলাম।

শুনেও গায়ে মাখলে না সাণ্টু ঘোষ।—ও এখানে এমন অনেকেই করে। মহাদেব বললে বুঝি? বলবেই তো। ইন্দুমতীর মত এমন গুণবতী এখন আর কে। অথচ মা-শাইন একদিন কত বড বিপদ থেকে ওকে বাঁচিয়েছিল জানো? শুধু ওকে কেন, সাণ্টু ঘোষ উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রায়, ওর ওই অমন গুণের ইন্দুমতীকেই কি কম ফাঁড়া থেকে বাঁচিয়েছে মেয়েটা!

জানা ছিল না। জানা গেল।

ইন্দুমতীকে ফাঁড়া থেকে বাঁচানোর ব্যাপারটা তেমন অভিনব কিছু নয়। সাত আট বছর আগের কথা, সবে আন্দামানে এসেছে ইন্দুমতী, জায়গাটার হাল জানে না। সাত আট বছর কেন, এখনও এখানকার পথে ঘাটে কোন সুশ্রী মেয়েকে একা ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় না। আন্দামানের বর্ষায় জলের অভাব তবু ঘোচে, কিন্তু মেয়ে তো আর আকাশ থেকে পড়ে না।

সাধারণ স্থানীয় লোকের চোখে সেদিন যেন আকাশ থেকেই পড়েছিল এক নতুন বয়সের মেয়ে।

সেই নতুন বয়সের মায়ায় এখানকার অভাবটা ইন্দুমতী আঁচ করেছিল, কিন্তু বিপদ বোঝেনি। যত্র তত্র একা ঘুরে বেড়াতো। ফলে তার চলার পথে ঘুর ঘুর করত অনেকেই—বর্মী মালোয়াড়ী হিন্দু মুসলমান। তারা টিকা টিপ্পনী ক্যাটত, আভাসে ইঙ্গিতে ওর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করত। এর বেশি কিছু করত না বলে ইন্দুমতীর সাহস বেড়েছিল।···ওদেরও বেড়েছিল।

একদিন বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল ইন্দুমতীকে। রুখে দাঁড়িয়ে ফস করে বলে বসেছিল, লোকাল-বর্ন তো, ভদ্রতা জ্ঞান আর কতটুকু হবে!

ব্যস। এটুকুই চেয়েছিল ওরা। ইন্দুমতীকে ঘিরে ফেলেছিল একেবারে। লোকাল-বর্ন বলা হল কেন? অপমান করা হল কেন? ওরা লোকাল-বর্ন তো তার কি? ওরা ছাড়বে না, এ অপমানের জবাব দিতে হবে। হট্টগোল, লোলুপ ফুর্তি, হাত ধরে টানাটানিও চলল এদিক থেকে ওদিক থেকে। ইন্দুমতী ভয়ে বিবর্ণ প্রথম, তারপর কেঁদে ফেলল।

ওই পথে যাচ্ছিল বর্মী মেয়ে মা-শাইন। বছর তিনেক বড় ইন্দুমতীর থেকে।

সেই নগ্ন লোলুপতা থেকে হাত ধরে টেনে বার করল ইন্দুমতীকে। ভরা যৌবনে মা-শাইনের একার দাপটই কম নয় তখন, তার ওপর ওর ঘরে বাঁধা থ-মিনকে কে আর না একটু সমীহ করে চলে। থ-মিনের তখন হাত একটা নয়, দুটোই।

তবু ভীরু-শিকার হাত ছাড়া হয় দেখে মা-শাইনেরও পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল দুই একজন। লোকাল-বর্ন বলার জবাব চেয়েছিল।

মা-শাইন ইন্দুমতীর হয়ে জবাব দিয়েছিল।

কাছের লোকটাকে ওর হাতের এক চড়ে তিন হাত দূরে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। আর কেউ এগিয়ে আসেনি।

ইন্দুমতীকে একেবারে নিজের দোকানে এনে তুলেছিল মা-শাইন। পরে দু'জনের ভাবও হয়েছিল খুব। মা-শাইন ব্যবসা বোঝে, টাকা চেনে। মেয়েটাকে দোকানে টানতে পারলে দোকানের শ্রীবৃদ্ধি হবে বুঝেছিল। নতুন রিফিউজি ওর বাবা, দু'বেলা অভাবের সংসার, ইন্দুমতী যেচে এসেছিল প্রায়।

কিন্তু সাণ্টু ঘোষের মতে, দরজীর দোকানে সেলাইয়ের কাজে টিকে থাকবে কেন ইন্দুমতীর মত মেয়ে—তার যে তখন সবে চোখ খুলছে!

দ্বিতীয় ঘটনা, অর্থাৎ মহাদেবকে বিপদ থেকে টেনে তোলার ব্যাপারটা শুধু বিচিত্র নয়, প্রায় অবিশ্বাস্য। এরকম কিছু শুধু আন্দামানেই ঘটতে পারে। এবং সে বিপদ থেকে এভাবে একজনকে মুক্ত করাও বোধ করি শুধু ওই মা-শাইনের দ্বারাই সম্ভব। পোর্টব্লেয়ারে প্রথম পদার্পণের দিন মহাদেবের ওপর টমাস সাহেবের প্রচণ্ড রাগের প্রসঙ্গে এই 'ভয়ানক কাণ্ড'রই অবতরণিকা করে রেখেছিল সাণ্টু ঘোষ। বলেছিল, পরে শোনাবে।

ঘটনার পটভূমি মায়া বন্দর। পোর্টব্লেয়ার থেকে সমুদ্রপথে একশ তিরিশ চল্লিশ মাইল দূরের একটা বর্ধিষ্ণু দ্বীপ। সমস্ত আন্দামানে এই দ্বীপেই জঙ্গলের কাজ হয় সব থেকে বেশি। কাঠের এতবড় ব্যবসায় সম্পদও বোধ হয় ভারতবর্ষে আর নেই। সেই দ্বীপের পশ্চিমের দিকটায় ঘন জঙ্গলের অগম্য-অভ্যন্তরে নগ্ন আদিবাসী জারোয়াদের সন্ধান মেলে এখনো। নিজেদের আওতায় সভ্য মানুষ দেখলেই তারা বিষাক্ত তীর মেরে হত্যা করবে। কচিৎ কখনো ছিটকে-ছিটকে তারা জঙ্গলের কাজের কাছাকাছি এসে পড়ে। জঙ্গলের কাজ হয় বিশাল বিস্তৃত জায়গা জুড়ে। ফলে অনেক সময় আবার জঙ্গলের কর্মীদেরও অনবধানে ওদের নাগালের মধ্যে এসে পড়তে হয়। জীবন্ত আদিবাসী জারোয়া ধরতে পারাটা সাড়া পড়ে যাওয়ার মতই ব্যাপার একটা। অ্যানথ্রোপলজির লোভনীয় সম্পদ ওরা। একজনকেও জীবন্ত ধরতে পারলে খ্যাতির অন্ত নেই, সরকারী পুরস্কার তো

আছেই। কিন্তু নেহাৎ দৈব যোগাযোগ না ঘটলে এ চেষ্টায় বড় কেউ এগোয় না।

মাত্র চার বছর আগের কথা। সেখানকার কোনো একদিকে জঙ্গলের কাজের শ্রমিক-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বিপত্নীক টমাস সাহেব। সরকারী চাকরি জীবনে সেলুলার জেলের সেই পদস্থ এবং ডাকসাইটে কর্মচারী ফিরিঙ্গী টমাস। ডোরা মার্থার বাবা। চাকরি থেকে অবসরের পরেই বেসরকারী জঙ্গলের কাজে বহাল হয়েছিলেন তিনি। দৈব-বিড়ম্বনায় তাঁর এবং তাঁর সহচরদের একেবারে বন্দুকের ডগার ওপর পড়ে যায় তিনটি জারোয়া তরুণ। তীর ছুঁড়তে গিয়ে একজন বন্দুকের গুলীতে ধরাশায়ী হয় তক্ষুনি, বাকি দু'জনকে অক্ষত বন্দী করে আনেন টমাস সাহেব। বছর কুড়ির নিচেই হবে দু'জনার বয়স।

দ্বীপময় হুলস্থূল পড়ে যায়। টমাস সাহেব জামাই আদরে তদবীর তদারক করলেন তাদের। আনন্দে আটখানা তিনি। একটা কাঠের ঘরে পা বেঁধে ফেলে রাখলেন দুটোকে। দোরগোড়ায় বন্দুকধারী পাহারা বসালেন একজন। দু'তিন দিনের মধ্যেই পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজ আসার কথা। জাহাজ এলে আদিবাসীদের নিয়ে তিনি স্বয়ং রওনা হবেন।

দলে দলে লোক আসে জারোয়া দেখতে। কোন্ অনুভূতি দিয়ে শিখেছে কে জানে, লোক আসতে দেখলেই তারা দু'হাত জোড করে বোবা করুণা প্রার্থনা করে। অর্থাৎ, মেরো না, আঘাত করো না আমাদের।

মহাদেব তখন ওই মায়া বন্দরে।

বাড়ি করবে বলে নিজের স্টীম-বোটে করে গেছে সুবিধে মত ভালো কাঠের ব্যবস্থা করতে।

মহাদেবও জারোয়া দেখতে গিয়েছিল। তাকে দেখেও আদিবাসী কিশোরদ্বয় হাত জোড় করে নিঃশব্দ আকূতি জ্ঞাপন করেছিল।

মহাদেব দেখেছিল অনেকক্ষণ ধরে। বন্দীদশার ছলছল বোবা ত্রাস দেখেছিল। দেখে ভুলতে পারেনি।

এই লোকটার রক্তে আছে বোধ হয় মাতৃধারার দুর্জয় সাহস। সেই সঙ্গে বুকে আছে পিতৃকুলের মুক্তিকামী বন্ধন বেদনা।

দ্বীপের সুপ্তিময় সেই গভীর রাতেই মুক্তি পেয়েছিল জারোয়া দু'টি।

বন্দুকধারী পূর্ব-পরিচিত পাহারাওয়ালাকে রাতের নির্জনে মদে চুর করে নিয়েছিল আগে। তারপর বন্দীদের বাঁধন কেটে দিয়েছিল। চোখের পলকে জঙ্গলে মিলিয়ে গিয়েছিল আদিবাসীরা। কিন্তু মহাদেব বুঝেছে, নেশার ঘোরেও পাহারাওয়ালা ব্যাপারটা টের পেয়েছে। প্রবল নেশায় উঠে বসতেও পারেনি,

বন্দুক হাতড়ে পায়নি—তবু কি হয়ে গেল বুঝেছে।

সকাল হবার অনেক আগেই মহাদেবের স্টীম-বোট মাঝ-সমুদ্রে এসে পড়েছে। আর একটু বাদে ভোর হবে। জানাজানি হবে। তারপর কি হবে মহাদেব সভয়ে অনুমান করতে পারে। নরঘাতী আদিবাসী ছেড়ে দেওয়ার অপরাধের কৈফিয়ত নেই। তাছাড়া ছাড়বার মানুষ নন্ টমাস সাহেব। মহাদেব কি করবে? পালাবে? পালাবে কোথায়? আর বড় জোর তিন দিন কি চার দিন। টমাস চলে আসবেন পোর্টব্লেয়ারে। চার দিক বেঁধে কেস সাজাবেন।

সন্ধ্যার আগেই পোর্টব্লেয়ারে এসে পৌঁছুল মহাদেব। অ্যাবার্ডিন বাজারের কাছেই থাকত তখন। হঠাৎ ফিরে এসেছে শুনে মা শাইন তার বাড়ি গিয়েছিল। হামেশাই যেত। বিপদের কথা মা-শাইন শুনেছিল। মহাদেব না বলে পারেনি।...প্রায় ঘণ্টাখানেক স্থাণুর মত স্থির হয়ে বসে মা-শাইন ভেবেছিল।

তারপর সেই রাতেই আবার স্টীম-বোট মায়াবন্দরের দিকে ছুটেছিল একা মা-শাইনকে নিয়ে। মা শাইনকে চিনত বই কি টমাস সাহেব। পোর্টব্লেয়ারে অনেক দেখেছে। আর সেই দেখার তাৎপর্য উপলব্ধি করত না এমন মেয়ে মা-শাইন নয়।

এক একটা দিন গেছে, পোর্টব্লেয়ারে বসে ছটফট করেছে মহাদেব।

চারদিন কেটে গেল, সরকারী জাহাজ ফিরে এলো, কিন্তু টমাস আসেনি।

ঘাম দিয়ে একপ্রস্থ জ্বর ছাড়ল বটে মহাদেবের, কিন্তু দুভাবনা একেবারে গেল না।

মা-শাইনকে নিয়ে মহাদেবের স্টীম-বোট ফিরে এলো ন'দিনের দিন।

এত ক্লান্ত, এত শ্রান্ত মা-শাইনকে কেউ দেখেনি পোর্টব্লেয়ারে। তার সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে একপ্রস্থ।

টমাস সাহেব এসেছিলেন আরো দিন তিনেক বাদে।

আদিবাসী ধরা পড়া এবং তাদের অজ্ঞাতভাবে পালানোর মামুলি রিপোর্ট দিয়েছেন। এতদিন পরে এসে নতুন করে আর হৈ-চৈ করেন কি করে? এক বর্মী মেয়ে নিয়ে সাত-আট দিন ধরে তাঁকে বেপরোয়া ফুর্তি করতে মায়াবন্দরে কে না দেখেছে?

আদিবাসীদের কেউ ছেড়ে দিয়েছে, এ প্রমাণ থাকলে এতদিন তিনি কি করছিলেন?

কি করছিলেন সেটা কি আর সরকারীভাবে জানতে বাকী থাকবে? তাছাড়া, প্রাণের ভয় শেষ পর্যন্ত কার নেই? ওই বর্মী মেয়ে যা দিয়েছে, তার বদলে

বিশ্বাসঘাতকতা করতে গেলে সে নেবেও কিছু। জাতটাকে চেনেন টমাস সাহেব।

সাণ্টু ঘোষ জানালো, জঙ্গলের কাজ থেকেও অবসর নিয়ে সেই থেকে স-কন্যা পোর্টব্লেয়ারেই আছেন টমাস সাহেব। মনের দুঃখে খুব সম্ভব এখনও চুল ছেঁড়েন নিজের।

কথা ক'টা কানে গেল এই পর্যন্ত। আমি স্তব্ধ। নারীর এ কোন রূপ? ধ্বংসের, না রক্ষার?

আমি জানি না।

*

* *

অনেক দূর থেকে দেখলে মনে হয়, খোলা সমুদ্রের বুকে চাপ চাপ জঙ্গল ভাসছে। তারই একটার দিকে আঙুল তুলে মহাদেব বলল, ওই হ্যাভলক্।

অন্য দ্বীপগুলোর সঙ্গে ওটাকে তফাত করে চিনল কি করে সে-ই জানে। সমুদ্রের ওপর মোটর বোটটাকে পলকা খেলনার মত মনে হচ্ছিল এতক্ষণ। যেমন খুশি দুলিয়েছে, যেমন খুশি আছড়েছে! এবারে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল একটু। আরো খানিকটা কাছাকাছি হতে মনে হল, এই বন্য দ্বীপগুলি সমুদ্রকে যেন চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। তার বিশালতার গর্ব ঘুচিয়েছে। কিন্তু তবু এই প্রতিবন্ধক সমুদ্রের খারাপ লাগছে না যেন। সহজ মিতালিতে দ্বীপগুলোর গায়ে গায়ে মিশে আছে।

পোর্টব্লেয়ার থেকে বোট ছেড়েছে ভোর রাতে। মাইল চল্লিশ পথ। সাড়ে আটটা ন'টা নাগাদ পৌঁছে যাবে বোধহয়। মহাদেব আঙুল দিয়ে দেখাল, ওই উইলিয়ম দ্বীপ—একজনও লোক নেই। নিকল্‌সন দ্বীপ—একজনও লোক নেই।

বললাম, এই এক একটা দ্বীপে এসে রাজা হয়ে বসে থাকলে কেমন হয়?

মহাদেব হাসল একটু! জবাব দিল, পোর্টব্লেয়ারের হাই সোসাইটি কিন্তু তাই ভাবে প্রায়। কলোনী নিয়ে যেতে উঠেছি দেখে তারা মনে করে শেলের ব্যবসায় মন্দা পড়েছে বলে এই করে এবার রাজা উজির হয়ে বসার মতলব আঁটছি।

রাজা উজির দূরে থাক, কোনো স্বার্থ নিয়ে কেউ এতে উৎসাহিত হতে পারে তাও কল্পনার বাইরে। কারণ সামাজিক মানুষের এতবড় বিচ্ছিন্নতা ভাবতে পারিনে। সপ্তাহে মাত্র একটি দিন পোর্টব্লেয়ারের জাহাজ যায় এ পথে। তখনই শুধু ঘণ্টা কতকের জন্য মনে হতে পারে, বৃহত্তর জগৎ আছে একটা। তা না হলে এখানে এটুকুর মধ্যেই সব শেষ। তাই, ওই হাই সোসাইটির মত না হোক,

কৌতূহল আমারও, মহাদেব হঠাৎ এর মধ্যে কি পেল? জিজ্ঞাসা না করে পারলুম না, কিন্তু তুমি হঠাৎ এ ব্যাপারটা নিয়ে এমন উঠে পড়ে লেগেই বা গেলে কেন?

বোটের গায়ে হেলান দিয়ে পা দোলাতে দোলাতে মহাদেব হাসতে লাগল মিটিমিটি। পরে খুশি মেজাজে জবাব দিল, আমি লাগিনি, ঘাড় ধরে আমাকে লাগানো হয়েছে। যাচ্ছই তো দেখতে, চলো না—।

এই ক'দিনে ইন্দুমতী নামে কোনো মেয়েকে সে চেনে এমনও মনে হয়নি। মা-শাইন বা ডোরা মার্থার সঙ্গে সংশ্রবটুকুই বরং বেশি স্পষ্ট ছিল। কিন্তু এই একটুখানি হাসির মধ্যে যেন অনেক কিছুই দেখা গেল। আরো বলত বোধহয় কিছু। সাড়া না পেয়ে চুপ করে রইল। সাড়া দেব কি করে? হেওয়ার্ডকে এরই মধ্যে ভোলা সম্ভব হয়নি। ইন্দুমতীকে দেখার কৌতূহল যত বড়ই হোক, কোনরকম শ্রদ্ধার যোগ নেই তার সঙ্গে। আছে বরং এক ধরনের নারী-প্রাচুর্য দর্শনের প্রায়-স্থূল আকর্ষণ। যে প্রাচুর্য ডোরা টমাস দূরে থাক, মা-শাইনকেও হার মানায়। তাছাড়া, এই ক'টা দিনে সাণ্টু ঘোষ সামান্য শ্রদ্ধাটুকুও ঝাঁজরা করে ছেড়েছে।

ওই মেয়ে মহাদেবকে এই কাজে টেনে নিয়ে এসেছে, বিশ্বাস্য নয় খুব। সাণ্টু ঘোষের মতে মহাদেবের টাকার অঙ্কটা ইন্দুমতী খুব ভালো করেই জানে।

বোট তীরে থামতে না থামতে ঝোপ-ঝাড়ের কোন্‌দিক থেকে যে কত লোক এসে জুটতে লাগল, ঠাওর পেলাম না। গায়ে জামা নেই কারোর, হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা। ক্ষেত-খামারের কাজ করছিল বোধ হয়, মোটর বোটের সাড়া পেয়ে দেখতে এসেছে।

কিন্তু সকলেই মহাদেবের প্রতীক্ষা করছিল বোঝা গেল। অনেকেই জিজ্ঞাসা করল, আসতে দেরি হল কেন এত। জবাবের বদলে মহাদেব হাসল, পিঠে চাপড় দিয়ে কারো, কারো বা কুশল খবর নিল। তারপর বোটের জিনিসপত্র নামাতে বলল।

কি ছিল বোটে, এই সারা পথ ভাল করে লক্ষ্য করিনি একবারও। কিন্তু সেগুলো যখন একে একে নামানো হতে লাগল, দেখে আমারই চক্ষু স্থির। চাল ডাল তেল চিনি মশলাপাতি সাবান ধুতি শাড়ি—রাজ্যের জিনিস। সব প্যাকেট করা, কোন্‌টা কার তারও টিকিট ঝুলছে। যাদের প্রাপ্য সেগুলো, তারা অনেকেই উপস্থিত। যে যার জিনিস তুলে নিতে লাগলো। যারা আসেনি তাদেরটাও ঠিকমত পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে মহাদেব ঘুরে দাঁড়াল, চলো—।

চলার জন্য পা বাড়িয়েই আছি। পূর্ব বঙ্গের অজ গ্রামের মত খানিকটা জংলা পথ পেরিয়ে গাছ-গাছড়া ঘেরা এক জায়গায় এসে পা আপনি থেমে গেল। সমুদ্রের পাড় থেকেই সেই খালি গা আর হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা আট দশজন নানা বয়সের উদ্বাস্তু বাসিন্দা মহাদেবের সঙ্গ নিয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মহাদেব আগে আগে যাচ্ছিল।

সবাই থেমে গেল।

সামনে মাচার ঘর একটা। গাছের ডাল কেটে মাচা করা হয়েছে। তার ওপর ছনের ঘর। পাশেই আর একটা মাচা বাঁধছে চার পাঁচজন লোক। আর, তিন চারটি অল্প-বয়সী ছেলের সঙ্গে গাছ-কোমর শাড়ি কষে পিছন ফিরে উঠোনে সরু ডালের বেড়া বাঁধছিল যে মেয়েটি, কাউকে বলে দিতে হল না, সে-ই ইন্দুমতী। যদিও, এক-যে-ছিল সাহেব-প্রণয়িনী ইন্দুমতীকে এই বেশে এবং এই পরিবেশে একবারও কল্পনা করিনি।

দেখলাম···। কিন্তু যেমন দেখব ভেবেছিলাম, তেমন দেখলাম না।

রূপ নয়। কলকাতার শহরে অন্তত অমন রূপ হামেশা দেখা যায়। সব মিলিয়ে আর কিছু।

অনেককে ঘাড় ফেরাতে দেখে সেও ফিরে তাকালো। তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে চটাচট শব্দে হাত ঝেড়ে এগিয়ে আসতে আসতে ঝাঁঝিয়ে উঠল, তোমার সঙ্গে কোনো ভাব নেই যাও—সেই কবে আসার কথা ছিল আর—

থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়াল।—ও মা, এ কে?

বলা বাহুল্য এই ছন্দপতন আমাকে লক্ষ্য করে। হাতের ঝোলার মত ব্যাগটা মাটিতে ফেলে মহাদেব হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল, বলো তো কে?

নিঃসঙ্কোচে একদফা খুঁটিয়ে দেখে নিল ইন্দুমতী।—কি জানি, দেখিনি তো কখনো!

মহাদেব রসিকতা করে বলল, ভালো করে দেখো, তোমার মিত্র নয় খুব—আসতে ক'দিন দেরি হল বলে আমার ওপর যতটা হম্বিতম্বি করবে ঠিক করে রেখেছ, তার অর্ধেক এঁর পাওনা।

ইন্দুমতীর ভালো করে দেখার অভিনিবেশের মধ্যে পড়ে সঙ-এর মত দাঁড়িয়ে হাসতে চেষ্টা করা ছাড়া আর করি কি। রীতি অনুযায়ী আলাপ-পরিচয়ও হয়নি, অভিবাদন বিনিময়ও না।

এবার মহাদেব কলকাতা শব্দটা উচ্চারণ করতেই ইন্দুমতী সাগ্রহে তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল যেন।—ও, তোমার কলকাতার সেই লেখক বন্ধু!

আসুন, কি ভাগ্যি আমাদের! খুশিভরা মুখে মাচার ওপর ছনের ঘরের দিকে পা বাড়াল সে।—কবে এসেছেন? এরই মধ্যে জাহাজ এলো বুঝি আবার? কোথায় উঠেছেন পোর্টব্লেয়ারে?

মুচকি হেসে মাঝের প্রশ্নটার জবাব দিল মহাদেব, জাহাজ আসেনি, হেওয়ার্ডের প্লেন এসেছে—হেওয়ার্ডের সঙ্গে এরই মধ্যে ওর খুব ভাবও হয়েছে।

ইন্দুমতীর মুখে চকিত-বিড়ম্বনার ব্যঞ্জনাটুকু সুদৃশ্য। ত্রস্তে আমার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দু'চোখ রাখল মহাদেবের মুখের ওপর। ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল দু'চার মুহূর্ত। তারপর হেসে ফেলে বেপরোয়া জোরের সুরে বলল, বেশ হয়েছে।

সেই হাসিতে ঝকঝকে দু'সারি দাঁতের মাধুর্য আগে চোখে পড়ে। যা একবার দেখলে আবার দেখার লোভ হয়। আমার ধারণা, মেয়েদের বাহু যৌবন-তূণে যত অস্ত্র আছে তার মধ্যে সুষ্ঠু দাঁতের মহিমা বিশেষ একটি।

...এই দ্বীপের রাজ্যে যদিও কেউ আমায় দ্রষ্টার আসনে বসিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের পরোয়ানা দিয়ে পাঠায়নি, তবু মহাদেবের একটা প্রচ্ছন্ন বক্রোক্তি মনে গেঁথে ছিল। পোর্টব্লেয়ারের পথে জিপে বসে হেওয়ার্ডের পক্ষ নিয়ে ইন্দুমতীকে এবং পরোক্ষে ওকেও ব্যঙ্গ করার জবাবে বলেছিল, একতরফা রটনা শোনার দলে না ভিড়ে সব কিছু নিজের চোখেই যাচাই করে নিতে। নিজের অগোচরে সেই থেকে যাচাইয়ের চোখ নিয়েই কিছু দেখার প্রতীক্ষা করছিলাম বোধ হয়। আর দেখার এই প্রথম পর্বেই মা-শাইনের সঙ্গে না হোক, ডোরা টমাসের সঙ্গে ইন্দুমতীর তফাতটুকু স্পষ্ট হয়ে গেল। ডোরা টমাসও হাসতে পারে অজস্র। কিন্তু হাসার (আগের বা পরের) কারুকার্য জানে না এমন।

মাচা-ঘরের দিকে এগোতে মহাদেব রয়ে সয়ে ইন্দুমতীর শেষের প্রশ্নের, অর্থাৎ, পোর্টব্লেয়ারে কোথায় উঠেছি তার জবাব দিল। জবাব ঠিক নয়, ইন্দুমতীকে দ্বিতীয় দফা আঁতকে দিতে চাইল। বলল, পোর্টব্লেয়ারে ও উঠেছে সাণ্টু ঘোষের কাছে।

ওঃ বাবা! পা এবার থেমেই গেল ইন্দুমতীর। দুই চোখে ছদ্ম ত্রাস।—তার পরেও আপনি এলেন এখানে?

জবাবের প্রত্যাশা না করে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল নিজেই। এই হাসিতে সুর মেলানোর মত সহজ হয়ে ওঠা সম্ভব নয় এরই মধ্যে। কিন্তু পরিস্থিতিবিশেষে না হাসাটাও বিসদৃশ। পিছনে ফিরে তাকালাম একবার। সমুদ্র-তীর থেকে সঙ্গে যারা এসেছিল, বা যারা ছিল এখানে, নিরাসক্ত কৌতূহলে তারা যেন চেয়ে

চেয়ে ভিন্ন জগতের মানুষ দেখছে গুটিকতক।

কাঠের চারটে সিঁড়ি দিয়ে ইন্দুমতী মাচায় উঠল আগে আগে। সিঁড়িটা কচকচিয়ে উঠল। পিছনে আমরা।

কাঠের মেঝে। ভিতরে মাটির দেয়াল। একদিকে বেঢপ চৌকি পাতা একটা, অন্যদিকে দড়ির চারপায়া। ঘরের ভিতরটা পরিচ্ছন্ন, তকতকে।

ইন্দুমতী বলল, বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা করি, আসবে জেনে জল চড়িয়েই রেখেছি।

তরতরিয়ে নেমে গেল আবার। মহাদেব হাত পা ছড়িয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ল। আমি চৌকিতে বসতে চৌকিটাও মচমচিয়ে উঠল। মহাদেব বলল, পেরেকের কারবার নেই এখানে, পায়াগুলো দড়িতে বাঁধা, ভয় নেই মজবুত আছে।

একটা এনামেলের প্যানের ওপর আর একটা ছোট প্যান চাপিয়ে শাড়ির আঁচলে ধরে ইন্দুমতী উঠে এলো। সেগুলো রেখে ঘরের কোণ থেকে চায়ের সরঞ্জাম এনে বসল সেও। একটা প্যানে চায়ের জল, অন্যটাতে ডিম সেদ্ধ আলু সেদ্ধ। বলল, বিনা নোটিস-এ এসেছেন, আপাতত এই খান'।

মহাদেব তাড়াতাড়ি তার কাছ ঘেঁষে বসল একেবারে। ঝুঁকে দেখে বলল, ওয়াণ্ডারফুল!···কিন্তু ডিম মোটে চারটে!

সব নিয়ে ইন্দুমতী চট করে সরে বসার ভান করল একটু। দ্ব্যর্থক কৌতুকাভাস। অবিশ্বাস খাবারের জন্যও হতে পারে আবার অত কাছে এসে বসার দরুনও হতে পারে।

সামনের ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। বড় বড় গর্জন আর প্যাডক গাছের সারি। ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে দু'শ গজের মধ্যেও আর বসতি চোখে পড়ে না। বললাম, ধারে কাছে তো আর বাড়িও দেখি না, আপনার ভয় করে না?

প্লেটে খাবার গোছাতে গোছাতে ইন্দুমতী হাসল একটু মুখ টিপে। মহাদেবের মুখের ওপর হালকা কটাক্ষ নিক্ষেপ করল একটা। জবাব দিল, ভয় তো মানুষকেই, এখানে মানুষ কই?

মহাদেব খেতে শুরু করেছে। ঈষৎ ব্যস্ততায় আমিও সে কাজেই মন দিলাম।

চুপচাপ এক পলক দেখে নিল ইন্দুমতী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কবে এসেছেন পোর্টব্লেয়ারে?

দিনের হিসেব স্মরণ করতে চেষ্টা করেও পারা গেল না। বললাম, তা বেশ দিন

কতকই তো হল··· ।

ইন্দুমতী প্রায় ঘুরে বসল মহাদেবের মুখোমুখি।—তাহলে এত দেরি হল কেন আসতে? তোমার জিপের পাল্লার পড়লে পোর্টব্লেয়ার দেখা তো এক দিনের কাজ—ওদিকে সেই কবে অফিসের ছুটি শেষ হয়েছে আমার, একটা দরখাস্তও দেওয়া হয়নি তারপর থেকে, আর এদিকে দিনরাত অস্থির তোমার চেলা-চামুণ্ডাদের জ্বালায়—কবে আসছেন তাদের দেবাদিদেব মহাদেব, কোন কাণ্ড-জ্ঞান যদি থাকত তোমার!

ডিম-রুটি চিবুতে চিবুতে মহাদেব নির্বিকার মুখে জবাব দিল, বোটটা হাত-ছাড়া হয়ে গেল, কি আর করা যাবে, নইলে দিন তিনেক আগেই আসা যেত।

বোট হাতছাড়া হল কেন? ইন্দুমতীর স্বাভাবিক প্রশ্ন।

চায়ের পেয়ালা হাতে আমিও কেন জানি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম একটু। কাণ্ড-জ্ঞান না থাকার অনুযোগে চুপ করে থেকে চা খেতে খেতেই বোট হাতছাড়া হওয়ার ব্যাপারটা মহাদেব অনায়াসে এড়াতে পারত। তার বদলে সে যেন ইচ্ছে করেই একটা জটিলতার মধ্যে নাক গলালো। কিন্তু প্রশ্ন শুনে মহাদেব এতটুকু বিব্রত হয়েছে বলে মনে হল না। ধীরে সুস্থে মুখ-গহ্বরের বস্তু জঠরে চালান দিয়ে বিনা ভণিতায় শাদামাটা সত্যি কথাটাই বলে দিল।—ডোরা মার্থা ওরা বোটে করে নিকোবরে গেল যে হেওয়ার্ডকে নিয়ে···।

দু'চোখ এবার আপনা থেকেই ধাওয়া করল ইন্দুমতীর মুখের ওপর। কিন্তু সে মুখে নিগূঢ় ভাবান্তর বা বর্ণান্তর দেখলাম না। বরং অবাক হয়ে চেয়ে থেকে সে যেন মহাদেবের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার বহরটাই দেখতে লাগল। তারপর হেসে ফেলে আমার দিকে ফিরে বলল, পোর্টব্লেয়ারের মেয়েদের এমন বন্ধু আর দু'টি দেখবেন না—আমাকে এই জংলা-দ্বীপে ফেলে রেখে উনি নিশ্চিন্ত মনে বোট দাতব্য করে বসলেন?

মহাদেবও হাসছে। ইন্দুমতী আবারও তাকেই জিজ্ঞাসা করল, আমার অফিসে খবর-বার্তা কিছু দিয়ে এসেছো তো, না কি তারও সময় পাওনি?

এবারে একটু বিরস মুখেই জবাব দিল মহাদেব, অফিস অফিস করছ কেন, তুমি কি আর চাকরি করতে যাচ্ছ নাকি?

বেশ। ইন্দুমতীর পেরে ওঠা দায় যেন, যতদিন নামটা আছে, একটা নিয়ম বলে তো আছে কিছু— না কি?

হ্যাঁ, বরাবরই খুব নিয়ম মেনেছ; বাকি এখন। স্পষ্ট বিরক্তির সুর মহাদেবের।

ইন্দুমতী সেটুকু উপলব্ধি করেও উৎফুল্ল নেত্রে চেয়ে রইল খানিক। পরে হালকা

তর্জনই করে উঠল প্রায়, ভদ্রলোকের সামনে যা-তা বোলো না বলছি, তোমার পাল্লায় পড়ার আগে অফিসের ব্যাপারে কবে কোন্ অনিয়ম করেছি শুনি ?

অনিয়মের ফিরিস্তি দেওয়ার জন্য একটুও ব্যগ্র মনে হল না মহাদেবকে। ধীরেসুস্থে চা-পানে রত হল। ওদের এই নিজস্ব বাগ্ বিতণ্ডার মধ্যে সদ্য-আগত তৃতীয় ব্যক্তির শ্রোতার ভূমিকা শুধু। কিন্তু একেবারে বোবা হয়ে বসে থাকাটাই ইন্দুমতীর প্রসঙ্গ পরিবর্তনের কারণ হল বোধ হয়।

—যাক্। এক ঝলক হেসে তৃতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে সচেতন হল সে।—আপনি কথা-বার্তা কম বলেন না কি ? আমি কিন্তু ফাঁক পেলেই ঝগড়া করি !

সভয়ে বললাম, সকলের সঙ্গেই ?

ইন্দুমতীকে খুব জব্দ করা গেছে ভেবে মহাদেব খুশি হয়ে উঠল—কেমন ? আমিও বোকার মত ঝগড়া করি বলেই তোমার খুব সুবিধে।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চেপে দু'চোখ টান করে ইন্দুমতী খানিক চেয়ে রইল তার দিকে। পরে টেনে টেনে বলল, আর কখ্খনো ঝগড়া করো না তাহলে !

চায়ের পর আবার উঠানে নেমে মহাদেব জাঁকিয়ে বসল নতুন কলোনীর সমাচার শোনাতে। লোকজন বেশির ভাগই চলে গেছে। দুই একজন শুধু বেড়া বাঁধছে। অদূরে কুড়ি বাইশ বছরের একটি ছেলেও বসে। দেখতে ভদ্র গোছের। এদিকেই চেয়ে আছে চুপচাপ !

মহাদেব সোৎসাহে বলল, পাঁচ বছর বাদে এসো আবার, এই দ্বীপের চেহারা দেখবে তখন—

ইন্দুমতী টিপ্পনী কাটল, ছাই দেখবেন। রাজ্যের কুঁড়ে এখানকার লোক সব বুঝলেন, মাটি খুঁড়লেই সোনা ফলে এমন মাটি এখানে, অথচ নেহাত দরকারের বাইরে কেউ কুটোটি সরাবে না—ছিরি দেখছেন না চারদিকের !

মহাদেব উষ্ণ হয়ে উঠল এটুকুতেই।—ছিরি অমনি একদিনে বদলালেই হল, কাজ করার আনন্দ ওরা কি জানে এখন ? তাছাডা গোটা দ্বীপে চল্লিশ জন কাজের লোকও তো নেই এখন পর্যন্ত !

তর্ক না করে মুখ টিপে হাসতে লাগল ইন্দুমতী। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দুপুরের আহারের তদারক করে আসছে। বিকেল চারটের মধ্যে আবার আমাদের বোটে গিয়ে ওঠার কথা। কেউ না বলে দিলেও অনুমান করছি, ইন্দুমতীও আমাদের সঙ্গেই পোর্টব্লেয়ারে ফিরবে।

দ্বীপের কথাই শুনছি। সবসুদ্ধ বিয়াল্লিশটি পরিবার এসেছে এখানে, মোট সংখ্যা দু'শ একজন, মেয়ে পুরুষ বুড়োবুড়ি কাচ্চা বাচ্চা সব ধরে—

—ঠিক বললে না, লোক এখন সবসুদ্ধ দু'শ চারজন। উচ্ছ্বাসের মুখে ইন্দুমতী বাধা দিল আবার।

দ্বীপ সম্বন্ধে এই সামান্য বিতর্কও মহাদেব বরদাস্ত করার পাত্র নয় দেখলাম। রীতিমত বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, জানো না যখন আন্দাজে বোলো না, নিজে দাঁড়িয়ে একজন একজন করে গুনেছি আমি।

—ঠিকই গুনেছ। কিন্তু পরশু রাতে যে হালদার,বামুনের ছেলে হয়েছে সে আর তুমি জানবে কি করে?

—ও...। খানিকটা পরাস্ত হয়েও তর্ক করতে ছাড়ল না মহাদেব, তাহলেও তো দু'শ দু'জন হল!

—তুমি আমি থাকছিনে এখানে!' হাসতে হাসতে ইন্দুমতী রান্না দেখতে চলে গেল।

—দেখলে? প্রায় হতাশার সুর মহাদেবের, এই করে ও আমার সঙ্গে।

মনে হল, এই করে বলেই যেটুক আকর্ষণ ইন্দুমতীর। হাসি খুশি কৌতুকের পালিশটুকুই আশা করেছিলাম, নিটোল প্রাচুর্য দেখব ভাবিনি।

দ্বীপ-সমাচার না শুনিয়ে ছাড়বে না মহাদেব। সরকারী মুরুব্বিদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে আশী টাকা মাইনের পাটোয়ারী এনেছে একজন—দ্বীপের ভালোমন্দ দেখাশুনার দায়িত্ব তার। তারপর পাস করা কম্পাউণ্ডার এনেছে পঞ্চাশ টাকা মাইনের, আর ম্যাট্রিক পাস মাস্টারও এনেছে একজন চল্লিশ টাকা মাইনের। অদূরের ভদ্র-চেহারার ছেলেটিকে দেখিয়ে দিল, ও-তো মাস্টারই।

দেখলাম। মাস্টারের চোখ ইন্দুমতীর রান্নার ছাপরা ঘরের দিকে! ইন্দুমতীর রন্ধনরত লঘু তৎপরতাই দেখছে বোধ হয় নিবিষ্টচিত্তে।

কিন্তু মহাদেব এদিকে ভালো হাতে চড়াও করেছে আমাকে।—জায়গা দিতে না পেরে তোমরা তো এখানে লোক পাঠিয়ে বাঁচছ, আর এরাও এখানে গরু ছাগলের মত তাদের ধরে ধরে এক একটা দ্বীপে চালান দিয়েই খালাস। তারপর? তারপর কী?

জলজ্বল করছে তার দুই চোখ, উত্তেজিত দেখাচ্ছে।—কি করবে এরা এখানে? জঙ্গলে শিকার করবে আর সমুদ্রে মাছ ধরবে। সমাজ নেই ধর্ম নেই শিক্ষা নেই—শুধু দুটো খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকা—দশ বছর এভাবে থাকলে এরাই জংলী হয়ে যাবে না তো কী?

এতবড় উচ্ছ্বাসের মুখে আবারও বাদ সাধলে ইন্দুমতী। বলল, তুমি তো দিব্বি গল্প ফেঁদে বসেছ, একটু মাছও কেউ দিয়ে গেল না এখন পর্যন্ত, ভদ্রলোককে

কি দিয়ে খাওয়াই আমি ?

বললাম, যা দেবেন তাই চলবে, এজন্যে আপনি ব্যস্ত হলে ভদ্রলোক বিব্রত হবে।

ইন্দুমতী কানে তুলল না, হাঁক দিল, ওহে মাস্টার এদিকে শোনো না, হাঁ করে দেখছ কী ?

অদূরের ছেলেটি শশব্যস্তে উঠে এলো।

—একটু মাছের খোঁজ করো না, নয়তো একটু হরিণের মাংস পাও কি না দেখো।

মাস্টার এমনভাবে ছুটল যেন ও দুটোর একটা না পেলে সমূহ বিপদ। হাসতে হাসতে ইন্দুমতী বসে পড়ল, বলল, নাকের নিচে কালো দাগ পড়েনি এখনো, ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকতে ওস্তাদ, জায়গার গুণ যাবে কোথায় !

পরিবেশ বিশেষে স্থূল পরিহাসও স্থূল মনে হয় না ততো। মহাদেবও না হেসে পারল না। বলল, দুটো খেতে পাওয়ার আশায় বসে থাকে ছেলেটা, ওর সঙ্গেও না লেগে ছাড়বে না !

—লাগাই যে স্বভাব।

আপাতত হাতের কাজ শেষ করে এসেছে বোধ হয়। খানিকটা তফাতে তাজা ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

—তারপর দ্বীপের মহিমা শুনলেন সব ?

প্রশ্ন আমাকে লক্ষ্য করে।

—সব আর কোথায় শুনলাম, এতে আপনার রোল কী ?

ঠোঁট উল্টে দিলে।

—যেমন দেখছেন, রান্নার চিন্তা করা, খাওয়ার চিন্তা করা, আর বকুনি খাওয়া, ব্যস।

মহাদেব হঠাৎ বলে বসল, আচ্ছা সেই থেকে তুমি ওকে আপনি আপনি করে বলছ কী ?

—হল তো ? ইন্দুমতী হেসে উঠল, নিন এবারে এগোন এক ধাপ।

এগোন সহজ নয়। কিন্তু এর পর সঙ্কোচও বড় থাকে না। নতুন করে আবার কোনো প্রসঙ্গ জমে ওঠার আগেই মহাদেব উঠে দাঁড়াল। কিছু একটা মনে পড়েছে বোঝা গেল। বলল, তুমি বোসো, আমি চট করে ঘুরে আসি একটু—

আমাকে বলতে হল না, ইন্দুমতীই বাধা দিল, তোমার ঘুরে আসা মানে তো দিন কাবার, এখন আবার যাচ্ছ কোথায় ?

—হালদার বামুনের ছেলে হয়েছে বললে, কেমন আছে না আছে দেখে

আসি, বেশিক্ষণ লাগবে না, এলাম বলে—।

বেড়া পেরিয়ে জংলা পথে লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর সঙ্গ নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু যে কাজে যাচ্ছে, শুনে সঙ্গী হওয়ার বাসনাটা ব্যক্ত না করে ফেলে বাঁচলাম। এদিকে ইন্দুমতী হাসছে আবার। বলল, মজা দেখুন, আগে পোর্টব্লেয়ারে কোনো রিফিউজির ছেলেপুলে হয়েছে শুনলে রেগে আগুন হয়ে উঠত, এখন ছুটল দেখতে।

বললাম, আগের মহাদেব বদলেছে।

উৎফুল্ল চকিত দৃষ্টি মেলে ইন্দুমতী না-বলা আভাসটুকু আহরণ করে নিল যেন। লঘু আলাপের ফাঁকে অন্য পথ ধরল তারপর। বলল, পোর্টব্লেয়ারে এ ক'দিন কাটালেন কেমন বলুন—

—ভালই তো··

—হাই সোসাইটির সঙ্গে আলাপ-সালাপ হল ?

জবাবে হেওয়ার্ডের কথা বলতে পারতুম, ডোরা মার্থার কথাও বলা যেত। মা-শাইন·· না মা-শাংন হাই সোসাইটির মধ্যে পড়ে না। সকলকেই বাতিল করে দিয়ে বললাম, এখনো হয়নি।

—রক্ষে। মুখ টিপে হাসল ইন্দুমতী, হলে আর আসতেন না বোধ হয়।

মহাদেব সামনে থাকলে কেমন লাগত বলতে পারিনে। পোর্টব্লেয়ারে সাণ্টু ঘোষের আতিথ্য নিয়ে আছি শুনেই যে ছদ্ম ভীতি-বিন্যাস দেখা গিয়েছিল তার মুখে, সেটা খারাপ লাগেনি। কিন্তু এবারে তেমন লাগল না। বরং মনে হল, নিজেকে নিয়ে প্রিয়দর্শনার এই ইঙ্গিতময় কৌতুকের মধ্যে এক ধরনের আত্মতুষ্টি প্রচ্ছন্ন।

হাসি মুখেই পাল্টা জবাব দিলাম, না আসার হলে একা সাণ্টু ঘোষই তো যথেষ্ট !

ইন্দুমতী সভয়ে বলল, তাও তো ঠিক·· ভুলে গেছলাম !

বলল বটে, কিন্তু চাপা হাসির ছটা বাড়ল আরো। তার উৎসুক দৃষ্টি আমার মুখের ওপর সরাসরি বিচরণ করে বেড়াল দুই একবার। কি আঁচ করল সেই জানে। মহাদেব উঠে যাওয়ার পর থেকেই স্বস্তি বোধ করছিলাম না খুব।

দিব্বি সহজভাবেই ইন্দুমতী কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল আবার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরোয়া প্রশ্ন জুড়ে দিল সে। কলকাতায় কোথায় থাকি, বিয়ে করেছি কি না, বউ দেখতে কেমন, কে কে আছে বাড়িতে, হঠাৎ আন্দামানে বেড়াতে আসার শখ হল কেন, ইত্যাদি। আলাপ করা নয়, আলাপ রসানো। তার

এই সাধারণ কৌতূহলেও এক ধরনের প্রাণ আছে, যার রেশটুকু আন্বেষী কানে মিষ্টি লাগে। জানতে চাওয়ার মধ্যে নীরস জানাটাই যেন সব নয়।

দূর থেকেই স কলরবে প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করল মহাদেব। মেজাজ প্রসন্ন খুব। কাছে এসে সোৎসাহে বলল, দেখে এলাম, বেশ হয়েছে—এই দ্বীপের প্রথম ছেলে—নজর রাখতে হবে ছেলেটার ওপর।

হা'সি চাপা দায়। কিন্তু ইন্দুমতী যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। ভ্রূ-ভ'ঙ্গি করে দেখল একটু, তারপর বলল, মহাদেবের নজরে থাকলে নন্দী-ভৃঙ্গীর একজন হতেও পারে, ওদের সবসুদ্ধ আমি পোর্টব্লেয়ারে তাড়ালাম বলে।

জব্দ হযে মহাদেব একটা নিরুপায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আমার দিকে। পবে এমন ভাবে ফিবে তাকালো অ-প্রিয়ভাষিণীর 'দকে, যার স্পষ্ট অর্থ, আব কেউ এখানে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, এরকম বেয়াদ'পি বলে হাতে-নাতে শাস্তি না 'দিয়ে তার উপায় নেই।

—ধ্যেৎ! মহাদেব এক পা এগোবার আগেই উঠে একেবারে তিন হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দুমতী।

মা-শাইনের সঙ্গেও ইন্দুমতীর তফাৎটুকু স্পষ্ট হয়ে আসছিল অনেকক্ষণ ধরেই। 'কন্তু সেটা ঠিক চোখে পড়ার মত নয়, উপলব্ধি করার মত।

দুপুরের খাওয়ার পর্বটা জমে উঠে'ছিল। মাস্টার মাছ এবং মাংস দুই-ই এনে ইন্দুমতীর কাছে ধমক খেয়েছে। কখন রান্না হবে কখন খাওয়া হবে? একটু কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকত! আবার খাওয়ার সময়েও তাকে ধমকেই খাইয়েছে সব থেকে বেশি।

কিন্তু এর পরেই সব কিছুতে হঠাৎ যেন রূঢ় ছন্দপতন ঘটে গেল একটা। এমন যে, আমি সুদ্ধ হকচকিয়ে গেলাম একেবারে। মাত্র ঘণ্টাকতক আগে চা খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা নিয়ে ইন্দুমতী এবং মহাদেবের রসালো বাগ্‌বিতণ্ডা শুনেছি। মহাদেব বলে'ছিল সে-ই শুধু বোকার মত ঝগড়া করে বলে ইন্দুমতীর খুব সুবিধে। কিন্তু ঝগড়া যখন করে, কতটা করে, তাব নিজেরও ধারণা নেই বোধ হয়। চোখে না দেখলে আর কানে না শুনলে আমারও থাকত না।

খাওয়া দাওয়ার পর মাস্টারের সঙ্গে জায়গাটা চট করে একটু ঘুরে দেখে আসার জন্য পা বাড়িয়েছিলাম। ইন্দুমতী তার সবজী বাগান দেখাবার জন্য উঠোনের পিছনের দিকটায় নিয়ে এলো। অনেকটা জায়গা জুড়ে ঢ্যাঁড়স বেগুন কুমড়ো মিঠে আলুর চাষ। এর পরেই খানিকটা ফাঁকা চষা জমি।

ইন্দুমতী বলল, এইখানটায় ফুলের বাগান হবে।

সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি উদ্‌গিরণ পিছন থেকে।—কে বললে এখানে ফুলের বাগান হবে ?

প্রায় চমকেই ফিরে তাকালাম সকলে। মহাদেব পিছনে দাঁড়িয়ে। একটা ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতা যেন ঠাস করে কানে এসে ঢুকল। এগিয়ে এসে আবার চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, এখানে ফুলের বাগান হবে কে বলেছে ?

আমি হতভম্ব। ওর পোর্টব্লেয়ারের বাড়ির সুন্দর বাগানটা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

ইন্দুমতী ধীরে সুস্থে জবাব দিল, আমি বলেছি।

আগুনে ঘিয়ের ছিটে পড়ল যেন।—না, ও ফুলের বাগান টাগান হবে না এখানে।

ইন্দুমতী শান্ত নেত্রে চেয়ে রইল দু'চার মুহূর্ত —কেন হবে না ?

পারলে জমিটা পায়ে করেই চষে দেয় মহাদেব।—আমি বলছি তাই হবে না। ফুলের বাগান হলে এখানকার লোকেরা আলাদা করে দেখবে আমাদের। ঘুরে দাঁড়িয়ে হুকুম জারি করল, মাস্টার, কালই বীজ ছড়াবে এখানে, আলু বেগুন কুমড়ো যা পাও।

মাস্টার একদিকে ঘাড় কাত করল।

ইন্দুমতী বলল, আমরা আলাদা যখন, ফুলের বাগান না হলেও লোকে আলাদা করেই দেখবে। মাস্টার, এ জায়গা এমনি পড়ে থাকবে !

মাস্টার অন্যদিকে ঘাড় কাত করল।

রাগে ক্ষোভে মুখের রঙ পর্যন্ত যেন বদলে গেল মহাদেবের। অস্ফুট স্বরে বলল, এভাবে চললে তোমার সঙ্গে আমার পোষাবে না বলে দিলাম।

—না পোষায় সরে পড়ো, আমিও আর ফিরছিনে পোর্টব্লেয়ার থেকে।

রাগে গরগর করতে করতে বাগানের আর একদিকে চলে গেল ইন্দুমতী।

আর মাচার ঘরের দিকে হনহনিয়ে প্রস্থান করল মহাদেব।

আমরা দু'জনে নির্বাক হতবুদ্ধি। এত তুচ্ছ কারণে এমন মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটে যেতে পারে কল্পনার বাইরে। মাস্টারের সঙ্গে পায়ে পায়ে কখন এগিয়ে চলেছি টের পাইনি। মাস্টারটি যে বোবা নয় এই প্রথম জানা গেল। বলল, দাদা ভালোমানুষ কিন্তু ওই রকম রাগ, দিদিকে বড় বকেন।

তার মুখের দাদা আর দিদিটুকু কেন জানি ভালো লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, আর তোমার দিদি ?

—দিদি মোটে কেয়ারই করেন না, একটু কেয়ার করলে বোধ হয় দাদা অত বকতেন না।

সাদা মনেই বলেছে কথা ক'টা। কিন্তু এরই থেকে গভীর একটা ইঙ্গিত উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। কি সেটা, সঠিক হদিস পেলাম না। শুধু মনে হল, এই পথ ধরে ভাবলে মহাদেবের এমন বিসদৃশ আচরণের হেতু খানিকটা স্পষ্ট হতেও পারে।···মা-শাইনের সামনে এক রকম দেখেছি ওকে। রাগ-দ্বেষ দূরে থাক, ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার মূর্তি যেন। আবার আর এক রকম দেখেছি ডোরা মার্থার সংসর্গে। সেই লঘু চপলতার মধ্যেও সুস্থ সহজ মনে হয়েছে তাকে। কিন্তু এখানে এ কি কাণ্ড!

ভাবনা স্থগিত রেখে আপাতত যা চোখে পড়ছে তাই দেখছি। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে খাপছাড়া জীবনের চিহ্ন। এই মানুষদের প্রসঙ্গে মহাদেবের জ্বলজ্বলে চোখ আর উত্তেজনা চোখে ভাসছে। এমন নীরস বাঁচা আর দেখিনি। এই বাঁচাটুকুই সার্থক করে তোলার স্বপ্ন দেখছে ওরা। মহাদেব আর ইন্দুমতী। ···কিন্তু সামান্য ফুলের বাগান নিয়ে যা ঘটে গেল, আর মুখ দেখা দেখি হবে কিনা সন্দেহ।

আলাপ পরিচয় হল দু'চার ঘর লোকের সঙ্গে। দ্বীপে নতুন একজনের আগমন-বার্তা সকলেই জানে। কিন্তু এসে আজই চলে যাব সে-জন্যেই খেদ তাদের। বয়স্ক মেয়ে-পুরুষ সকলেরই একটাই নীরব বা সরব প্রশ্ন, আবার কবে আসব? এদের জীর্ণ মূর্তি আর জীর্ণ বসবাসের অবস্থা দেখে গোটা দ্বীপটাকেই জরাজীর্ণ মনে হতে লাগল। দেশ-খোয়ানো, ঘর-খোয়ানো আবর্তের শেষ ধাক্কায় এখানে এসে এরই মধ্যে একটুখানি অনড়-অবস্থানের আশা বুকে বেঁধে বেঁচে আছে সব। তাই চেনা হোক অচেনা হোক, কেউ এলেই আত্মীয়জ্ঞানে ধরে রাখতে চায়। আর, কেউ যাবে শুনলেই বুকের খানিকটা খালি হয়ে যায়।

তাদের সুবিধে অসুবিধের খোঁজ-খবর নিতে মহাদেব আর ইন্দুমতীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় উছলে উঠল তারা। অসুবিধে থাকবে না বেশি দিন। কারণ, মহাদেব নয়—স্বয়ং শিবঠাকুর যেন চোখ মেলে চেয়েছেন তাদের দিকে। আর হলই বা একটু আধটু অসুবিধে, অমন মা-বাপ কাছে থাকলে অসুবিধে ভোগ করেও আনন্দ।

নিজের অগোচরে কি একটা অনুভূতি গুমরে উঠতে চাইছে ভিতর থেকে। আনন্দের কি বেদনার জানিনে। বোধ হয় দুইয়েরই···। সেই সঙ্গে আর একটা সত্যও যেন খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। মানুষের সমাজ গড়ে ওঠে সেখানকার

সমষ্টিগত মনের প্রতিকৃতি নিয়ে। পোর্টব্লেয়ারে এক ধরনের সমাজ দেখেছি। এখানেও গড়ে উঠছে একটা। অন্তত গড়ে উঠবে বলে আশা। এখানকার এই নারী-পুরুষেরাই হয়ত একদিন তাদের নিশ্চিন্ত জীবনে কুৎসা কানাকানি রেষারেষির মধ্যে দিন-যাপন করেছে। কিন্তু আজ মহাদেব আর ইন্দুমতীর ব্যক্তিগত সংসর্গ-জটিলতার পাশাপাশি বসবাস করেও সে-সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র অনাবৃত কৌতূহল নেই। তারা শুধু মা-বাপ ওদের। এরা অনেক হারিয়েছে, আবার এই জীবন-সার্থকতারই গভীরতম প্রয়োজনে অনেক নগ্নতা তুচ্ছতার ঊর্ধ্বেও উঠে এসেছে ভারি সহজেই।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এলাম আবার। রাগের মাথায় মহাদেব ততক্ষণে বোটে চেপে বসে আছে কিনা কে জানে। কাছাকাছি এসে মাস্টার আমাকে একলা ছেড়ে দিয়ে অন্য রাস্তা ধরল। বোধ হয় ভরসা পেল না আর আসতে।

পায়ে পায়ে মাচার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভেবেছিলাম, ওদের একজনকে দেখব মাচা-ঘরে, আর একজনকে (খুব সম্ভব ইন্দুমতীকে) দেখব কোনো গাছ তলায়। আর মনে হচ্ছিল, এ রকম একটা অস্বাভাবিক মনোমালিন্যের পাশ কাটিয়ে না বেরুলেই ভালো হত। কিছু না বলে সামনা সামনি হাঁ হয়ে আমাকে বসে থাকতে দেখলেও নিজেরাই হয়ত আত্মস্থ হয়ে লজ্জা পেত একটু পরেই। এই দেড় ঘণ্টার গুমোট অবকাশে ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটা আরো কতদূর গড়িয়েছে কে জানে!

দু'জনের একজনকেও বাইরে দেখলাম না। সাড়া দেবার মতলব করছি।

...তার আগেই পায়ের নিচে গোটা দ্বীপটাই নড়েচড়ে উঠল যেন।

কাঠের মাচা ঘরে ভারী পায়ের শব্দ। পুরুষের আসক্তি-জড়িত অস্ফুট হাসি। নারীর ঝাঁঝালো ব্যঙ্গানুকরণে প্রশ্রয়ের আভাস। অধিকরণ ও আত্মরক্ষণের অস্পষ্ট যুগ্ম প্রয়াস। নারীকণ্ঠের হালকা তর্জন।—ছাড়ো বলছি ভালো হবে না, ভদ্রলোক এসে পড়লে তখন!

জবাবে গুরু পতন-ভারে কাঠের নড়বড়ে চৌকিটার আচমকা আর্তনাদ।

দূরে অনেকটা নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে একটা বিশাল গর্জন-গাছের রূপ নিরীক্ষণ করছি। কিন্তু এই গাছপালা দ্বীপ সমুদ্র সব-কিছুর রূপ মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। জীবন আর জীবন গঠনের সকল স্বপ্ন পরিত্যক্ত বসনের মত এক পাশে পড়ে আছে। শাশ্বত এক নগ্ন চাহিদার ধক্‌ধক্‌ স্পন্দন শুনছে বিহ্বল প্রকৃতি। অতনু গ্রাসে সমস্ত রূপের বিলুপ্তি।

ফেরার সময় হল একসময়।

ইন্দুমতী আগে আগে বোটে গিয়ে উঠেছে। দ্বীপের অর্ধেক ভেঙে পড়েছে সমুদ্র-তীরে। মহাদেবকে ছেঁকে ধরে চিরকুট দাখিল করছে তারা। আবার আসার সময় কার জন্য কি আনতে হবে তার ফর্দ। না দেখেই একের পর এক সেগুলো পকেটে গুঁজছে সে। মহাদেব মহাজন ভালো, খানিক আগে ইন্দুমতী বলছিল, আগে জিনিস এনে দিয়ে পরে খদ্দেরের সুবিধে মত তার দাম পাবে— আর, অনেক ক্ষেত্রে খদ্দেবের দাম দেওয়ার সুবিধে মোটে হয়েই ওঠে না!

ফর্দ নেওয়া শেষ হতে মহাদেব মাস্টারকে একপাশে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বলল, ঐ জমিটা অমনি থাক এখন—

ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখেই হেসে ফেলল।—বোটে ওঠো, দাঁড়িয়ে কেন!

বোট ছেড়ে দিল।

ইন্দুমতী আর মহাদেব দু'জনেই আগের মতই হাসিখুশি আবার। যেন কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি কোথাও। অনর্গল কথা বলছে ইন্দুমতী। থেকে থেকে আমিই শুধু অস্বস্তি বোধ করছি কেমন।

জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখালো ইন্দুমতী।—ওই দেখুন কত হরিণ!

সত্যি অনেকগুলো হরিণ জঙ্গলের ভিতর থেকে মাথা বাড়িয়ে ভীরু চোখে এদিকেই চেয়ে আছে। বলার মত আবার কিছু পেল ইন্দুমতী। জানেন, আন্দামানে মাত্র চারটে হরিণ এনে ছেড়ে দিয়েছিল এক সাহেব, এর দুটো আর ওর দুটো—

মহাদেব নিরীহ মুখে বাধা দিল, এর দুটো আর ওর দুটো মানে?

ভ্রূ-ভঙ্গি করে ইন্দুমতী শুধু একবার তাকালো তার দিকে, জবাব দিল না। তারপর বলে গেল, সেই চারটে হরিণ থেকে আন্দামানের সব ক'টা দ্বীপ হরিণে ছেয়ে গেছে একেবারে, এখন হরিণ তাড়ানো সমস্যা একটা। মাত্র চারটে হরিণের কেরামতি দেখুন একবার—! ইন্দুমতী নিজেই হেসে উঠল এবার!

মহাদেব টিপ্পনী কাটল, এখানকার মানুষগুলোর কেরামতিও প্রায় এক রকমই!

ধেৎ, ভারি অসভ্য তুমি! ইন্দুমতী ঘুরে বসল।

এর থেকে অনেক স্থূল কৌতুকও খারাপ লাগেনি আগে। কিন্তু এখন সবই যেন বেসুরো ঠেকছে কানে। বোট বোধহয় ঘোরা পথে চলেছে এবারে। দু'পাশের জংলা দ্বীপ এখানে সমুদ্রকে একেবারে যেন প্রশস্ত একটা খালের মধ্যে এনে ফেলেছে। জলে বিদায়ী দিনের ছায়া। জল কালোই দেখাচ্ছে এখন। জলের রঙ, দ্বীপের রঙ, আর দিনের রঙ এক হয়ে আসছে। মন চাইছে আরো

দ্রুত আঁধার আসুক।

রাত্রি। অন্ধকার ঘরে বিছানায় বসে আছি চুপচাপ। জানালা দিয়ে দূরে মেরিনের জাহাজগুলো দেখা যাচ্ছে। গনগনে লাল দেখাচ্ছে আকাশের চাঁদটা। এমন অদ্ভুত লাল চাঁদ দেশে কোনোদিন দেখিনি। তার আলোয় ঝলসে ঝলসে উঠছে কালাপানির কালো জল।

ঘুম আসছে না। পাশের শয্যায় সাণ্টু ঘোষ ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। বেচারীর পা দুটো ভালো করে সারল না এখনো। নিজে দেখে শুনে বাজার করতে পারে না, ভালো মত খাওয়া-দাওয়া হয় না। আজ সে খেদ মিটেছে। ফকিরুদ্দিন কথা রেখেছে, মোগলাই খানা নিয়ে এসেছে।

শুধু খাওয়ার আনন্দ নয়, অনুমান আর এক উত্তেজনায়ও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল সাণ্টু ঘোষ। চিৎপাত হয়ে শুয়েছিল, আমার সাড়া পেয়ে ধীরে সুস্থে উঠে বসেছে। নিরীক্ষণ করে দেখেছে, মানুষটা ঠিকঠাক আস্ত ফিরলাম কি না। বশীকরণের বাতাস যদি লেগে থাকে কোথাও, ও-রকম চোখেই ধরা পড়বে। হ্যাভলকে যাওয়াব ব্যাপারে সে সরাসরি কোনো বাধা দেয়নি বটে, কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতটা চেষ্টা করার করেছে।

—হল বেড়ানো ?

—হল···।

—কেমন দেখলে ?

—বেশ—।

এরকম জবাব চায়নি। একটু অপেক্ষা করে আবার বলেছে, দেখে মুণ্ডু ঘুরেছে না ঠিক আছে ?

—ঠিকই আছে বোধহয়···। তোষামোদও করেছিলাম একটু, তোমাকে তো বেজায় ডরায় দেখি ইন্দুমতী, বললে, তোমার মত কড়া গার্ডিয়ান থাকতে আমি গেলাম কি করে হ্যাভলকে!

সাণ্টু ঘোষ চেয়ে ছিল একটানা। সে চাউনি দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম। যে কোনো একটা অনুকূল মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল বোধ হয়। রয়ে সয়ে বলল, আমাকে ডরাতে যাবে কেন, কত কে তলিয়ে গেল আমি আর কি··· তবে এবারে টনক নড়বে একটু, পাশা উলটেছে।

এ সুর চিনি। বলার মত শাঁসালো কিছুই সংগ্রহ হয়ে থাকবে ইতিমধ্যে। এরপর দম না ফুরনো পর্যন্ত হড়বড়িয়ে যা বলে গেল তার সারাংশ হল, ইন্দুমতীর

চাকরিটি গেছে। আজই নোটিস ইস্যু হয়েছে—শ্রীমতী এতক্ষণে পেয়ে থাকবেন সেটি। তার মুখখানা এখন একটুখানি দেখতে ইচ্ছে করছে ওর। চাকরি কচ্ছিল না তো এতকাল, যেন শ্বশুর বাড়ির বাঁধা ঘর—যখন খুশি এসে জুড়ে বসলেই হল। বলা নেই কওয়া নেই ডুব মারলেই হল একধার থেকে! অফিসের কর্তা কর সাহেব—শুভেন্দু কর—অনেকবার ওয়ার্নিং দিয়েছে, যতকাল নিজের একটু আশা ভরসা ছিল ভদ্রলোকের, সহ্য করেছে। কিন্তু এখন আর বরদাস্ত করবে কেন? ভয়টাই বা কি আর! ভয় করত মহাদেবকে, কিন্তু এ নিয়ে সে আর লাগতে যাবে কোন মুখে? নিজেই নাটের গুরু।

আজই হ্যাভলকে চাকরির ব্যাপারে ইন্দুমতীকে অনুযোগ করতে শুনেছি মহাদেবের কাছে। কিন্তু মহাদেব আমল দেয়নি। আর ইন্দুমতীও সত্যিই উতলা হয়েছে বলে মনে হয়নি আমার। হলে এত অনিয়ম করত না। নিতান্তই পর-নির্ভরশীলা নয়, অনুযোগের পিছনে সেই ইঙ্গিতটুকুই হয়ত প্রচ্ছন্ন ছিল।

আমার উক্তি আদৌ মনঃপূত হয়নি সান্টু ঘোষের। বলেছিলাম, তাতে আর কি, চাকরি তো এমনিতেই করত না আর, তুমিই তো বলেছিলে এবারে ফিরে এসে চাকরি ছেড়ে দেবে।

বেশ! এতবড় সংবাদের মুখে শ্রোতার মূঢ়-নিরুত্তাপ উত্তর বিরক্তিকর ওর কাছে।—চাকরি ছাড়া আর চাকরি গেকে ছাড়ানো এক হল নাকি? এখন প্রেস্টিজটা গেল কোথায়? পোর্টব্লেয়ারে কোনো অফিসের দরোয়ান চাপরাশীরও জানতে বাকি নেই লীলাময়ীর এত দাপটের চাকরিটি সাবড়ে দিয়েছে কর সাহেব, এখন তারাও হাসাহাসি করছে দেখগে যাও!

এদিকটা ভেবে দেখিনি। চাকরির জন্যে উতলা না হোক, চাকরির এই পরিণতিটা নিশ্চয় বাঞ্ছিত ছিল না ইন্দুমতীর। এখন মনে হচ্ছে, নিজের চাকরি প্রসঙ্গে হ্যাভলকে মহাদেবের প্রতি অনুযোগের পিছনে এই সম্ভাব্য শঙ্কাটাই হয়ত আসল কারণ। নিজে অবজ্ঞাভরে চাকরি ছাড়া আর একদা করুণাকটাক্ষ প্রত্যাশী ওপরওলার কলমের খোঁচায় চাকরি যাওয়া—পোর্টব্লেয়ারের সমাজে ইন্দুমতীর দিক থেকে এই দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত বইকি।

উড়ো জাহাজের সাহেবদের খাওয়া-দাওয়া আগেই চুকে যেতে ফকিরুদ্দিনের আজ গল্প করার মত ঢালা সময়ও ছিল হাতে। সান্টু ঘোষ তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেক পুরনো কাহিনী নতুন করে শুনলে ইন্দুমতীকে কেন্দ্র করে। হ্যাভলক থেকে ফিরে আসার পর আমার নিস্পৃহতা ওর ভালো লাগেনি। তাই ইন্দুমতীর সম্বন্ধে ওর ধারণাটা ফকিরুদ্দিনের মুখ দিয়ে আমার মধ্যেও পাকাপোক্ত

করে দেবার আগ্রহ। ওই মেয়ের সঙ্গে হেওয়ার্ডের মাখামাখির খবর ফকিরুদ্দিনের থেকে বেশি আর কে জানে? শুধু হেওয়ার্ড কেন, কত হোমরাচোমরা অফিসারের সঙ্গে ইন্দুমতীকে খানা খেতে দেখেছে ফকিরুদ্দিন নিজের চোখে।—হেওয়ার্ডের আগে কর সাহেবের সঙ্গে মাখামাখির ব্যাপারটাই একটু বলো না হে ফকির!

এই সবেরই এক একটা রসালো ফিরিস্তি দিয়েছে ফকিরুদ্দিন। অনেক-দেখা গাম্ভীর্যে নিরাসক্ত এজাহার দেওয়ার মত করে বলে গেছে। আগে পিছে ইংরেজী বুলি জুড়েছে পছন্দমত। শোনার আনন্দে বিভোর সাণ্টু ঘোষ, তাই বাধা দেয়নি। খাওয়া ফেলে এক একবার উৎফুল্ল দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করেছে আমার দিকে। অর্থাৎ, শুনলে? বোঝ এখন কেমন মেয়ে—।

শুনেছি। বুঝেছিও। ভালও লাগেনি। অথচ, এই ঘুমন্ত ঘরে ওই মেয়েটিই কেমন করে যেন ঘুম তাড়িয়েছে আমার চোখ থেকে। ইন্দুমতী পোর্টব্লেয়ারে ফিরেছে শুনে ফকিরুদ্দিনের মরা চোখও খুশিতে চকচকিয়ে উঠতে দেখেছি।··· কিন্তু কেন?

ও-পাশ থেকে নাকের ঘড়ঘড়ানি পুষ্ট হয়ে উঠছে। ইন্দুমতীর সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবকেও জাহান্নমের কাছাকাছি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ঘুমে ঢলে পড়েছে সাণ্টু ঘোষ। পোর্টব্লেয়ারে আসার পর থেকে এই এক মেয়ের প্রতি তার এই উগ্র হাবভাব আচরণে আমার মনেও যে একটা বাঁকা আঁচড় পড়েছে সেটা ও জানে কি?

আমিও জানতুম না। এখন অনুভব করছি। কলকাতার বাড়িতে ইন্দুমতীর সঙ্গে হেওয়ার্ডের প্রণয়োপাখ্যান শোনানোর সময় তো ওর কোনো বিদ্বেষ লক্ষ্য করিনি! বরং মজার ব্যাপারে স্বভাবসুলভ মজা পেতে দেখেছি। আর, এখানে মা-শাইন বা ডোরা মার্থার চটুল প্রসঙ্গেও আর যাই হোক, অনুদার রসবিকৃতিতে সে নির্মম হয়ে ওঠেনি কখনো। মহাদেবের বেলায় এমন হল কেন? শুধুই বন্ধু-প্রীতি? কি জানি···।

হতে পারে। আবার আর কিছুও হতে পারে। সাণ্টু ঘোষ বলেছিল মহাদেবের টাকার অঙ্কটা ইন্দুমতী ভালো করেই জানে। জানলে আর বন্দর বদল করবে না কেন! প্রেম তো নয়, প্রেম-বাণিজ্য।

কিন্তু···মহাদেবের এই টাকার অঙ্কটা শুধু ইন্দুমতী জানে না, জানে বোধ হয় সাণ্টু ঘোষও। হিসেবী মানুষ সাণ্টু ঘোষ। হিসেব করে চলে, প্ল্যান করে চলে। যে হিসেব জীবন-ভোগের চওড়া রাস্তা থেকে নিবৃত্তির অলি-গলিতে ঠেলে দেয়, সে হিসেব নয়। বরং ঠিক উল্টো তার। অদৃষ্ট-চক্রে নিবৃত্তির যে

সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে পড়ে আছে বাধ্য হয়ে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্তেই তার হিসেব, আর তার প্ল্যান। দেয়ালে কালী আর গণেশ মূর্তির অবস্থানও বোধ করি সেই কারণে। কম খরচে আর বিনা আয়াসে ফকিরুদ্দিনের মারফত রসনা-ভোগ্য আহার্য সংগ্রহের ফাঁক দিয়ে সাণ্টু ঘোষের হিসেবের তত্ত্ব কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

কলকাতায় একাধিকবার মহাদেবের সামনেই কেরানীর একঘেয়ে জীবনের প্রতি গভীর খেদ প্রকাশ করতে দেখেছি তাকে। সুযোগ সুবিধে হলে পোর্টব্লেয়ারেই ছোটখাট কোন ব্যবসায়ে লেগে পড়তে পারে এমন আভাসও দিয়েছিল। আব শোনামাত্র দুই চোখ কপালে তুলেছিল মহাদেব, তুমি ব্যবসায় নামলে পরচর্চা করবে কে হে!, যাই হোক্, মনে হয়, সাণ্টু ঘোষের এমনি কোনো একটা আশায় বাদ সেধেছে ইন্দুমতী। মহাদেবকে দখল করে কোনো একভাবে তার কিছু একটা হিসেব বরবাদ করে দিয়েছে।

ইন্দুমতী-হেওয়ার্ডের মাঝে হঠাৎ মহাদেব এসে উদয় হতে সবাই একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল শুনি। সাণ্টু ঘোষই বলেছিল। এমন যে, কানে শোনা দূরে থাক, চোখে দেখেও নাকি বিশ্বাস হয়নি প্রথম প্রথম। কিন্তু সত্যিই হেওয়ার্ডকে সরিয়ে কোথা থেকে মহাদেব এসে জুড়ে বসল গোটা আসর। শুধু সাণ্টু ঘোষের নয়, সকলেরই প্রচণ্ড বিস্ময়।

কখন হল? কি করে হল? কেমন করে হল?

সাণ্টু ঘোষ জানে না। ফকিরুদ্দিন জানে না। কেউ জানে না। আজ পর্যন্ত না।

রহস্য অনুদ্ঘাটিত বলেই কৌতূহলের সীমা নেই।

কৌতূহল আমারও। কিন্তু ভাবছি অন্য কথা। কাছাকাছি আসার মতই যোগাযোগ হয়ত ওদের ঘটেছে কোনো বিশেষ মুহূর্তে। কিন্তু শুধু সেই যোগাযোগের ফলেই কি রাতারাতি বদলে গেল মহাদেব? সে কি দেখল? কি পেল? সে বাঁধা পড়ল কেন? কলোনী গড়বে সেই আদর্শের প্রেরণায়? কিন্তু ইন্দুমতী আদর্শ সহচরী গণ্য হল কোন্ গুণে? নিছক মোহগ্রস্ততা? আট বছরের প্রতিকূলতার পরে? বিশ্বাস হয় না · লোকটা ঠুনকো নয় অত।

ইন্দুমতীর দিক থেকে অবশ্য একটা জোরালো স্বার্থের সন্ধান সাণ্টু ঘোষ দিয়েছে। শুধু সাণ্টু ঘোষ কেন, সকলেই তাই বলে হয়ত! প্রেম-বাণিজ্যে বন্দর-বদল করেছে ইন্দুমতী। ব্যস, আর কিছু না—কিছুই না। কিন্তু কেন জানি এটাই একমাত্র সত্যি বলে মন সায় দিচ্ছে না। হেওয়ার্ড-বর্জনের এমন

নজির সামনে সত্ত্বেও না।

ইন্দুমতীকে দেখার অনেক আগেই তার যে চিত্রটি আমার মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল, সেটা আর যাই হোক সুন্দর নয়। সান্টু ঘোষের তরল প্রশ্রয়ে সেই যৌবন-পসারিনী নারী-চিত্রটিই আরো অনাবৃত করে দিয়ে গেছে ফকিরুদ্দিন। আর হ্যাভলকে আজকের অভিজ্ঞতার শেষ পর্বেও অনভ্যস্ত ধাক্কাই খেতে হয়েছে একটা। কিন্তু এত সবের পরেও এই বিনিদ্র অবকাশে মনে মনে যে ইন্দুমতীকে দেখছি চুপচাপ, গাছ-কোমর শাড়ি জড়িয়ে মনের আনন্দে উঠোনে বেড়া বাঁধছে সেই ইন্দুমতী। যেটুকু দেখেছি আর যেটুকু জেনেছি তাই সব নয়। আরো কিছু আছে যা আমি দেখিনি, যা আমি জানিনে। অন্তত সেই রকমই ভাবতে ভালো লাগছে।

*

* *

এখানকার অভিজাত সমাজ, অর্থাৎ হাই সোসাইটির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ডের মারফত।

এসে পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠেনি। বোটানিকস্‌-এর ধারে হাওয়া-ঘরে দূর থেকে সেই একবার চোখোচোখি হয়েছিল শুধু। ইচ্ছে থাকলেও, ডোরা মার্থা তার সঙ্গে থাকার দরুন কাছে যেতে পারিনি। সেও ডাকেনি। হাত তুলে দূর থেকেই প্রীতি জ্ঞাপন করেছিল। হেওয়ার্ডের আগ্রহ থাকুক বা না থাকুক, আমার দিক থেকে প্লেনের অন্তরঙ্গ আলাপটুকু জিইয়ে রাখার তাগিদ ছিল। কারণ, এই দ্বীপের রাজ্য থেকে ফেরার পথেও সে-ই কাণ্ডারী।

আগে ভেবেছিলাম ফেরার সময় জাহাজ পাবো। কিন্তু জাহাজ যে কবে আসবে ঠিক নেই। তাছাড়া জাহাজের গতি-বিধির বিবরণ শুনে সে আশা ছাড়তে হয়েছে। দিন কুড়ি বাদে আসতেও পারে জাহাজ। এলে দিন ছয়েক পোর্টব্লেয়ারে অবস্থান করে এখান থেকে সমুদ্র-পথে মাদ্রাজ পৌঁছুবে। মাদ্রাজ থেকে জাহাজ ফিরে আসতে লাগবে দিন দশ বারো। আবার এখানে পাঁচ ছ' দিনের বিশ্রাম সেরে তার পর চার দিনের পথ কলকাতা। অতএব জাহাজের জন্য বসে থাকতে গেলে প্রায় দু'মাসের ধাক্কা আরো। তার অনেক আগেই হয়ত হেওয়ার্ডের চোখে সমুদ্রের ঢেউ আরো অনেক কমবে।...সান্টু ঘোষ ঠাট্টা করেছিল, পছন্দমত ঢেউ না কমলে জাহাজ ওড়ে না ক্যাপ্টেনের।

বেশ সকালেই বেরিয়ে পড়েছি। সোজা গেস্ট হাউসের উদ্দেশে নয়। আগে মহাদেবের বাড়ি, সেখান থেকে সুবিধে মত আসা যাবে গেস্ট হাউসে।

বললে মহাদেবও সঙ্গে আসবে কি ? আসতেও পারে, না-ও আসতে পারে—তার মতিগতি বোঝা ভার। উল্টে নিজে বিব্রত হওয়ার ভয়ে ওদের দু'জনকে সামনা-সামনি দেখার বাসনা বাতিল করে দিতে হল।

কিন্তু মনে মনে যে দুজনকে সামনা-সামনি দেখতে চাইছি এই মুহূর্তে তারা হেওয়ার্ড আর মহাদেব নয়। মহাদেব আর ইন্দুমতী। আজ তাদের বেশ ভালো রকমই একটা বোঝাপড়া আছে নিশ্চয়। কাল সে অবকাশ হয়নি, কারণ ইন্দুমতীর চাকরি যাওয়ার খবরটা কানে আসার আগেই কাল ছাড়াছাড়ি হয়েছে। বোট থেকে নেমে ইন্দুমতীকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে মহাদেব আমার সঙ্গেই ফিরেছে। চাকরি ছাড়ার বদলে চাকরি যাওয়াটা ইন্দুমতী মুখ বুজে বরদাস্ত করবে বলে মনে হয় না। পুরোপুরি মহাদেবকেই দায়ী করবে। আর যে-রকম মেজাজ দু'জনেরই, এ নিয়ে একটা বড দরের ঠোকাঠুকি লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়। পোর্টব্লেয়ারে আবার এক মজাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে সেটা। চড়াইয়ের পথে এগোতে এগোতে ভাবছিলাম, ফাঁক-মত মহাদেবকে একটু নরম হয়ে চলার পরামর্শ দেব। ইন্দুমতী রাগ করলেও এক তরফা কত আর করবে ?

দাঁড়িয়ে পড়তে হল। মন্থর পায়ে উল্টো দিক থেকে এগিয়ে আসছে যে ঢ্যাঙা লোকটা, তাকে চিনি। মুখে চুরুট গোঁজা, একটা হাত ঝুল কোর্তার পকেটে, অপর হাত নেই।

থ-মিন।

অন্যমনস্ক ছিল বোধহয়: একেবারে কাছাকাছি হতে মুখ তুলে দেখল। পকেট থেকে হাত বার করে বিনীত অভিবাদন জ্ঞাপন করল তৎক্ষণাৎ। এর আগে বাক্যালাপ হয়নি, তবু খুব পরিচিতের মতই জিজ্ঞাসা করলাম, থ-মিন যে! ভালো আছ তো ?

মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে জবাব দিল, জী···। হুজুর ভালো ?

—হ্যাঁ, এদিকে কোথায় গেছলে ?

ক্ষুদ্র উত্তর দিল, সাহেবের বাড়ি।

—সাহেব আছেন তো ?

মুখের ওপর গোল গোল নিস্পৃহ দুই চোখ রেখে বলল, না···এই একটু আগেই জিপ নিয়ে বেরুলেন, হুজুরের সঙ্গে পথে দেখা হয়নি ?

না তো! এই পথেই গেল ? আমি বেরুবার আগেই গেছে তাহলে···। কি ভেবে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গেছে জানো ?

মোটা চুরুট মুখে পুরে দিয়ে মাথা ঝাঁকালো থ-মিন। দাঁতে করে সেটা চেপে

আরো নিরাসক্ত মুখে বলল, মা-শাইনকে দেখতে।

একে এসময়ে এ-পথে দেখে, আর মহাদেব বেরিয়ে গেছে শুনেই কেন জানি তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু লোকটার জবাবের রকম-সকম কি রকম যেন। জামার অন্য হাতটা বাহুর গোড়া থেকে ঝুলছে আর হাওয়ায় দুলছে। পরের স্বাভাবিক প্রশ্নটাই নির্গত হল, মা-শাইন ভালো আছে তো?

মাথা নাড়ল থ-মিন, অর্থাৎ, ভালো নেই। হাতের মুঠোয় চুরুট নামিয়ে নিল আবার। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ভালো নেই শুনেই সাহেব দেখতে গেলেন।

এ-ভাবে খুঁচিয়ে কথা বার করার বিরক্তি সামলে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে মা-শাইনের?

—আমি জানিনে হুজুর, ডাক্তার বলতে পারে।

—ডাক্তার কি বলেছে?

নির্বোধ ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে রইল দু'চার মুহূর্ত।—মা-শাইন সাহেবকেই খবর দিতে বলেছে হুজুর, ডাক্তারকে খবর দিতে বলেনি!

থতমত খেয়ে ভালো করে তাকাতে হল তার মুখের দিকে। বোকা ভাবছিলাম একে! অতি-বিনয়ের আড়ালে সে যে বিদ্রূপ করে যাচ্ছে, এবারে বোঝা গেল। দাঁড়িয়ে আছে যেন অনুভূতিশূন্য মূর্তিটি। কিন্তু বিরূপ হওয়া দূরে থাক, নিজেরই হঠাৎ ভারি খারাপ লাগছে। তার চেয়ে এবারে স্পষ্ট দেখা গেল যাকে, সে প্রণয়-দূত অপরাসক্ত আপন প্রিয়-নারীর!

প্রথম দিন সাণ্টু ঘোষের সঙ্গে মহাদেবকে খুঁজতে বেরিয়ে মা-শাইনের দোকানে আসার কথা মনে পড়ে। মা-শাইন শেঠের সরাইখানায় গেছে শুনে বাইরে এসেই সাণ্টু ঘোষ এই লোকটার অজ্ঞতায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, মা-শাইন সরাইখানায় গেছে না তোমাকে কলা দেখাতে গেছে কে জানে! অর্থাৎ এমনই নিরেট তুমি, কি ঘটছে ভিতরে ভিতরে কিছুই খবর রাখো না। কিন্তু আজকের এই স্বল্প ক'টি কথায় লোকটার সম্বন্ধে এ ধারণা একেবারে গেল। উল্টো মনে হল, যে যাই করুক, এই লোকের চোখে ধুলো দিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। সে সব জানে, সব খবর রাখে—তার চেয়েও বেশি—সবটুকু উপলব্ধিও করে।

আত্মস্থ হয়ে সহজভাবেই বললাম, তাহলে আর গিয়ে কি করব, চলো ফেরা যাক্‌···আমি আবার গেস্ট হাউসে যাব একটু।

কাটা কাঁধের ঝোলানো জামার হাতটা অন্য হাতে করে কোর্তার পকেটে গুঁজে দিয়ে পা বাড়াল থ-মিন। রুক্ষ যোয়ান মূর্তির কাঁধের কাছে আমার মাথা।

মনে মনে ইচ্ছে, আলাপ সালাপ করি। কিন্তু মনিবের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে আমার প্রতিও যান্ত্রিক মর্যাদা প্রকাশে ত্রুটি নেই তার। পাশাপাশি চলা সত্ত্বেও ওর সম্ভ্রমের ব্যবধান এড়ানো সহজ হচ্ছে না। চুরুট টানছে বটে, সেটা এখানে সৌজন্য-বিরোধী নয় কিছু—এখানকার সমাজে স্বয়ং প্রভুর সামনেও ধূমপান চলে।

একটু বাদে সে-ই জিজ্ঞাসা করল, হুজুর গেস্ট হাউসে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ডের কাছে?

—হ্যাঁ, কেন বলো তো?

দু'চারটে টান দিয়ে চুরুট-পর্ব সমাপ্ত করে নিল আগে। শেষাংশ ফেলে দিয়ে হাতখানা জামার পকেটে গুঁজল।—সাহেব বলেছিলেন একদিন জলে নামতে হবে, কবে আপনাদের সময় হবে জানলে ক্যাপ্টেনকে খবর দিয়ে যেতাম।

মা-শাইনের দোকানে মহাদেব সেদিন ওকে বলে রেখেছিল, শেল-ফিশিং দেখাতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে ক্যাপ্টেনের কি সম্পর্ক বোঝা গেল না। বললাম, আমাদের আর সময় হওয়া-হওয়ির কি, তুমি যে দিন বলবে সেদিনই হবে—

নির্লিপ্ত মুখে বাধা দিল, সাহেব যেদিন হুকুম করবেন সেদিনই হবে।

শিষ্ট-বচনের ধার ধারে না বড়। তাছাড়া এই সাহেব আমি নই, মহাদেব। অতএব এড়ানো ভালো।—আচ্ছা তোমার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে রাখব'খন··· ক্যাপ্টেনকে তুমি কি খবর দিতে চাইছিলে?

—আমি জলে নামছি শুনলে তিনি দেখতে আসবেন।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ডাইভিং তাঁর ভালো লাগে বুঝি খুব?

এই বিষয়েও বাক্যালাপে তেমন উৎসাহ বোধ করল না থ-মিন। সামান্য মাথা নাড়ল শুধু। এখানকার সেরা ডুবুরী হিসেবে তার যত প্রশংসা শুনেছি তার চারগুণ নিবেদন করার পরেও আলাপ জমল না তেমন। শেষে শ্রদ্ধাপ্লুত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এক হাত নিয়ে এ-রকম পারো কি করে, অসুবিধে হয় না?

এটুকুও না বোঝার মত ছেলেমানুষ কিনা, ঘাড় ফিরিয়ে থ-মিন তাই যেন দেখে নিল এক পলক। পরে নিরুত্তাপ জবাব দিল, দুটো হাতের একটা হাত চলে গেলে অসুবিধে যেটুকু হওয়ার···হয়।

···মহাদেবকে নাকি অন্য হাতটি দেখিয়ে বলেছিল, সাহেব, এই হাতটা তো আছে। সেই রকমই একটা সবল জবাব আশা করেছিলাম। আর তার বদলে তারিফ করার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম। মনে মনে কিছুটা হতাশ হলেও থামতে ইচ্ছে করল না। বরং জানার আগ্রহ বাড়ল আরো। কেমন করে হাঙর

ধরেছিল, কতবড় হাঙর, কি করেই বা সেই কালান্তক যমের মুখ থেকে ফিরে আসতে পারল, ইত্যাদি।

এবারেও গায়ে কাঁটা দেবার মত কিছু শোনা গেল না ওর মুখ থেকে। সরাসরি মানুষ ধরে যে হাঙর সে কি আর ছোট হবে, বড়ই হবে।...বেঁচে এসেছে এই পর্যন্ত, কি করে বেঁচেছে মনে পড়ে না। কিন্তু এবারে এটুকু বলেই থেমে গেল না থ-মিন। নিজে থেকেই আরো কিছু ব্যক্ত করল, যা আর কখনো বলার সুযোগ হয়নি বোধহয়।...ভালো হয়ে উঠে টোপ ফেলে আর গুলী করে তারপর অনেক হাঙর মেরেছে সে। হাতের বদলে কম করে পনেরটা। কিন্তু এখন আর মারে না, কি হবে মেরে—তার নিজের দোষেই ও-রকম হয়েছে।... থ-মিন সেদিন সতর্ক ছিল না খুব, অন্যমনস্ক ছিল। কালাপানির জলে নেমে বিমনা হলে হাঙরে ধরবে না তো কি!

এক হাতে কোর্তার দু'দিকের পকেট হাতড়াতে লাগল থ-মিন। আবার চুরুট খুঁজছে বোধহয়। আমার সঙ্গে দুই একটা থাকলে ওকে দিয়ে খুশি হতাম। দোকানও নেই ধারে কাছে।

ঘটনার রোমাঞ্চ নয়, বীভৎস মৃত্যুর সঙ্গে যোঝাযুঝি করে বেঁচে আসাটাও নয়—ওই বিমনা হওয়াটুকুই মনে করে রেখেছে থ-মিন। কাটা হাতটার সঙ্গে মিশে আছে শুধু সেই বিস্মৃতির ক্ষত। নীরব জিজ্ঞাসাটা নিঃশব্দে গোপন করার তাগিদে দূরের সমুদ্র আর পাহাড়ের দিকে চোখ ফেরাতে হল আমাকে। কালাপানির সব আপদ বিপদ জানা সত্ত্বেও এমন অস্বাভাবিক অন্যমনস্কতার কারণ কী?

বলল না। বলার দরকারও নেই আর।

সেই অসতর্ক অন্যমনস্কতা নিঃসংশয়ে নারীর কারণে।

মুখ বুজে চলেছি। নিজের মনেই মাঝে মধ্যে শিসও দিচ্ছি একটু আধটু। যেন এমন কিছু বলেনি থ-মিন, আর আমিও এমন কিছু শুনিনি। ঝকঝকে সকালের আলোয় দূরে পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙ্গা বরফ-গুঁড়নো শাদার ছড়াছড়ি দেখার আগ্রহে বিভোর হওয়াটা বেমানান হচ্ছে না নিশ্চয়। ভাবছি, বাপ, তাড়া থাকে তো এগিয়ে যাক সে, আমি ধীরে সুস্থে আসছি।

বলার দরকার হল না। সামনেই বাঁকের মুখে দেখা গেল, ঘাড় গুঁজে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এদিকে আসছে সাণ্টু ঘোষ। বাঁচা গেল। কিন্তু এ সময়ে তো অফিসের তাড়ায় হাঁসফাঁস করার কথা তার!

দূর থেকে আমাদের অথবা আমাকে ফিরতে দেখে সেও বিলক্ষণ অবাক

হয়েছে বোধহয়। কষ্ট করে পা চালানো বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল। কাছাকাছি এসে থ-মিন নীরবে সেলাম জানালো তাকে। জবাবে সাণ্টু ঘোষ এক পলক দেখে নিল তাকে।

—কি ব্যাপার, তোমার অফিস নেই আজ?

সাণ্টু ঘোষ ফিরে তাকালো। জবাব দিল না, অথবা জবাব দেওয়ার দরকার বোধ করল না। বরং সে যা জানতে চায় সেটা আমার মুখ দেখেই বুঝে নিতে চেষ্টা করল। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল, মক্কেল বাড়ি নেই বুঝি?

মাথা নাড়তে প্রায় নীরস কণ্ঠেই বলে উঠল আবার, এই সাত সকালে কোথায় বেরুলো, বরফের খোঁজে?

থ-মিনের বোঝার কথা নয়। কিন্তু তার সাহেবকে নিয়ে ইঙ্গিতে কথা হচ্ছে কিছু, সেটা না বোঝার কারণ নেই। সেটুকুও ভাল লাগল না। সাণ্টু ঘোষও হয়ত নিরাশ হয়েছে কোনো কারণে, নইলে এ সময়টাকে সাত-সকাল বলত না। তার শ্লেষের তাৎপর্য, চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে ইন্দুমতী—তাকে ঠাণ্ডা করা এখন খুব সহজ ব্যাপার নয় মহাদেবের পক্ষেও।

দুর্মতি আমারও, তাড়াতাড়ি জানাতে গেলাম ওকে, মা-শাইন একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে খবর পেয়ে তাকেই দেখতে গেছে মহাদেব।

শোনামাত্র সাণ্টু ঘোষের গোল গোল দুই চোখ থ মিনের পালিশ করা মুখখানা চড়াও করল আবার। হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, মা-শাইন অসুস্থ হয়ে পড়েছে তোমার সাহেবকে সে খবরটা দিলে কে, তুমি?

কলের মত ঠোঁট নড়ল থ-মিনের। জী···।

—বলিহারি? ব্যঙ্গ করে উঠল সাণ্টু ঘোষ।—তা এবার কোথায় হাওয়া খেতে যাওয়া হবে? সমুদ্রে না পাহাড়ে?

অনুভূতিশূন্য কলের মূর্তির মতই তার দিকে চেয়ে রইল থ-মিন। বিরক্তিতে প্রায় ধমকে উঠলাম সাণ্টু ঘোষকে, কি আবোল-তাবোল বকছো? নরম গলায় থ-মিনকে বিদায় দিলাম, তুমি যাও তাহলে এখন, তোমার নিশ্চয় কাজ আছে।

দু'জনকেই আবার সেলাম জানিয়ে থ-মিন এগিয়ে চলল। সেদিকে চেয়ে মনে হল, সহিষ্ণুতার এমন নজির আর বোধহয় দেখিনি। সাণ্টু ঘোষ জানেও না, কোন নরম জায়গায় ঘা দিয়ে বসেছে। কালাপানির জলে নেমে অন্যমনস্ক হওয়ার বৃত্তান্ত না শুনলে আমিও সেটা উপলব্ধি করতে পারতুম না।

ভুরু কুঁচকে সাণ্টু ঘোষ যেন বাক্-যুদ্ধেই অবতীর্ণ হল এবার।—আবোল-তাবোল বকছিলাম খুব, না?

বোঝানোর বিড়ম্বনার মধ্যে না গিয়ে বললাম, তোমার কাণ্ডজ্ঞান কোনো কালে হবে না, লোকটাকে যত বোকা ভাবছ ততো বোকা নয়।

—ও…! মিটমিটে চোখে বিদ্রূপ ছড়িয়ে বলল, তুমি এরই মধ্যে চিনে ফেলেছো! তা মা-শাইনের কি অসুখ তোমার চালাক লোকটি বলেছে নিশ্চয়! বলেনি?

নিরুত্তরে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। সামনে খ-মিনকে দেখা যাচ্ছে না আর। জিব নেড়ে গোটাকতক আক্ষেপসূচক শব্দ বার করল সাণ্টু ঘোষ, বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—হৃৎরোগ…বিরহিণী আগেও দুই একবার ওমনি ভুগে স্টীম বোটে প্রায় ছ'সাত দিন মহাদেবের সঙ্গে খোলা সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে কোনরকমে সেরে উঠেছিল। সেই জন্যেই জিজ্ঞাসা করছিলাম, এবারেও সমুদ্র না, এবারে পাহাড়?

ওর জখম পায়ের গতি বেড়ে গেল একটু। তার পরেই গলা চড়িয়ে দিল।… পাহাড় সমুদ্র ছেড়ে এবার ওকে নিয়ে জঙ্গলে গেলেও অন্য সখীটির সঙ্গে আর পেরে উঠবে না মা-শাইন, তাই এবারে আর অসুখ সারছে না তার, বুঝলে?

হেসে ফেলতে হল শেষ পর্যন্ত।—তুমি আজ অফিস কামাই করলে কেন?

লজ্জা পেয়ে নরম সুরে বলল, এমনি…ভালো লাগছিল না।

হঠাৎ এরকম ভালো না লাগার হেতু কি সেটা চাপাই থাকল। ঠাট্টা বিদ্রূপে জব্দ হওয়ার মানুষ নয় সাণ্টু ঘোষ। সামনে গেস্ট হাউস। ফটকের ওধারে ছোট আঙিনা পেরিয়ে জাহাজ প্যাটার্নের মস্ত কাঠের দালান। বললাম, তাহলে আর তাড়া কিসের, চলো হেওয়ার্ডের সঙ্গে একটু ভাব জমিয়ে আসি।

প্রস্তাব শুনে মেজাজ আবারও একটু বিগড়ালো মনে হল। মুখ গোমড়া করে জবাব দিল, ভাব জমাতে গেলে ওদিকে আজ আর হাঁড়ি চড়বে না—এ পাট আজ মহাপ্রভুর ওখানেই সারা যাবে ভেবেছিলাম, সকালের বাজারটা পর্যন্ত করা হয়নি—দেখি আবার কাকে পাই এখন। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই বাবু গেলেন অসুখ সারাতে—

গজগজ করতে করতে খোঁড়া পায়ে এগিয়ে চলল সাণ্টু ঘোষ। যেতে যেতে বলল, ভাব জমাতে গিয়ে নিজেই যেন জমে যেও না আবার—

রাগ হওয়ারই কথা। ওর সমস্ত প্ল্যানই ভেস্তে গেল। কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছে। রক্ষা, আর একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি সে। তাকালে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হত।

জমে যেতে নিষেধ করেছিল। তাও এড়ানো গেল না।

ঢুকতেই সামনে মস্ত হল্। এদিকে ডাইনিং টেবিলের চারদিকে সারি সারি চেয়ার। মাঝখানটা ফাঁকা। অন্য দিকে বসার ব্যবস্থা।

সেখানে তাস খেলা চলেছে।

খেলছে হেওয়ার্ড আর ডোরা টমাস, বিপক্ষে অপরিচিত দু'জন ভদ্রলোক। তারাও অবাঙ্গালী। আরো দু'তিন জন পাশে বসে দেখছে। হেওয়ার্ডের পাশেই মার্থা বসে। হেওয়ার্ডের তাসের দিকে ঝুঁকে গভীর মনোযোগে খেলা দেখছে সেও।

দর্শকদের মধ্যে মার্থা ছাড়া অন্য দু'তিন জন শুধু এই অপরিচিত আগন্তুককে লক্ষ্য করল। খেলছে যারা, তারা তাসে মগ্ন। ভাবনা-চিন্তা দেখে মনে হচ্ছে, ডোরার খেলার অপেক্ষা। সে তাস ফেলতেই অস্ফুট আনন্দে হেসে উঠল বিপক্ষের দু'জন। থতমত খেয়ে মুখ লাল করে অনুমোদনের আশায় ডোরা তাকালো হেওয়ার্ডের দিকে। করুণ নেত্রে মার্থাও। হাল-ছাড়া একটা শব্দ নির্গত করে চেয়ারের কাঁধে মাথা রাখতে গিয়ে আমার দিকে চোখ পড়ল ক্যাপ্টেনের।

—হ্যালো—! অল্প হেসে মাথা নাড়ল একটু। বলল, সীট ডাউন। তারপর অসমাপ্ত খেলায় ডুব দিল। ডোরা দেখেও দেখল না, গম্ভীর মুখে তাস মেলে ধরল চোখের সামনে। হেসে কোমল হৃদ্যতা জ্ঞাপন করল মার্থা। তারপর খেলার দিকে দৃষ্টি ফেরালো।

কন্ট্রাক্ট ব্রীজ খেলা। হেওয়ার্ডের এ পাশের চেয়ার আর একটু কাছে টেনে বসেছি। দান শেষ হতে সে ঘাড় ফেরালো আবার।—কি খবর? কেমন কাটালে এ ক'দিন?

—খুব ভালো। সেই থেকে তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি তাই এলাম...।

—সো গুড অফ ইউ। পরের দানের তাস কাছে টেনে নিতে লাগল।—এই প্লেনেই ফিরছ তো আবার?

—হ্যাঁ, তুমিই ভরসা।

—আমিও ভরসা দিতে পারছি না খুব, সী ভয়ানক রাফ।

এ দানটা শেষ হলেই উঠে পড়ব ভাবছি। উল্টো দিকে মুখখানা প্রায় পাথর করে বসে আছে ডোরা। তার খেলার দুর্দশা দেখার লোক একজন বাড়ল দেখে বিরক্ত কিনা বুঝছি না।

কিন্তু তাস পরিবেশন শেষ হওয়ার আগেই আবহাওয়া বদলাল। হেওয়ার্ড নিস্পৃহ মুখে জিজ্ঞাসা করল, খেলতে জানো? আই মিন্ কন্ট্রাক্ট ব্রীজ...

সৌজন্যের খাতিরেই জিজ্ঞাসা করেছিল বোধ হয়। একটু-আধটু জানি শুনে

যথার্থ খুশি হতে দেখা গেল তাকে।

হেসে ডোরার উদ্দেশে বলল, সো ইউ আর রিলিভড্‌…। আমাকে ডাকল, কাম অন স্যার—

একজনকে খেলা থেকে উঠিয়ে আর একজনকে বসানোর প্রস্তাব কে আশা করেছিল! তাও যে-সে একজনকে নয়, ডোরা টমাসকে। অপ্রস্তুতের একশেষ—এমন হবে জানলে খেলতে জানিনে বলতাম। হেওয়ার্ড নিতান্তই বে-রসিক। নইলে ঘরোয়া খেলায় এমন সঙ্গিনী বাতিল করতে চায় কেউ!

শশব্যস্তে বাধা দিতে গেলাম। কিন্তু তাব আগেই গলা দিয়ে আনন্দ-ভব একটা শব্দ বার করে টক করে উঠে আর একটা চেয়ারে বসে পড়ল ডোরা টমাস। মুখ দেখে মনে হয়, ও বেঁচে গেল। খেলার জটিলতার মধ্যে ফেলে কেউ যেন এতক্ষণ ছড়ি উঁচিয়ে মাস্টারী করছিল ওর ওপর। মুক্তি পেয়ে গুরু-গাম্ভীর্য তরল হল এক মুহূর্তে। আমার দ্বিধা লক্ষ্য করে ব্যগ্র অভ্যর্থনা জানালো, ইউ আর রিয়েলি গ্যাল্যান্ট স্যার, কাম হিয়ার অ্যাণ্ড টিচ হিম এ গুড লেসন্‌।

সকলেই হেসে উঠল। ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ডও। ডোরা খেলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় মার্থারও খানিকটা দুশ্চিন্তা কেটেছে যেন। আপ্যায়নভরা দু'চোখ মেলে সেও হাসছে মৃদু মৃদু।

বসতে হল।

যে খেলার দরুন বাড়িতে মায়ের তাড়না এবং গৃহিণীর গঞ্জনা ভিন্ন আর কিছু জোটেনি, সেই খেলাই যেন এই লোকটির চোখে আমার নাবালকত্ব ঘোচাল। হেওয়ার্ড রীতিমত শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু খেলার থেকেও আমি অন্য মজা দেখছি। খেলতে জানুক বা না জানুক, দানে দানে ডোরা যেন স্পষ্টই আমার পক্ষ হয়ে হেওয়ার্ডের সঙ্গে লড়তে রাজী। আর মার্থার হাবভাব উল্টো। হাত থেকে এক একবার তাস ফেলতেই সশঙ্ক নেত্রে তাকাচ্ছে হেওয়ার্ডের মুখের দিকে। আমার খেলাটা ঠিক হল কিনা তার মুখভাব থেকে সেটা আঁচ করে নেবার চেষ্টা।

আর এক মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। কখন এসেছে টের পায়নি। দান শেষ হতে চোখ পড়ল। হেড কুক্‌ কবিরুদ্দিন। প্রায় অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিছু বলার প্রতীক্ষায়। কিন্তু তার চোখেও বিস্ময়ের আভাস। সাণ্টু ঘোষের ঘরের দোসর আমি, হাত সাফাই করে খানা খাওয়ায়, পোর্টব্লেয়ারের কেচ্ছা শোনায় সমান দরের লোকের মত—এখানে গেস্ট হাউসে বসে সে তাস খেলছে তার সাহেবের মত সাহেব হেওয়ার্ড সাহেবের সঙ্গে, বিস্ময় সেই কারণে

বোধ হয়। চাউনির ভাবার্থ, দর তো মন্দ নয় দেখি তোমার··· !

হেওয়ার্ড ঘাড় ফেরাতে সুগম্ভীর সেলাম ঠুকে প্রশ্ন করল ফকিরুদ্দিন, টী ওয়ানটেড সাব্ ?

যে ভাবে বলল, যদি জিজ্ঞাসা করত প্রাণটি দেবার গৌরব অর্জন করতে হবে কি না—তা হলেও মানাতো।

ডোরা প্রকাশ্যেই হেসে ফেলল। মার্থা হাসি চেপে ভুরু কুঁচকে শাসন করতে চাইল তাকে। হেওয়ার্ড দুই ঠোঁট চেপে সমজদার ওপরওয়ালার মত সপ্রশংস নেত্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে অভিষিক্ত করে তেমনি নিটোল ব্যঞ্জনা সহকারে জবাব দিল, ইয়েস, টী ওয়ানটেড !

—ও. কে, সাব্—টু মিনিটস। . .

সে ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ডোরা কলোচ্ছাসে তাকে থামালো আবার।—ইউ লিসন্, মি টী নট্ ওয়ানটেড !

ও. কে, মেমসাব !

ফকিরুদ্দিন গাম্ভীর্য-ভ্রষ্ট হল না একটুও। ফিরে চলল কর্তব্য সমাপন করতে। তাসের আসর তরল হয়ে এল আর এক দফা। হাসতে হাসতে ডোরা উঠে দাঁড়াল। মার্থার উদ্দেশে বলল, আমি যাব এখন, তুমি আসবে তো এসো।

এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল এটাই আশ্চর্য। মার্থার বোধ হয় ওঠার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ডোরাকে ছেড়ে দিয়ে সে একাই থাকতে পারে এমনও মনে হল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাত্রোত্থান করল সেও। কাউকে কোনো সম্ভাষণ না জানিয়ে কাঠের মেঝেতে খট-খট শব্দ তুলে তুলে ডোরা আগে আগে চলল। মার্থাও বলল না কিছু। যাবার আগে মুখের দিকে চেয়ে মাথা হেলিয়ে প্রীতি জ্ঞাপন করলে শুধু। অর্থাৎ, চলি, বড খুশি হয়েছি।

খেলা চলল আবার। কিন্তু আসর স্তিমিত হয়ে গেল অনেকটা। হেওয়ার্ড বাদে সকলেরই ঢিলে-ঢালা ভাব এলো একটা। ফকিরুদ্দিন হাতে হাতে চা পরিবেশন করে গেল। হেওয়ার্ড বলল, থ্যাঙ্ক ইউ !

খেলা শেষ হতে সানন্দ আগ্রহে হেওয়ার্ড বলল, বিকেলে তুমি ক্লাবে আসছ নিশ্চয়, আমি তোমাকে বাড়ি থেকে তুলে নেব, উই সেলডম ফাইণ্ড এ ফোর্থ ম্যান দেয়ার—সবাই রামি খেলতে চায়, আমার ভালো লাগে না, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম দেয়ার।

বাড়ির নিশানা জেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেস্ট হাউস কম্পাউণ্ডের বাইরে এলো সে। এত বেলা পর্যন্ত আটকে রাখার জন্য খেদ প্রকাশ করল একটু ! অন্তরঙ্গ

জনের মতই খোঁজ নিল আবারও, কেমন লাগছে এখানে, কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না, কি দেখলাম না দেখলাম এই ক'টা দিন, ইত্যাদি! তারপর উৎসুক নেত্রে মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তুমি হ্যাভলক ঘুরে এসেছ শুনলাম? ফকির বলছিল—

বিব্রত মুখে ঘাড় নাড়লাম।

—কেমন দেখলে? ইজ্ ইন্ট সি ওয়াণ্ডারফুল?

মুখে সেই ছেলেমানুষি নরম লজ্জার ভাব। এ প্রশ্ন আশা করিনি! যার কথা বলছে, প্লেনে তার সম্বন্ধে সোজাসুজি একটি কথাও হয়নি। না বোঝার ভান করতে পারতুম। কিন্তু সেটা নিষ্করুণ হবে আরো। চোখে চোখ রেখে হেসেই মাথা নাড়লাম আবার। না বলেও পারলাম না, সে তো এসেছে এখানে—

—শুনেছি। আচ্ছা, বিকেলে দেখা হবে। ঈষৎ ব্যস্ততায় হোটেলে ফিরে চলল সে।

সাণ্টু ঘোষ বলেছিল, আন্দামানে এলে দেখবো ঘরের দেওয়ালেরও কান আছে। এখানকার সোসাইটি ক্লাবে এসে মনে হল, খুব মিথ্যে বলেনি। সরকারী অথবা বে-সরকারী পদস্থ চাকুরে সবাই। কিছু বাঙালী এবং পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীও আছেন। বেশির ভাগই সস্ত্রীক আসেন, পয়সা দিয়ে রামি খেলেন। চেনা মুখের মধ্যে ডোরা মার্থাকে দেখা গেল। এখানে তাদের প্রতি তেমন সচেতন নয় কেউ। লক্ষ্য করলে বরং কিছুটা তাচ্ছিল্য চোখে পড়ে। আর যাঁরা আসেন, তাঁদের জাঁকজমক আর সামাজিক মর্যাদার ওজন অনেক বেশি। মার্থা কণ্ট্রাক্ট ব্রীজের টেবিলে চুপচাপ বসে খেলা দেখে। ডোরা পারত পক্ষে ঘেঁষেও না সেদিকে। আজ এ টেবিলে কাল ও টেবিলে রামি খেলে। দূর থেকেও তার হাসির শব্দ কানে আসে। তরুণ দলের কাছে তার কিছুটা খাতির আছে। কিন্তু টমাস সাহেবের পদার্পণ ঘটলেই দেখা যাবে, হেওয়ার্ডের গা-ঘেঁষে বসে নিবিষ্ট চিত্তে কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ খেলা দেখছে ডোরা টমাস।

পর পর তিন চার সন্ধ্যা এখানে আসতে একে একে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। হেওয়ার্ড সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। এঁদের সকলেই সমীহ করেন, সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলেন। এই সম্ভ্রমের ভাবটুকুই প্রথম দিকে সাণ্টু ঘোষের মুখে দেখেছিলাম। এঁরাও হয়ত হেওয়ার্ডের যুধ্যমান জীবনের অনেক গল্প জানেন। আমি শুধু দেখলাম, এখানকার সামাজিক পলিটিক্স-এ সে নিস্পৃহ, দ্বিতীয়—সে রামি খেলে না। মনে হয়, এই শ্রদ্ধার আর একটা প্রচ্ছন্ন কারণ বোধ করি এই

বৈশিষ্ট্য দু'টিও।

যাই হোক, হেওয়ার্ডের আদরের অতিথি বলেই হয়ত সমাদর আমিও কম পাইনি। কিন্তু আলাপ করে দেখা গেল, হেওয়ার্ডের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার খবরটুকুই এঁরা জানতেন না, নইলে আর সব খবরই রাখেন।

সকালে চায়ের নেমন্তন্ন করলেন মিস্টার-মিসেস কর, বিকেলে মিস্টার-মিসেস দত্তগুপ্ত, তার পর দিন মিস্টার মিসেস রে।

—এতদিন কি করছিলেন মশাই!...ওই মহাদেব লোকটার সঙ্গেই বা আপনার এত খাতির হল কি করে বলুন তো?...কলকাতায়? কি জানি মশাই, বলা উচিত নয়, কিন্তু আপনি বাঙালী যখন, না বলেই বা পারি কি করে—দু'দিনের জন্য এসেছেন, বদনাম না হয়' দেখবেন—মেয়েটাকে নিয়ে অত কাণ্ড করে নির্লজ্জের মত তারই খপ্পরে গিয়ে পড়েছে—জাতের গুণ যাবে কোথায়! রাগে লাল হয়ে উঠেছিলেন মিস্টার কর।

এই ভদ্রলোকের অফিসে চাকরি করে ইন্দুমতী। করে না করত। প্রথম যেদিন ক্লাবে আসি, ইন্দুমতীর চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পরের দিন সেটা। চাকরি যাওয়ার ফলে ইন্দুমতীর মেজাজটাই স্বচক্ষে দেখার বাসনা ছিল। তার বদলে চাকরিচ্যুত করলেন যিনি, তাঁর মেজাজ দেখার সুযোগ ঘটেছিল। হাই সোসাইটির ক্লাবে ভদ্রলোক 'হীরো' সেদিন। তাঁকে ঘিরেই জটলা। মেয়েরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁকে, পুরুষেরা কর্তব্য-নিষ্ঠার তারিফ করেছেন।

আমার সঙ্গে আলাপ অনেকক্ষণ পরে। নতুন মানুষ লক্ষ্য করে আগে খোঁজ নিয়েছেন হয়ত। তারপর কেন জানি সাগ্রহে নিজে থেকেই আলাপ করেছেন এসে। চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। অন্য দু'জনের চায়ের নেমন্তন্ন তাঁরই দেখাদেখি বোধ হয়।

কিন্তু চা খেতে এসে মনে হল ভদ্রলোকের রাগ ইন্দুমতীর ওপর যত না মহাদেবের ওপর তার থেকে অনেক বেশি। এখানেই থামেননি। এর পরের রোষ বর্ষণ আরও বেপরোয়া। বলেছেন, গো-মুখ্খুদের মধ্যে মস্ত মাতব্বর হয়ে বসে আছে, বড় বড় কথা বলে আর আদর্শের ভেলকি দেখায়—যেন ল্যাঙে থাকেন, আপনি আর কতটুকু জানেন—লোক ওই রকমই মশাই! শুধু এই মেয়েটা কেন, টমাসের ওই মেয়েটাকেই কি আস্ত রেখেছে ভাবেন নাকি?

পাশেই বসে সহধর্মিণী মিসেস কর। তাঁর অতিথি-সমাদরে ত্রুটি নেই। কিন্তু আশ্চর্য, মহিলারাও এখানে এ ধরনের কথা শুনে অভ্যস্ত নাকি! উক্তি শুনে কান মুখ একটুও লাল হয়ে উঠল না। বরং আমার সঙ্কোচ লক্ষ্য করেই সহাস্যে

ভ্রূ-ভঙ্গি করে স্বামীকে শাসন করলেন, নতুন এসেছেন ভদ্রলোক, কি বকছ যা-তা, তার ওপর বিশেষ বন্ধু লোক ওঁর—হয়ত রেগেই যাচ্ছেন তোমার ওপর!

রেগে যাইনি, অবাক হয়েছিলাম। ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয়েছে, না রাগব কেন, রাগের কি আছে···

কিন্তু বিশেষ বন্ধু লোক শোনা মাত্র কর সাহেব যেন দমে গেছেন একটু। নিজেও জানতেন বন্ধু লোক, কিন্তু ক্রুদ্ধ উত্তেজনার মুখে অত ভাবেননি। সান্ট, ঘোষ বলেছিল ইন্দুমণীর চাকরিটি নির্ভয়ে খতম করতে পেরেছেন কর সাহেব, কারণ, এখন আর মহাদেবকে ভয় করার হেতু নেই তাঁর—নিজেই সে নাটের গুরু এখন। কিন্তু আমার মনে হল, ভয় একটু আধটু এখনও করেন। কারণ, স্ত্রীর অনুযোগে আত্মস্থ হতে দেখা গেছে তাঁকে। বলেছেন, যা ব্যাপার এখানকার তাই বললাম শুধু—ওঁকে বলব না কেন, উনি তো আমাদেরই একজন।

সবিনয়ে ওঁদেরই একজন হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল, আরো অনেকক্ষণ! অতঃপর স্বামীর হয়ে বচন-সুধা সিঞ্চন করেছেন মিসেস কর।—তোমরা যা-ই বলো বাপু, আসল দোষ কিন্তু ওই মেয়েটার—অনেক আগেই ওকে চাকরি থেকে তাড়ানো উচিত ছিল তোমার, ভয়েই সারা তোমরা। লোকলজ্জা খুইয়ে ও-রকম একটা মেয়ে যদি দিনরাত একজনের পিছনে ঘুরঘুব করে—বিয়ে করেনি থাওয়া করেনি, লোকটার আব দোষ কি বলুন তো?

নারীসুলভ মোহিনী কটাক্ষ দেখা গেছে মিসেস করের চোখে।

ও-রকম লাজ-লজ্জা খোয়ানো পরিস্থিতিতে যে কোনো পুরুষের মতিভ্রম হওয়াটাও যে দোষের নয়, তেমন কোনো নিরীহ অভিব্যক্তি প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলাম কিনা জানি না।

অপর দু'টি চাযের আপ্যায়নের গৃহকর্তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মহাদেবের কথা তুললেন একবার করে! শোনানো উচিত নয় মনে করেও শুধু বাঙালী বলেই অনেক কথা শুনিয়ে ফেললেন।—প্রথম দিন এখানে এসেই ওই বর্মী মেয়েটাকে সুদ্ধ আপনিই তো ওকে টেনে বার করেছেন শেঠের সরাইখানা থেকে, করেননি? মুখের ওপর প্রায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন দত্তগুপ্ত।

—হুঁঃ, ওদের আবার বন্ধুত্ব! হেওয়ার্ডও কম বন্ধু ছিল নাকি, মুখের থেকে তো দিব্বি কেড়ে নিলে মেয়েটাকে! তলায় তলায় ওদিকে আর এক মেয়ের সঙ্গে মজে আছে! আপনাকেও নাকি সেই বর্মী মেয়েটার দোকানে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল একদিন? সত্যি নাকি?—আপনি আর এতশত জানবেন কি করে! আমাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন মিস্টার রে।

আর মহিলাদের যত ক্ষোভ ইন্দুমতীকে নিয়ে। তার অনাচারের কথা বলতে গিয়ে লজ্জায় মরে গেছেন! ভালো মানুষ হেওয়ার্ডের দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন। অমন মেয়েকে কেউ এখান থেকে তাড়াতে পারলে না বলে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আর সবশেষে বলেছেন, হ্যাভলকে গেছলেন যখন নিজের চোখেই তো দেখেছেন কেমন মেয়ে, দেখেননি?

কি দেখেছি শোনার আশায় সাগ্রহে অপেক্ষা করেছেন তারপর।

চা খেতে এসে প্রত্যেক জায়গাতেই খাবি খেয়েছি প্রায়। ভদ্রলোকদের ভিতরে ভিতরে যত ক্ষোভ জমা হয়েছিল তার কিছুটা হালকা করার উপলক্ষেই যেন চায়ের অভ্যর্থনা। কিন্তু আমার ওপর দিয়ে কেন? সান্টু ঘোষের মত, মহাদেবের সঙ্গে আমার খাতিরটা বরদাস্ত করতে পারেননি বলেই সুযোগ পেয়ে চায়ে ডেকে তাঁরা গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন খানিকটা। ইন্দুমতীর সাহেব-প্রীতির আগে ওই তিনজনকেই নাজেহাল করেছে মহাদেব—বিশেষ করে কর সাহেবকে। তিনটে না চারটে ছেলে-পুলে ভদ্রলোকের। তাদের পড়াশুনার দায়িত্ব নিয়ে কর গৃহিণী থাকতেন কলকাতায়। বছরে দু'বছরে একবার আসতেন, নয়তো কর সাহেব যেতেন ছুটি নিয়ে। কিন্তু কর সাহেবের গৃহিণীশূন্য গৃহ কি সব সময় শূন্যই থাকত নাকি তা বলে? এমনও রটে গিয়েছিল কর সাহেব বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করছেন তলায় তলায়। সত্যি নয় অবশ্য, কারণ এর কিছুদিন বাদেই দেখা গেছে ইন্দুমতী ঝুঁকেছে হেওয়ার্ডের দিকে। কিন্তু রটনা জটলা আর উড়ো চিঠির তোড়ে এমনই দাঁড়িয়েছিল ব্যাপারটা যে, টেলিগ্রামে স্ত্রীকে এনে শূন্য গৃহ পূরণ করতে পথ পাননি কর সাহেব। ছেলেমেয়েদের হস্টেল বোর্ডিংয়ে চালান দিয়ে এখানে এসে পাকাপাকিভাবে হাল ধরেছেন মিসেস কর। প্রাণের দায় বড় দায়। ছলা কলা কম জানেন নাকি মহিলা! সেজেগুজে বেরুলে কে আর বলবে তিন চারটে ছেলেপুলের মা! হাই সোসাইটির সঙ্গে মিশলেন, ওদিকে ইন্দুমতীকে বাড়িতে ডেকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন—সবাই বলাবলি করলেন মিশুক বটে মহিলা। সহজে মেলামেশাটা সকলের চোখে সইয়ে নিয়ে তারপর চড়াও করলেন মহাদেবকে। মহাদেব অবাক হয়নি? হয়েছে বই কি। কিন্তু আরো অবাক হয়েছেন যে মিসেস কর। এমন আদর্শ-চিত্ত গণ্যমান্য যোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব না হলে নিজেদেরই যে ষোল আনা লোকসান!

একথা শোনার পরেও অবস্থা কাহিল হবে না মহাদেবের? এখানেই ক্ষান্ত হননি মিসেস কর। বন্ধুত্ব এক তরফাই পাকা করে ছেড়েছেন। বন্ধুত্বের

খাতিরে জিপটা বোট্‌টাও চেয়ে পাঠিয়েছেন মাঝে মধ্যে। এ রাজ্যে বাহন সম্বল যার, শত্রুর হৃদ্যতার হাত থেকেও অব্যাহতি নেই তার! মহাদেব দিয়ে বেঁচেছে। তারপর শেষ চাল ওই নেমন্তন্ন। সেই চালে মহাদেব মাত। খানসামার হাতে তাঁর তদারকের রান্না খেয়েই প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে—সেই তিনি নিজের হাতে রেঁধে একদিন খাওয়াতে চান ওকে, কোনো ওজর আপত্তি চলবে না।··· মহাদেবের অমত না থাকলে আর দু' পাঁচ জনকেও অবশ্য ডাকবেন তিনি।

মহাদেব আত্মসমর্পণ করেছে একেবারে। নতি স্বীকার করে বলেছে, আই অ্যাডমায়ার ইউ ম্যাডাম, কর সাহেবকে নিরাপদে আগলে রাখতে আপনি একাই যথেষ্ট—হি ইজ পার্ফেক্টলি সেফ্ ইন ইওর হ্যাণ্ডস, আপনি নিশ্চিন্ত হোন আর এই ক্ষুদ্র অধমকে নেমন্তন্ন থেকে রক্ষা করুন।

নিরস্ত্র মহাদেবপানে চাহিল সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে—

কাব্যানুকরণের তুষ্টিতে নিজেই আপ্লুত সাণ্টু ঘোষ। কিন্তু পাছে এই বিবরণ শুনে মহাদেবের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠি, তাই ভারসাম্য বজায় রাখতেও ভোলেনি। ওই তিন তিনটে চায়ের আমন্ত্রণ উপলক্ষে মহাদেব এবং বিশেষ করে ইন্দুমতীর সম্বন্ধে যা শুনে এসেছি সে-সব যে অতিরঞ্জিত নয় একটুও—সেই মতামতও খুব স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছে বন্ধুটি।

*

*　　*

সেদিন অফিস ফেরত সাণ্টু ঘোষ ধপ করে চৌকিতে বসে পড়ে ব্যথা পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সখেদে বলে উঠল, আ-হা, আজ করবাইনস কোভে গেলে না! বড় মিস করলে···

ভনিতা শুনেই বোঝা গেল রসের খবর আছে কিছু। জিজ্ঞাসা করতে হয় না, উৎফুল্ল মুখে নিজে থেকেই বলল, আজ আবার জবর স্নানলীলা হয়ে গেল— শ্রীমতী স্নানাভিসারে নেমেছিলেন। মুখের দিকে চেয়ে থামল একটু। তারপর বাকিটুকু শেষ করল, হেওয়ার্ডের সঙ্গে—খুব জমেছিল শুনলাম, সকলের চোখ জুড়িয়েছে। সুইমিং কস্টিউম পরলে কেমন দেখায় দেখোনি তো!

না দেখলেও ওর চোখ থেকেই সেটা আঁচ করা যাচ্ছে।

হ্যাভলক থেকে আসার পর মাঝখানে তিন তিনটে দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে অনেকবারই মহাদেবকে আশা করেছিলাম। কিন্তু একটি দিনও তার দেখা মেলেনি। অবশ্য রোজই সন্ধ্যায় হাই সোসাইটির ক্লাবে আমাকে হাজিরা দিতে হয়েছে। মহাদেব তখনও আসেনি নিশ্চয়। এলে সাণ্টু ঘোষ বলত। মা-

শাইনের হৃৎরোগ সারানোর জন্য সত্যিই তাকে নিয়ে সমুদ্রে ভাসল কি না, সে কথাও মনে হয়েছিল। সে সংশয় গেছে—বায়নাকুলার লাগালে এখান থেকেই মেরিনে মহাদেবের নোঙর করা ছোট্ট স্টিম বোট দেখা যায়।

তাহলে আর যে কারণ, সেটাই সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলাম! ইন্দুমতীর চাকুরি-চ্যুতির জের কাটেনি বলেই মহাদেব ফুরসত পাচ্ছে না।···কিন্তু সত্যিই মর্মান্তিক কিছু হয়ে গেল নাকি এই নিয়ে!

এখানে এসে পর্যন্ত একজনের মুখে আর একজনের কথা শুনে আর ভালো লাগছিল না। কিন্তু তা বলে এ খবর আশা করিনি। ইন্দুমতী যেমন মেয়েই হোক, হেওয়ার্ড লোকটা ভিন্ন ধাতুতে গড়া। চুপচাপ সে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে বলেই মনে হয়েছিল। বললাম, কিন্তু হেওয়ার্ডই বা আর আসে কেন, তার তো কোনো আশাই নেই?

—স্পোর্ট, নিছক স্পোর্ট। মহাদেব না থাকলে কি হত? হেওয়ার্ড বিয়ে করত ইন্দুমতীকে? হুঁ! ওই স্পোর্ট থেকে বাড়তি যেটুকু মেলে, বুঝলে?

বুঝলাম। বুঝে চুপ করে রইলাম। কিন্তু আলোচনার এমন মুখরোচক মশলা পেয়ে সাণ্টু ঘোষ চুপ করে থাকার মানুষ নয়।—কি ভাবছ, মহাদেব জানে কি না? তাকে ঘায়েল করার জন্যেই তো—ফকিরুদ্দিনের খবর শোনোনি বুঝি?

খবর আর কিছুই নয়, সাহেবের জন্য অর্থাৎ হেওয়ার্ডের জন্য দু'বোতল ভালো মাল আনবে বলে ফকিরুদ্দিন মা-শাইনের খোঁজে গিয়ে দেখে মা-শাইন নেই। থ-মিন বলেছে, মহাদেব-সাহেবের সঙ্গে হাওয়া গাড়িতে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।—তুমি ঠিকই ধরেছিলে, থ-মিন লোকটা থাকে চুপচাপ, কিন্তু ঝুনো ঘুঘু, বোঝে সব।—সবারই এখানে ফুট অন্ ট্যু বোট্স্, বুঝলে?

মনের মত করে বোঝাতে পেরে সাণ্টু ঘোষ হাসতে লাগল। কিন্তু হাসি থেমে গেল। বাইরে ভারী জুতোর মচমচ শব্দ আর হালকা শিস! তার পরেই দোর গোড়ায় যাকে দেখা গেল সে স্বয়ং মহাদেব। সাণ্টু ঘোষ গম্ভীর। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি আর কিছুই চাইনি। সাণ্টু ঘোষের ভয়েই এমন আবির্ভাব নিয়েও কাব্য করে ওঠা গেল না।

মহাদেব হালকা হেসে বলল, আছ দেখছি, আজকাল আবার হাই সোসাইটিতে ভিড়ে গেছ খুব শুনলাম···।

হেসেই জবাব দিলাম, পোর্টব্লেয়ারের সব থেকে অবাক ব্যাপার কি জানো? এখানে শুনতে কিছু বাকী থাকে না—সবাই সব-কিছু শোনে।

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল মহাদেব।—রাইট! এ ড্যাম ডার্টি প্লেস্। তা

তুমিও শুনছ কিছু, না বেরুবে ?

নিরীক্ষণ করেই দেখছিলাম।···একটুও ঝড় ঝাপটা গেছে বলে তো মনে হয় না—এ ক'দিন কোথায় ছিলে ?

—ওয়জ্ হরিব্লি বিজি, বেরুবে তো এসো—। সাণ্টু ঘোষের দিকে চেয়ে থমকে গেল একটু। তুমি কি করবে, আসবে না ঢেউ শুনবে বসে ? আমরা কিন্তু ইন্দুমতীর ওখানে যাচ্ছি—

বিছানায় গা এলিয়ে দিল সাণ্টু ঘোষ।—সমস্ত দিন অফিস ঠেঙিয়ে আমার অত রস নেই, তোমরাই যাও।

জিপে উঠেই মহাদেবকে সতর্ক করলাম আগে, আস্তে চালাও বাপু, উড়তে হবে না।

কানে গেল না বোধ হয়। এক হ্যাঁচকায় খোলা রাস্তায় এসে জিজ্ঞাসা করল, তারপর—কি শুনছিলে বলো।

—শোনার ব্যাপারে তোমারও আগ্রহ আছে নাকি ?

—নেই, তবে শুনে রাখা নিরাপদ।

হাই সোসাইটির সংশ্রবে এসে ক'টা দিনে নতুন করে যা শুনেছি তার ফিরিস্তি দিলে মহাদেব কি করবে বা কি বলবে ? জিপ রাস্তা ছেড়ে খাদে গড়াবে ? হালকা জবাব দিলাম, শুনছিলাম দু' নৌকোয় পা দিয়ে বেড়াচ্ছ তোমরা।

—রিয়েলি ? চকিতে একবার ফিরে তাকালো মহাদেব, হু আর দে ? আমার নৌকো দুটো কারা ?

—ইন্দুমতী আর মা-শাইন।

জোরেই হেসে উঠল মহাদেব।—আর ইন্দুমতীর ? আমি আর হেওয়ার্ড নিশ্চয় ?

হাসিতে যোগ না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এমন উবে গেছলে কোথায়, বাড়িতে খোঁজ করেও পাইনি ?

—যাব আর কোথায়। হ্যাভলকের দাবী পেশ করছিলাম কর্তাদের কাছে। ছাড়তে চায় কেউ কিছু ? সবই যেন ঘরের সম্পত্তি ! তুমি কবে গেছলে ? কেউ বলেনি তো !

—হ্যাভলক থেকে ফেরার পরদিনই।···বাড়ি পর্যন্ত যাইনি ঠিক, তার আগেই থ-মিনের সঙ্গে দেখা হতে সে বলল, মা-শাইন অসুস্থ শুনে তুমি দেখতে গেছ তাকে।

ও···।

—কি হয়েছিল, ভালো আছে এখন ?

নিস্পৃহ জবাব দিল, মাঝে মধ্যে শ্বাস কষ্ট হয় একটু আধটু, ভালই আছে।

বলা বাহুল্য, ভিতরে ভিতরে আগেই আমি বিরূপ হয়ে উঠেছিলাম। যেন সত্যিই কাজ নিয়েই শুধু ব্যস্ত ছিল এমন যে একটিবার খবর করারও অবসর মেলেনি। ইন্দুমতীর মেজাজ সামলানোর দায়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল শুনলে বরং সহজাত উদারতায় অতিথি অবহেলার একটি ত্রুটি অনায়াসে বরদাস্ত করা যেত! তার বদলে সরাসরি হ্যাভলক দেখিয়ে দিল।

ওর এই কাজের আড়ম্বর নিয়ে খোঁচা দিতে এখন আর সঙ্কোচ হল না খুব। ইন্দুমতীর কথা না উঠুক, মা-শাইন আছে! উপলক্ষের জের লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুতে পারে। ঠাট্টার সুরে বললাম, তোমাকে এভাবে ডুব মারতে দেখে সাণ্টু ঘোষ সন্দেহ করছিল মা-শাইনকে নিয়ে তুমি হয়ত সমুদ্রে ভেসেছ—আর একবারের শ্বাস-কষ্টে নাকি সেরকম হয়েছিল · ।

জবাব আশা করিনি। মহাদেব হাসতে লাগল মিটিমিটি। তারপর অ্যাবার্ডিনের পথ ধরে বলল, তোমার বন্ধুটিও আজকাল বিগড়ে গেছে বেশ, আগে এ-রকম ছিল না।

চুপ করে গেলাম। আজ আর বলতে পারা গেল না, তোমাকে ভালবাসে বলেই। সাণ্টু ঘোষের অনেক কৌতূহল আমার নিজেরই ভালো লাগে না। তারই স্থূল রসিকতা অবলম্বনে ওকে জব্দ করার চেষ্টাটা বিসদৃশ লাগছে এখন। পরিচিত পথে সেই দোকানের কথা মনে হতেই আরো অস্বস্তি বোধ করলাম। মা-শাইন যদি সেদিনের মত দাঁড়িয়ে থাকে দোকানের সামনে—

যাক্। দোকান বন্ধ। শুধু বন্ধ নয়, পেল্লায় দুটো তালা ঝুলছে দরজায়। মহাদেবের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সে বলল, কাজে বেরিয়েছে, আজই ফেরার কথা। মাসে বার দুই অন্তত কাজে বেরোয়—কাজ বুঝলে তো ?

আগে বুঝিনি। প্রশ্ন করতে বুঝলাম। জঙ্গলে গেছে মদ চোলাই করতে। এই বর্মী মেয়েটির সামনে স্বস্তি বোধ করিনে বটে, তবু কেন জানি তাকে অশ্রদ্ধাও করি না মনে মনে। তাই বোধ হয় এই হেয় বাস্তবের ব্যাপারটা ধাক্কা দেয় বেশ।

অ্যাবার্ডিনের পথ ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে একটা কাঠের দোতলা বাড়ির সামনে জিপ থামতে ইন্দুমতী দৌড়ে এলো প্রায়।—আসুন আসুন, খুব ভাগ্যি—ভাবছিলাম একেবারে বর্জন করলেন বুঝি !

মহাদেব ধমকে উঠল, রাস্তায় চেঁচামেচি করতে হবে না—

সামনের ঘরেই বসার ব্যবস্থা। আড়ম্বর নেই, পরিচ্ছন্ন রুচি আছে। বারো

চৌদ্দ বছরের দু'টি ছেলে বসেছিল। আমরা ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল। মহাদেব দু'জনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

—বসুন। ইন্দুমতী পরিচয় করিয়ে দিল, আমার ভাই মণ্টু আর পিণ্টু, ইস্কুলে পড়ছে, ম্যাট্রিক পাস করলেই একে একে কলকাতায় পাঠাব—দেখে শুনে ভালো কলেজে ভর্তি করে দেবেন। দেবেন তো? ভাইদের বলল, যাও, মাকে গিয়ে বলো আমরা তিনজন আছি—

ছেলে দু'টি চলে গেল। এই ইন্দুমতী সকালে সুইমিং কস্টিউম পরে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সঙ্গে স্নানের উচ্ছলতায় করবাইনস কোভ মাতিয়ে তুলেছিল, ভাবতে ইচ্ছে করে না। নির্ভরশীল দু'টি ছোট ভাইয়ের দিদি পরিচয়ে অনেক সুন্দর মনে হল ইন্দুমতীকে।

—কি ব্যাপার? কি করছিলেন এতদিন? রোজ তো একবার করে আসার কথা ছিল—

মহাদেব ইন্ধন জোগালো, ও শোনার কাজে ব্যস্ত ছিল, আমরা নাকি দু' নৌকোয় পা দিয়ে বেড়াচ্ছি—আমার নৌকো তুমি আর মা-শাইন আর তোমার আমি আর হেওয়ার্ড।

ইন্দুমতী হাসতে হাসতে শাড়ির আঁচল তুলে দিল মুখে। বলল, সত্যি নাকি? ওই ভালো মানুষ বেচারীদের নিয়ে টানাটানি কেন আবার!

দেখছি। এই দেখার থেকেও চোখ ফিরিয়ে নেওয়া সহজ নয়। সাণ্টু ঘোষ মিথ্যেই ভাবিয়েছে ক'টা দিন। চাকরি যাওয়ার ফলে কোনো ক্ষোভ বা কোনো ব্যতিক্রমের আভাসও নেই এ মুখে। বরং অন্তরতুষ্টিতে আরো যেন ভরপুর দেখাচ্ছে। হেওয়ার্ডের সঙ্গে মা-শাইনকেও ভালো বলবে ইন্দুমতী আশা করিনি। বললাম, কান যখন আছে দুটো না শুনে যাব কোথায়। তাছাড়া, রোজ যাদের কাছে আসার কথা সব ভুলে তারা যদি নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে আর আসা হয় কেমন করে?

উল্টো চাপ পড়তে মহাদেব নিজেদের ত্রুটি প্রায় স্বীকার করে নিল।—সত্যি তো, ও নতুন মানুষ আন্দাজে কোথায় ঘুরবে! আমি না হয় কাজ নিয়ে ফুরসত পাইনি, তুমি তো ওকে ধরে আনতে পারতে।

দু'চোখ বিস্ফারিত করে ইন্দুমতী তাকালো তার দিকে।—আমি কোত্থেকে ধরে আনব, সাণ্টু ঘোষের ঘর থেকে?

ত্রাসের কারুকার্য দেখে হাসি চাপা দায়। বললাম, সাণ্টু ঘোষকে খুব ভয় তো আপনার!

—খুব। ভয়ে ভয়েই তো জীবন কাটল! কিন্তু আপনাকে না তুমি বলায় ছাড়পত্র দিয়েছিল ওই ভদ্রলোক···পছন্দ হল না বুঝি?

পছন্দ হলেও ঠিক অতটা সহজ এখনো হয়ে উঠতে পারিনি। ভিতর থেকে খাবার আসতে এ প্রসঙ্গ এড়ানো গেল। মহাদেব যেন এরই প্রতীক্ষায় ছিল। গভীর মনোযোগে ডিশ চড়াও করে বসল সে। প্রচ্ছন্ন চপলতায় ইন্দুমতী বার বার নিরীক্ষণ করছে ওকে। দেখছে আর চাপা আনন্দে কিছু একটা মতলব আঁটছে যেন। আমি একটা লোক বসে আছি সে সম্বন্ধেও সে সচেতন নয় খুব। মহাদেবের ডিশ নিঃশেষ হওয়া মাত্র ইন্দুমতী নিজেরটাও ঠেলে দিল তার দিকে।

—না, আর না। হাসি মুখে মহাদেব ফেরত দিল সেটা। চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে আমায় নিয়েই পড়ল আবার। ইন্দুমতীর দিকে চেয়ে বলল, হাই সোসাইটির কাছে এখন কত খাতির ওর—রোজ ক্লাবে যাচ্ছে, চায়ের নেমন্তন্ন খাচ্ছে, গণ্যমান্য দশজনকে দেখছে—তুমি আমি কি!

সচরাচর এ ধরনের কথা বলে না মহাদেব। ওর মুখে এই লঘু টিপ্পনী খুব যে ভালো শোনালো তাও না। উক্তি শুনে ইন্দুমতী ফিরে তাকালো।—সত্যি তো, আদর করে না ডাকলে আপনি আসবেন কেন? কৌতুকভরা দু'চোখ আবার রাখলো মহাদেবের ওপরেই।—কিন্তু তুমি এই ক'দিন এমন কি কাজে ব্যস্ত ছিলে যে একটা দিন ওঁকে ডেকে আনতেও সময় পাওনি?

ঠিক বুঝছি না, শোনা মাত্র বেশ যেন বিব্রত দেখালো মহাদেবকে। সে-ভাব দমন করে জবাব দিল, বাঃ, আমি সময় পেলাম কখন?

সেই জন্যেই তো জিজ্ঞাসা করছি, কি করছিলে, একটা কাগজ পেন্সিল বরং নিয়ে আসি—লিখে রাখি। হাসি মুখে আমার দিকে ঘুরে বলল, হ্যাভলক থেকে আসার পর আমার সঙ্গেও আর দেখা হয়নি, এই আজই এলো—জানেন তো?

জবাব দেব কি, শুনে নিজেই বিভ্রান্ত। সেই মুহূর্তে মনে হল, মহাদেব আজ আমাকে এখানে ধরে এনেছে আর কোনো কারণে নয়, শুধু নিজেকে আড়াল করার জন্য। এখানে এসে ইন্দুমতীর হাসিখুশি দেখে মনে মনে মহাদেবের তারিফ করেছিলাম। কিন্তু এখনো তো ইন্দুমতীর হাবভাবে ক্ষোভের চিহ্ন মাত্র দেখছি না! উল্টে মনের আনন্দে ভারি মজার কিছুই রোমন্থন করছে যেন।

কোনো কারণে মহাদেবের জোর কমে আসছে বলেই গলার জোরটা চড়া শোনালো। বলে উঠল, তাহলে বলো সব ছেড়ে ছুড়ে এখানেই থেকে যাই—

—তা কখনো বলতে পারি? ছদ্ম-ত্রাসে ইন্দুমতী তেমনি চেয়ে রইল খানিক।

তারপর আলতো করে বলল, আমার চাকরিটা গেছে শুনেছ? হ্যাভলক থেকে এসেই নোটিস পেয়েছি···

প্রমাদ গুনছি। এ কিসের মধ্যে এসে পড়লাম। এখনই এরা বোঝা পড়া শুরু করে দেবে নাকি! মহাদেবের রাগের নমুনা তো নিজের চোখেই দেখেছি একবার। আর ইন্দুমতীই বা কি, সে-ও তো ভালো করেই চেনে ওকে—আরো দুটো দিন সবুর করলেই তো পারত, আমার সামনেই কেন! কিন্তু আমি থাকায় উল্টে আরো যেন খুশি হয়েছে। হ্যাভলকে ওদের চাকরি-গত বাকবিতণ্ডার সাক্ষী ছিলাম বলেই হয়ত। চাকরি যাওয়ার ফলে সান্টু ঘোষ যে মূর্তি কল্পনা করেছিল ইন্দুমতীর—এ সে মূর্তি নয়। মুখে রাগারাগির চিহ্নমাত্র নেই এখনো, গোটা পরিস্থিতি যেন তারই করায়ত্ত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল মহাদেবকে হাসতে দেখে। মনে হল, বুদ্ধিমানের মত সমর্পণের দিকটাই বেছে নিয়েছে ও! চাকরি যাওয়ার পক্ষে সমর্থনসূচক জোর দিয়ে বলল, চাকরি তো আর তোমার ঘরের সম্পত্তি নয়, অত অনিয়ম করলে যাবে না তো কি!

—সত্যি। ভারি নরম সুরে ইন্দুমতী স্বীকার করে নিল তৎক্ষণাৎ। আজ আর একবারও বলল না, অনিয়ম যা হয়েছে সবই মহাদেবের জন্য! একটু থেমে তারপর শাদাসিধে একটা খবর দিল যেন।—কাল সন্ধ্যার পর কর সাহেব এসেছিলেন, কর্তব্য করতে হল বলে দুঃখু-টুঃখু করলেন।···কিছুক্ষণ ছিলেন, চা খেলেন, অনেক গল্পসল্প করলেন··।

একটা জোরালো আলো বিনা নোটিসে টক করে নিভে গেলে যেমন হয়, মহাদেবের অবস্থাও এক নিমেষে ঠিক তেমনি হয়ে দাঁড়াল। কি ঘটল বুঝছি না, কিছু একটা ঘটে গেল সেইটুকুই শুধু স্পষ্ট উপলব্ধি করছি। মহাদেবের মুখ ওর মনের দর্পণ। বড় কিছু একটা ধাক্কা সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠতে লাগল সে মুখ।···যেমন দেখেছিলাম হ্যাভলকে। ওদিক চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়েছে ইন্দুমতী। তার চা শেষ হয়নি তখনো। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও চাপা হাসির সবটাই চেপে উঠতে পারছে না স্পষ্ট বোঝা যায়। পেয়ালার ওধারে উদ্গত হাসির ছটায় ঝলমল করছে সমস্ত মুখ।

বিমূঢ় দ্রষ্টা আমি।

নড়েচড়ে বসল মহাদেব। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নীরস কণ্ঠে বলল, বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করেই, এখন যাব—

ইন্দুমতী বাধা দিল, বা রে, এরই মধ্যে কোথায় আবার এমন কাজ পড়ে

গেল ?

তার দিকে না তাকিয়েই ভারী গলায় খানিকটা যেন প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করল মহাদেব।—মা-শাইনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

—সে কি আছে নাকি এখানে! ইন্দুমতীর বিস্ময় প্রতিবাদের মত শোনালো প্রায়।

—আজ আসার কথা, এতক্ষণে এসে গেছে হয়ত—। আমার প্রতীক্ষায় ঘুরে দাঁড়াল।

ওঠার উপক্রম করতেই ইন্দুমতীর লঘু তাড়া খেয়ে হকচকিয়ে গেলাম প্রায়।—আপনি উঠছেন কেন, মা-শাইনের ওখানে যাচ্ছে শুনলেন তো, এর মধ্যে আপনি গিয়ে কি করবেন? বসুন—

হেসে ফেলেও সামলে নিল তক্ষুনি। মহাদেবকে বলল, যেতে হবেই যখন যাও···ঘুরে আবার আসছ নাকি?

জবাবে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মহাদেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ইন্দুমতীও। চায়ের পেয়ালা এবং ডিশগুলো হাতের কাছে টেনে নিয়ে বলল, বসুন, আসছি এক্ষুনি—

পেয়ালা ডিশ সরানোর উপলক্ষ্যে নিজেও তাড়াতাড়ি সরে বাঁচল, সেটা বুঝতে একটুও বেগ পেতে হল না। আড়ালে গিয়ে প্রাণ খুলে হেসে এলো বোধ হয়। এলো একটু দেরি করেই। খুশির আতিশয্যে সমস্ত মুখ লালচে দেখাচ্ছে এখনো। চেয়ার টেনে বসে এই হতভম্ব মূর্তির দিকে চোখ পড়তেই এতক্ষণের চেষ্টা রসাতলে গেল। এবারের হাসির জোয়ার আর সামলে উঠতে পারল না চট করে। তারপর দম নিয়ে বলল, কি যাচ্ছেতাই না জানি ভাবছেন আপনি···।

বললাম, আমি ভাবাভাবির বাইরে যেতে বসেছি, আর বেশিক্ষণ অবাক করে রাখলে দম বন্ধ হবে। ও এভাবে চলে গেল কেন?

—যাক্, যেমন করতে যায় সব সময়! লঘু উষ্মা প্রকাশ করল ইন্দুমতী।—হাভলকে নিজেই তো শুনেছেন আপনি, চাকরির কথা উঠতে কেমন পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলে, ওদিকে চাকরিটি যাতে যায় নিজেই তলায় তলায় সে-ব্যবস্থা পাকা করে গেছেন!

রাগ আর হাসি দুটো একত্রে সামলে উঠতে পারছে না ইন্দুমতী। আমার বিস্ময় গেল কি বাড়ল, সহজ অনুমানসাপেক্ষ।—চাকরি যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে গেছে···মহাদেব?

—না তো কি! কর সাহেব ভীতু-মানুষ, ওর সঙ্গে দেখা করে বলেছেন, বলা

নেই কওয়া নেই এত কামাই করছি আমি, অফিসের নিয়ম কানুন আছে একটা—কিছু করতে গেলে পাছে চেলাচামুণ্ডা নিয়ে সে আবার পিছনে লাগে সেই ভয়ে কিছু করতেও পারছেন না।···শুনে আপনার বন্ধু কি বলেছে তাঁকে জানেন?

জানার আশায় উদ্‌গ্রীব নেত্রে চেয়ে আছি।

ইন্দুমতী হাসতে হাসতে জানালো বাকিটুকু। গোটা ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হওয়া সত্ত্বেও বাকশক্তি লোপ পেয়ে গেল আমার। মহাদেব বলেছে, এভাবে দিনের পর দিন আইন-কানুন না মানা সত্ত্বেও কিছু না করার জন্যেই বরং ভদ্রলোকের বিপদের সম্ভাবনা। অফিস ডিসিপ্লিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রশ্ন নেই—যা করা উচিত তাই করা দরকার। কর সাহেব তা করছেন না বলেই বরং পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলছে আর পিছনে লাগার ফাঁক খুঁজছে। উনি কর্তব্য পালন না করলে এরপর আর হয়ত তাদের ঠেকানই যাবে না।

কর সাহেব এসেছিলেন ইন্দুমতীর বাড়ি এবং চা খেয়ে অনেকক্ষণ গল্প-সল্প করে গেছেন শুনেই মহাদেবের মুখের অবস্থাখানা যা দাঁড়িয়েছিল স্মরণ করতে চেষ্টা করে এবার আমারই হাসি পেয়ে গেল। এর বেশি আর কিছু বলেনি ইন্দুমতী, বলার দরকারও হয়নি। ধরা পড়ে মহাদেব হাসতে পারত। হেসেই বলতে পারত, বেশ করেছি, তোমাকে বিশ্বাস নেই বলেই করেছি—চাকরি থেকে নামটা কাটা না যাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলাম না বলেই করেছি।

কিন্তু তার বদলে রাগ করে ও যেন মস্ত একটা পরাজয় নিয়ে বেরিয়ে গেল। সেটাই শঙ্কার কারণ। আর এই মেয়েই বা কি, ষোল আনা জিতেও সকালে গিয়ে নামল করবাইনস্ কোভের স্নানের আসরে, আর বিকেলে করল এই কাণ্ড!

না বলে পারা গেল না।—আপনিই বা কম কিসে, এত সব জেনেও আমার সামনেই ও বেচারীকে এভাবে জব্দ না করলেও তো পারতেন।

এবারে আর প্রতিবাদ করল না ইন্দুমতী। কতটা জব্দ হয়েছে মহাদেব, স্মিত-হাস্যে তাই যেন উপলব্ধি করে নিল একটু। তারপর বলল, আপনাকে ও পর মনে করে না, তাই আমিও করিনে—।

অদ্ভুত ভালো লাগল কানে। ভালো লাগল না শুধু, মিষ্টি লাগল। তাড়াতাড়ি বললাম, এবারে গিয়ে ধরে নিয়ে আসি ওকে, কি বলেন?

চোখ কপালে তুলে ফেলল ইন্দুমতী।—কোত্থেকে! মা-শাইনের দোকান থেকে? থাক্ আপনার আর গিয়ে কাজ নেই, তাছাড়া রাগের মাথায় সত্যি সত্যি কোথায় গেছে এখন ঠিক আছে!

অসম্ভব নয়। দরজীর দোকান পেরিয়ে আসার সময় মা-শাইনের সঙ্গে যে

দেখা করার কথা আছে সে-রকম আভাস পাইনি। নতুন খোরাক পেয়ে ইন্দুমতী সেদিকেই ঝুঁকল এবার। সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করল, মা-শাইনকে দেখেছেন?

ঘাড় নাড়লাম, দেখেছি। কোন্ পরিস্থিতিতে দেখেছি প্রথম, সেটা অনুক্ত থাকল। শুধু বললাম, আলাপ হয়েছে একদিন—

—তার পরেও ওর ওখান থেকে আপনার বন্ধুকে ধরে নিয়ে আসার কথা বলছিলেন!

হেসে ফেললাম।—ওদিকটা ভেবে দেখিনি।

ইন্দুমতীও হাসতে লাগল,—কেমন লেগেছে মা-শাইনকে বলুন—

—ভালোই তো…।

সংক্ষিপ্ত প্রশংসা ইন্দুমতীর খুব মনঃপূত হল না। জোর দিয়ে বলল, এখন ওর শরীরও ভালো যাচ্ছে না আর মেজাজপত্রও সুবিধের নয় তেমন, তাই—তিন চার বছর আগে যদি দেখতেন চোখ ফেরাতে পারতেন না।

চোখ যে এখনো ফেরাতে ইচ্ছে করে না খুব সে আর বলা গেল না। ইন্দুমতীর মা-শাইন-প্রশস্তি শেষ হয়নি তখনো। বলল, ওর সঙ্গে যখন বেরুতাম রাস্তার লোক দু'পাশে সরে দাঁড়াত।

—সেটা আপনাকে দেখে নয় তো? হালকা অবিশ্বাসের চেষ্টা আমার।

লজ্জা পেয়ে গেল। হ্যাঃ, আমি আর ও।

অর্থাৎ, ওর কাছে আমি আবার কেউ একজন। অহমিকা-বর্জিত এই সুরটুকু না মিশলে কৃত্রিম শোনাতো। মা-শাইন প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করার ইচ্ছে নেই আমার। পাছে থেমে যায় এই জন্যেই সাদাসিধেভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, তার সঙ্গে আপনার এত খাতির হল কি করে?

—কার সঙ্গে—মা-শাইনের সঙ্গে? ইন্দুমতীর সহজতায় ফাটল ধরানো গেল না এবারও। বলল, ও-ই তো বলতে গেলে এখানকার গার্জেন ছিল আমার! খুব ভালবাসত, রোজই আসত প্রায়—ঢেউ তোলা সমুদ্রেও থ-মিনের ভিজিতে আমায় টেনে নামাতো এক-একদিন, ওদের ভয়ডর নেই, দুটোই সমান দস্যি।

থ মিনের নামটা শোনামাত্র অনুসন্ধিৎসু মনের ওপর এক ধরনের ছায়াপাত হল যেন। সেদিনের সেই পথের আলাপের পরে ওই লোকটাকেও একেবারে সরিয়ে দিতে পারিনি মন থেকে। কিন্তু তার কথা তুলে আর জটিলতা সৃষ্টি না করাই ভালো। ইন্দুমতী কতটা জানে, কে জানে। আর, মানুষ বলেই বা তাকে গণ্য করে কতটা তাই বা কে জানে।

যা বলছে, সবই বিগত দিনের সমাচার। খুব ভালোবাসত, রোজই আসত, ঢেউ-তোলা সমুদ্রেও টেনে নামাতো। পরস্পরের প্রতি আজকের মনোভাবটা কেমন ওদের? সেটুকু উপলব্ধি করার জন্যেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম। ইন্দুমতীর মা-শাইন প্রসঙ্গ অবতারণার সেটাই ধরাবাঁধা পরিণতি।

কিন্তু একজনের অকল্পিত আবির্ভাবে ছেদ পড়ে গেল।

—ভিতরে আসতে পারি?

তরল নারী-কণ্ঠের ইংরেজী ভব্যতায় দু'জনেই দরজার দিকে ফিরে তাকালাম।

ডোরা টমাস। চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে উৎফুল্ল আহ্বান জানালো ইন্দুমতী।—কি আশ্চর্য! এসো, এসো, কি ব্যাপার?

সহাস্যে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াল ডোরা টমাস! তেমনি চঞ্চল ভাবভঙ্গি। এসেছেও বোধ হয় তাড়াহুড়ো করে, হাঁপাচ্ছে বেশ। প্রথমেই দুই নীল চোখ আমার মুখের ওপর চালিয়ে নিল এক দফা। তারপর চেয়ার টেনে ঝপ করে বসে পড়ে ইন্দুমতীর দিকে তাকালো।—ডেব কোথায়?

ডেব অর্থাৎ মহাদেব। জবাবে ছদ্মকোপে ভুরু কোঁচকালো ইন্দুমতী।—এইটে কি তোমাদের দেবের ঠিকানা?

অন্তরঙ্গ চপলতায় ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ডোরা পাশের চেয়ারটার দিকে ঠেলে দিল তাকে। বলল, সে এই ঠিকানায় এসেছে শুনেছি।

—কি দেখলে—এসেছে?

ইংরেজিও মন্দ বলে না ইন্দুমতী। নীল চোখ আবারও আমার দিকেই বিচরণ করে নিল একপ্রস্থ। মর্ম, না তার বদলে তো দেখছি এই মূর্তি।

কিন্তু এই মূর্তির প্রতিও আজ যেন নিস্পৃহ মনে হল না তাকে। বরং কিছুটা আগ্রহ নিয়েই তাকালো। ক্লাবে হেওয়ার্ডের পার্টনার হয়ে তাস খেলি, তার ওপর এখানেও বসে আবার—এত-সব কারণে হয়ত মর্যাদা বেড়ে থাকবে।

ইন্দুমতী জিজ্ঞাসা করল, তারপর কি চাই সেটাই বলে ফেলো—বোট, না জীপ?

ডোরা বলল, একটাও না, ডেবকে চাই। বলে এই দিকেই উৎসুক দৃষ্টি সঞ্চারণ করল আবারও।

ইন্দুমতী হেসে উঠল।—বড্ড বেশি চাইলে না? তা ওই ভদ্রলোকের দিকে অত ঘন ঘন তাকাচ্ছো কেন? দেবের বদলে ওঁকে হলে চলে তো নিয়ে যাও।

দুই জোরালো নারী কণ্ঠের সঙ্গে আমার হাসিটা তেমন করে মিশল না। কিন্তু কর্ণদেশ উষ্ণও হয়ে উঠল না তা বলে। এখানকার আবহাওয়ায় কিছুটা

অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। হাসি থামিয়ে ইন্দুমতী আমাকেই জিজ্ঞাসা করল, আলাপ আছে?

ডোরাই তাড়াতাড়ি জবাব দিল, অনেক দিন—। মার্থার সঙ্গে তো রীতিমত ভাবই হয়ে গেছে ওঁর। ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে দাঁড়াল।—দেরি হচ্ছে, আমি ক্লাবে যাব এখন, তুমি আসছ?

বললাম, না আজ আর না···।

গেলে খুশি হত বোধ হয়। যাব না শুনেও মুখের দিকে চেয়ে দুই এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল।—আচ্ছা চলি, বাই বাই!

যেমন তাড়াহুড়ো করে এসেছিল তেমনি তাড়াহুড়ো করেই চলে গেল। ইন্দুমতী ঘুরে বসল আবার।—কেন এসেছিল বোঝা গেল না, আপনার সঙ্গে এদের আবার এত ভাবসাব হল কোথায়?

নিকোবরে যাবে বলে বোট চাইতে এসেছিল মহাদেবের কাছে, তখন।··· ক্লাবেও দেখা হয়েছে তারপর—কিন্তু সেটা এত'র পর্যায় পড়েনি এখনো।

হেসে মাথা নাড়ল ইন্দুমতী।—আমার তো পড়েছে বলেই মনে হচ্ছিল, ডাকছিল গেলেন না কেন, কিছু বোধ হয় বলত আপনাকে।

হাঁটা পথে সাণ্টু ঘোষের ডেরার দিকে পা চালিয়েও কথাটা অনেকবার মনে হয়েছে। সঙ্গে গেলে কিছু হয়ত বলত ডোরা টমাস। এ-রকম মনে করার খুব যে সঙ্গত কারণ আছে তা নয়। তবু মনে হচ্ছিল। তার আজকের হাবভাব এবং আগ্রহ দেখে মনে মনে আমিও যথার্থ ই অবাক হয়েছি। অথচ কি-ই বা বলার থাকতে পারে তার আমাকে ভেবে পাই না।

অ্যাবার্ডিনের পথ ধরলাম ইচ্ছে করেই। মা-শাইনের দোকান এখনো তেমনি বন্ধ। কোথায় গেল মহাদেব কে জানে। হয়ত নিজের বাড়িতেই বসে আছে গুম হয়ে। অ্যাবার্ডিন ছাড়ালেই নিরিবিলি পাহাড়ী রাস্তা। অনেক দূরে দূরে এক একটা আলো। ফলে সন্ধ্যে না পেরুতেই মনে হয় অনেক রাত। পথ কম নয়। কিন্তু পাইনের ঝরঝরে বাতাস কেটে হাঁটতেই ভালো লাগছে। সমস্ত চেতনার মধ্যে এতক্ষণের অবকাশ বিনোদনের তৃপ্তিটুকু ছড়িয়ে আছে। সেটা অস্বীকার করলে নীতির কথা হত কিনা জানি না। কিন্তু বঞ্চনার কথা হতই।

ইন্দুমতীর টুকরো টুকরো অনেক কথা কানে লেগে আছে। আমার সামনে মহাদেবকে জব্দ করা নিয়ে বলেছিল, ও আপনাকে পর মনে করে না, তাই আমিও করিনে। এ আন্তরিকতার পিছনে সবটুকুই মহাদেব। একজনের প্রতি

একজনের এর থেকে অনাড়ম্বর আস্থার কথা আর কি হতে পারে! এর থেকে বেশি আর কি চায় মহাদেব? তাকে পেলে এই মুহূর্তে তার সব রাগ জল করে দেওয়া যেত বোধ হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে আর পাচ্ছি কোথায়।

পেলাম মাঝখানে একটা দিন বাদ দিয়ে। কিন্তু তখন আর বলার কিছু দরকার হল না।

মনে পড়ে, প্রথম দিন শেঠের সরাইখানায় মহাদেবের ওপর মা-শাইনের সেই প্রাণ জল-করা রোষবর্ষণের পর বাইরে এসে সাণ্টু ঘোষ আমায় অভয় দিয়েছিল, রাত্রিতে হয়ত দেখবে এ ওর বাড়িতে, নয়ত ও এর বাড়িতে ডিনার খাচ্ছে।

মা-শাইনের বেলায় প্রমাণ পাইনি, কিন্তু ইন্দুমতীর বেলায় ভাবগতিক সেই রকমই দেখলাম প্রায়। ওদের এই মনোমালিন্য থেকে আবার কি নব-বৈচিত্র্যের সূত্রপাত হয় এই দ্বীপের রাজ্যে, সেকথা ভেবে ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু মাত্র একটি দিনের অবকাশেই আকাশ একেবারে তকতকে পরিষ্কার!

গিয়োনো ঘরে এক ঝলক আলোর মত সেং অর্সাহিফু কর্ম-তৎপর মূর্তিতে মহাদেবের আবিভাব। জানালো, জরুরী কথা আছে, বেরুতে হবে তক্ষুনি। আমায় নিয়ে জিপ সোজা এসে থামল ইন্দুমতীর বাড়ির দরজায়! ওর দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে পথে মা-শাইনের দোকান খোলা কি বন্ধ তা পর্যন্ত দেখতে ভুলেছি। ইন্দুমতী আগের দিনের মতই হালকা আপ্যায়ন করতে গিয়ে, বিশেষ করে চায়ের কথা বলতে গিয়ে চড়া সুরের ধমক খেল একটা। ধমক খেয়ে সুবোধ মেয়ের মত বসে রইল।

আঁটসাঁট হয়ে বসে মহাদেব পকেট থেকে কাগজ-পত্র বার করল এক গোছা। ইন্দুমতীকে বলল সেগুলি সাবধানে রাখতে। বলল, ওগুলোও সঙ্গে যাবে।

কিসের কাগজ কোথায় যাবে সঙ্গে, বুঝছি না। নেতৃস্থানীয় একজন তার বিশ্বস্তজনের সঙ্গে কিছু একটা কূট প্ল্যান আলোচনা করবে—প্রায় সেই রকমেই গাম্ভীর্য নিয়ে অপেক্ষা করছি। ইন্দুমতীও সেই রকমই চেষ্টা করছে।

এতখানির পর দু'কথায় মূল বক্তব্যটা শেষ করে ফেলল মহাদেব।—রয়ে সয়ে কোনো কাজ হবে না, যা করার সরাসরি জোর করেই করে বসতে হবে।

দুই ঠোঁট এক করে আছি। যে-রকম মেজাজ, আমাকেও থমকে ওঠা বিচিত্র নয়। গম্ভীর মনোযোগে তারপর কাজের ফিরিস্তি দিতে বসল সে।—দিনের মধ্যে পাঁচবার করে সরকারী দপ্তরে হানা দিতে হয়েছে, সহজ কথা কেউ বুঝতে চায় না, বুঝবে কেন, দরদ থাকলে তো! কিন্তু সে-ও সহজে ছাড়ার পাত্র নয়,

বুঝিয়ে ছাড়বে। লাঙল-বলদ আনবে, শুধু হাতে কোদালে চাষ হয় নাকি! তারপর, ঘর তোলার জন্য তৈরী কাঠ মঞ্জুর করাবে, জঙ্গল সাফ করার জন্য সরকারী খরচে মজুর আনাবে, পাঠশালার জন্য আলাদা ঘর তোলাবে, আর বৃষ্টির জল ধরার জন্য পাকাপাকি ব্যবস্থা করাবে কিছু। সবাই বলে, দিল্লীর স্যাংশন চাই, স্যাংশন কি করে পেতে হয় সে-ই দেখাবে।

আগের মতই উত্তেজিত দেখালো তাকে। বড়-সড় দম নিয়ে বলল, মোটামুটি থাকার ব্যবস্থা হলেই এক্ষুনি ত্রিশটি পরিবার গিয়ে উঠতে রাজি। দরখাস্ত করে সকলের সই নিয়েছি আমি, আর হ্যাভলকেও যারা আছে সকলের সই নিয়ে আসব—কালই যাচ্ছি আমরা, তুমি আসবে?···ফিরতে অবশ্য এবারে দিন কতক দেরি হবে।

—কোথায়? হ্যাভলকে? সশঙ্ক প্রশ্ন।

ইন্দুমতী হেসে বাধা দিল, থাক থাক, ওতেই হয়েছে।···কিন্তু আপনি এখানে বসেই বা করবেন কি, হাই সোসাইটির টিকা-টিপ্পনী শুনবেন?

মহাদেবের জরুরী কথা শেষ হয়েছে। এবারে সহজ হওয়া চলে বোধ হয়। বললাম, সেখানে গিয়েই বা থাকব কোথায়? ঘর তো একখানা!

ইন্দুমতী আনন্দের খোরাক পেল যেন।—আপনার সমস্যা তাহলে আমাকে নিয়ে? তা ঘরে যদি জায়গা না-ই দেন, আমি না হয় রান্নার চালার নিচে থাকব-'খন—আপনি নির্ভাবনায় চলুন।

মহাদেব বলল, সে যা হয় একটা ব্যবস্থা হবে'খন, যাবে তো চলো—।

আর হাসি-ঠাট্টার মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি আপত্তি জানালাম, না, আমি আর না, তোমরা ঘুরে এসো।

দিন কতকের জন্য এখান থেকে এই দু'জনের অনুপস্থিতি এক ধরনের শূন্যতার মতই অবাঞ্ছিত। কিন্তু সুখের থেকে স্বস্তি ভালো। ঝড়ের মুখে মাঝ-দরিয়া ভালো।···হ্যাভলক ওদের মুশকিল-আসান।

স্যান্টু ঘোষ খবরটা শুনে এক মুহূর্ত না ভেবেই মন্তব্য করল, মহাদেব তো আর বোকা নয়, সে-দিনের স্নান-লীলা আবার কোন্ লীলায় গিয়ে দাঁড়াবে, তাই নিয়ে সরে পড়ছে। শিগ্গীর আর ফিরছে না ওরা শুনে রাখো।

পছন্দও হয়নি, বিশ্বাসও না। কিন্তু পরদিন ক্লাবের বাঙালী জটলায়ও তার ধারণাটাই পাকাপোক্ত দেখলুম। বেগতিক দেখেই নাকি মহাদেব ইন্দুমতীকে নিয়ে হ্যাভলকে পালিয়েছে আবার।—আপনি তো কাল বিকেলে ওই মেয়েটার ওখানেই ছিলেন অনেকক্ষণ, কি বুঝলেন বলুন না? হাসির পালিশে ধারালো

হয়ে উঠেছিলেন মিসেস কর।

কিন্তু যে শ্বেতাঙ্গ পুরুষটির প্রেমাবগাহনের ফলে এই গুঞ্জন, তার সামনে হাসিঠাট্টার ধার দিয়েও গেলেন না কেউ। মনে হল, সাহেবদের প্রেম সম্বন্ধে একটা শঙ্কা-মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব আছে সকলেরই। অন্যান্য দিনের মতই সরাসরি কণ্ট্রাক্ট ব্রীজে বসে গেছে সাহেব। ইন্দুমতী ছেড়ে উর্বশী মেনকাতেও কিছুমাত্র আসক্তি নেই যেন। এক একটা দানের খেলায় অ-বনিবনার ফলে মৃদু হেসে তর্ক করেছে। বোঝাতে পারলে স্বীকার করে নিয়েছে, না পারলে মাথা নেড়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। একটু তফাতে বসে রোজকার মতই নিবিষ্ট-চিত্তে খেলা দেখেছে মার্থা। দূরের এক টেবিলে ডোরা রামি খেলায় মশগুল।

সেদিন আর একটি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এই সোসাইটি ক্লাবে এসে।

টমাস সাহেব। ডোরা মার্থার বাবা!

সেলুলার জেলের সেই দুর্ধর্ষ প্রাক্তন কর্মচারী, যিনি জারোয়া ধরেছিলেন এবং মহাদেবের জন্য যার কপাল খুলল না। এই বয়সেও দিব্বি লম্বা চওড়া চেহারা, নাকটা টকটকে লাল! নিজে থেকেই এসে আলাপ করলেন। এবং আলাপের পর নিজেই তিনি বিগত কর্মক্ষেত্রটি অর্থাৎ সেলুলার জেল দেখাবেন বলে আশ্বাস দিলেন। এরই মধ্যে একদিন সেই অবকাশ ঘটল। সাণ্টু ঘোষও অফিস কামাই করল সেদিন।

দূর থেকে হামেশা দেখেছি সেলুলার জেল। ভিতরে ঢুকলাম এই প্রথম। এমনই ভয়াবহ স্মৃতি জড়িয়ে আছে যে সামনে আসা মাত্র সমস্ত স্নায়ুতে ঝাঁকুনি লাগে। চারদিকে উঁচু প্রাচীর—ভিতরে সাইকেলের স্পোক-এর মত সাত সাতটা উইং। প্রত্যেকটি তিন তলা। জাপানী বোমায় দু'টি উইং ধূলিসাৎ হয়েছে।

আলো-আকাশ বর্জিত ক্ষুদ্রাকৃতি সেলগুলো দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। টমাস সাহেব বিগত দিনের কয়েদীদের গল্প করতে করতে দেখালেন সব। এখন শুধু মোটামুটি সাময়িক ব্যবস্থা আছে জেলখানার। আজকাল তেমন অপরাধ কিছু ঘটলে, অপরাধীকে প্রথম এখানে আনা হয়, তারপর মেন-ল্যাণ্ডএ চালান দেওয়া হয়।

একটা উইং-এর একতলা দোতলা তিনতলা ছাত—সর্বত্র ঘুরে এসে একতলার কোণের দিকে ফাঁসী ঘর দেখাতে নিয়ে এলেন টমাস সাহেব। কি হত সব বোঝালেন। সেই ঘরের মধ্যে কেন জানি সুস্থ হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না পর্যন্ত।

একটা লোহার হাতল দেখিয়ে টমাস বললেন, এটা টানলেই তোমার পায়ের নিচের ওই কাঠ সরে গেল—

ব্যাং! ব্যস্!

আবার একজন দাঁড়াল, আবার টান পড়ল, ব্যাং—!

একসঙ্গে পাঁচ-সাতজনকেও এনে দাঁড় করানো হত—

ব্যাং! ব্যাং! ব্যাং! ব্যাং! ব্যাং!—ফিনিশ!

প্রত্যেকবার কচুগাছ কাটার মত করে হাত ঝাঁকালেন টমাস।

বেরিয়ে এসে হাঁপ ফেলে বাঁচলাম। সাহেব জানালেন, ডিউটি না করে উপায় কি, গোড়ার দিকে তো ঝাঁকে ঝাঁকে মরত। ওপরঅলার হুকুমে অনেক সময়েই তাঁকে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে হত। কষ্ট হত খুবই। মন চাইত না। কিন্তু সুযোগ সুবিধে পেলে এখনো তিনি অম্লানবদনে একজনকে ব্যাং করে দিতে পারেন, একটুও কষ্ট হবে না—দ্যাট ন্যাস্টি লোকাল বর্ন!

সান্টু ঘোষ এবং আমি হতভম্ব নেত্রে তাকালাম পরস্পরের দিকে। নাকের ডগা টকটকে লাল হয়ে উঠল সাহেবের। বললেন, তোমাদের সঙ্গে আলাপ আছে শুনেছি, বাট আই ডোণ্ট কেয়ার—হি ইজ জাস্ট এ ন্যাস্টি লোকাল বর্ন!

শুধু জেলখানার চাপ-ধরা ভয়াবহ পরিবেশই স্নায়ু তচনচ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তার ওপর ফাঁসী ঘরের বিভীষিকা হৃৎপিণ্ডে মুগুরের ঘা দিচ্ছিল। টমাসের মারাত্মক মহড়ার ব্যাং ব্যাং আওয়াজটা তখনো কানের ভিতর দিয়ে যেন কুরে কুরে ভিতরে ঢুকছিল। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসেই এই উক্তি!

লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছেন টমাস সাহেব। তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলা সহজ নয়। জখম পা নিয়ে সান্টু ঘোষ তো রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। লোকটা বিদায় নিলে বাঁচি এখন। আমরা দু'জন পাশাপাশি গা ঘেঁষে চলেছি। আর খানিকটা এগিয়ে হ্যাডোর পথে এসেই ওঁকে সবিনয়ে বিদায় দেওয়া যাবে বোধ হয়!

সম্প্রতি মহাদেবের প্রতি সান্টু ঘোষের মনোভাব যেমনই হোক, এতটা ক্রুরতা সেও বরদাস্ত করতে পারল না। ফিস ফিস করে বলল, সেই যে জংলি ছেড়ে দিয়েছিল সেই রাগ, বুঝলে না—ব্যাটা দু'কথা শোনাবার জন্যেই সেধে সেধে জেল দেখাতে এনেছে।

হোয়াট ডু ইউ সে? টমাস ফিরে তাকালেন।

সান্টু ঘোষ থতমত খেয়ে গেল। বললাম, তুমি সঙ্গে ছিলে বলে জেলটা এত ভালো করে দেখা গেল···সেই কথা হচ্ছিল।

ঠিক বিশ্বাস করল কিনা সেই জানে। চকচকে দু'চোখ একবার মুখের ওপর বুলিয়ে দিয়ে তেমনি সদম্ভে পা ফেলে এগোতে এগোতে বলল, ইয়েস—এখনকার কর্মচারীরা আমাকে এখনও খুব সম্মান করে দেখলেই তো। তোমাদের বন্ধুকে বলে দিও তার খুব বরাত ভালো যে এখন আর আমি চাকরি করিনে—কিন্তু এখানে একবার আনতে পারলে আমি তাকে বুঝিয়ে ছাডব—হ্যাট ফুল অফ এ লোকাল বর্ন! সে আমার মেয়েদের সঙ্গে মিশতে সাহস করে!

ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠছি। কিন্তু কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ পাবার আগেই সামনের হ্যাডোর মোড ছাড়িয়ে ঘ্যাঁস করে আমাদের পাশেই ট্যাক্সি থামল একটা। পরমুহূর্তে নির্বাক আমি! ট্যাক্সির ভিতর থেকে গলা বাডালো হেওয়ার্ড।···তার পাশে একখানি পাথরের মূর্তির মত বসে মা-শাইন!

—হ্যালো! হ্যালো—

আমার আগেই সানন্দে বিস্ময় জ্ঞাপন করে উঠলেন টমাস। কিন্তু উচ্ছ্বাস শেষ হবার আগেই কে যেন সাঁডাশি দিয়ে তাঁর গলা চেপে ধরল। মা-শাইনের দিকে চোখ পডার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাস নিবে গেল।

মা-শাইন এতটুকু ঘাড ফেরালো না। তাঁর দিকেও না আমাদের দিকেও না। যেন সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে নিষ্প্রাণ মোমের মূর্তি একটি।

স্বভাবসুলভ মৃদু হেসে হেওয়ার্ড টমাসের উদ্দেশে শুধু মাথা নাডল একটু। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আসছ ক্লাবে? একে পৌছে দিয়ে আমি সেইখানেই যাচ্ছি!

একে পৌছে দিয়ে অর্থাৎ পার্শ্ববর্তিনীকে পৌছে দিয়ে। কিন্তু তাকে পৌছে দেওয়ার কারণ ঘটল কি করে সেই ভেবেই তাক লেগেছিল আমার। জবাব দিলাম, আজ বড ক্লান্ত লাগছে।

—একদম আসছ না, না পরে আসবে?

—না আজ আর ভালো লাগছে না।

—ও. কে! কাল দেখা হবে তাহলে—

ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল।

টমাস সাহেবের ঘোলাটে দৃষ্টি ধাবমান ট্যাক্সির দিকে। ওটা আডাল হতে ঘুরে দাঁডালেন। অস্বস্তিকর চাউনি। বিড বিড করে বললেন, হি ইজ হ্যাভিং এ মেরি টাইম, বাট শী ইজ এ ডেঞ্জারাস উওম্যান·· হি সুড'ন্ট্ গো আফ্টার হার।

আত্মস্থ হয়ে আমাদেরই যেন দুই চোখে বিদ্ধ করে নিলেন একবার—আচ্ছা,

তোমরা যাও, আমি এদিকে যাব।

আর কোনো সম্ভাষণ না জানিয়ে হাডোর বিপরীত দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোলেন তিনি।

সান্টু ঘোষ নিজের মধ্যে ফিরে এলো এতক্ষণে। চাপা গলায় ব্যঙ্গ করে উঠল, ডেঞ্জারাস উওম্যানটিকে দেখেই তোমার তো হয়ে এসেছে দেখি—এখন যাও একধার থেকে মদ গেলো গে বসে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়া দিল, একেবারে হাঁ করে ফেললে যে, কি ব্যাপার? চলো—

—না, মানে হেওয়ার্ডের সঙ্গে ওই বর্মী মেয়েটি···

হাল ছেড়ে দিয়ে সান্টু ঘোষ বলল, তোমার সবেতেই অবাক হওয়া! আরে বাবা এখানে সকলেই ওকে চেনে, কেউ মেশে কেউ মেশে না—যার দরকার সেই মেশে। এই মদ আমদানী বন্ধের বাজারে ভালো জিনিস পেতে হলে ওরাই তো ভরসা! মুখ মুচকে হাসল একটু, নিজেও কম নয়, তৈরীও করে শুনেছি ভালো জিনিসই—কদর হবে না? তাছাড়া হেওয়ার্ডের সঙ্গে তো ওর দস্তুরমত ভাবই আছে!

বোঝা গেল, সাহেবদের ব্যাপার নিয়ে সান্টু ঘোষও গরম হয়ে ওঠে না তেমন। হলে এখানেই থামত না।

বিকেল গড়িয়ে অন্ধকার হয়ে আসছে। বাড়ি ফিরে দেখি দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে ফকিরুদ্দিন। আমার উদ্দেশে গুরুগম্ভীর সেলাম ঠুকল একটা। হেওয়ার্ডের সঙ্গে হৃদ্যতা প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছি। রাস্তায় হোক বা যেখানে হোক, দেখা হলেই সেলাম করে। সান্টু ঘোষ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে এ সময়ে অথবা এই অসময়ে আসার কারণ জানালো। আজও কিছু ভালো খানা আনতে পারে, আনবে কি না জিজ্ঞাসা করতে এসেছে।

ঘর খুলে দিয়ে সান্টু ঘোষ সমাদরে বসালো তাকে। বলল, নিশ্চয় আনবে। দু' দিন ধরে আমি তো তোমার কথাই ভাবছিলাম—। তারপর তাকে খুশি করার জন্যই যেন খবরটা দিল।—ট্যাক্সিতে তোমার সাহেবের সঙ্গে মা-শাইনকে দেখে বাবু খুব অবাক হয়েছেন!

একটু থেমে গম্ভীর মুখে ফকিরুদ্দিন জবাব দিলে, মা-শাইন ইজ্ ভেরি গুড, কিন্তু সে তো শুধু মহাদেব-সাহেবের জিপ ছাড়া আর কারো গাড়িতে চড়ে না—! ব্যতিক্রমের মত লাগছে কোথায়, তাই তলিয়ে ভেবে নিতে চেষ্টা করল দু'চার মুহূর্ত। তারপর স-টীক মন্তব্য করল, এদিকে মা-শাইন মোটরে চড়ছে, ওদিকে

থ-মিন সাহেবের কানে কি গুজগুজ করে—'ইণ্টারেস্টেড' একটা কিছু ঘটবে।

কিছু ঘটবে বলে নয়, ইংরেজির বহর শুনে ফিরে তাকাতে হল। সাণ্টু ঘোষ সংশোধন করছে, ইণ্টারেস্টেড নয় ফকির, বলো ইণ্টারেস্টিং।

গম্ভীর মুখে অস্বীকার করল ফকির, আমি ইণ্টারেস্টেড।

ফকিরের ভবিষ্যদ্বাণীর একটি সূচনা দেখব এই রাত্রিতেই আমি বা সাণ্টু ঘোষ কেউ কল্পনা করিনি। যথা সময়ে আহার্য নিয়ে হাজির হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং নির্বিকার মুখে সাণ্টু ঘোষের হাত থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট খাকী হাফ-শার্টের পকেটে গুঁজে সে বিদায় হতেই শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করছে তখনও। স্নায়ুর ওপর এতটা ধকল যাবে জানলে টমাসের সঙ্গে সেলুলার জেল দেখার আগ্রহ হত না।

এ ক্লান্তির পরে আবার কুকারের পিছনে লাগতে হবে না বলেই সাণ্টু ঘোষ কিছুটা প্রসন্ন। হাত মুখ ধুয়ে কালী এবং গণেশের পট দু'খানির দু'পাশে দুটো করে ধূপকাঠি জেলে দিল। তারপর বিছানায় পা ছড়িয়ে বসল মালিশ করতে—বুড়ো হাড়ে চোট খেলে সহজে সারার নয়। একদিকে মালিশ চলছে, অন্যদিকে মুখ। খানিক কানে যাচ্ছে খানিক যাচ্ছে না। এদিক থেকে তেমন সাড়াশব্দ না পেয়ে তার বকুনি থামল এক সময়। মালিশ শেষ করে সে-ও শুয়ে পড়ল।

কখন আবার ফকিরুদ্দিন আসবে না আসবে ভাবতেও ভালো লাগছিল না। যা হোক দুটো মুখে দিয়ে রাতের পাট শেষ করতে পারলে হত। এরপর ও লোকটা এলে তো আবার আর এক দফা গজর গজর শুরু হবে।

—বাবুজী!

কান খাড়া করে দরজার দিকে চেয়ে দেখি এই বাড়ির দাওয়ার বাসিন্দা একজন! দাওয়ার বাসিন্দা অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর যে দু'চারজনকে সামনের দাওয়ায় প্রায় অষ্ট প্রহর যাপন করতে দেখা যায়, তাদেরই একজন।

সাণ্টু ঘোষ বিছানায় উঠে বসেছে। লোকটা জানালো, বাইরে মিসি মেম সাহেব বাবুজীকে ডাকছে।

এবারে আমিও উঠে বসার উপক্রম করছি। সাণ্টু ঘোষ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ মিসি মেম সাহেব?

—টমাস সাহেবের ঘরের মিসি মেম সাহেব।

সাণ্টু ঘোষের চোখ কপালে উঠেছে প্রায়।—আমাকে ডাকছে?

লোকটা জানালো, না, নয়া বাবুজীকে।

সাণ্টু ঘোষ কেন, আমিও হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। চকিতে ইন্দুমতীর বাড়িতে

ডোরা টমাসের সেই ভাব-ভঙ্গি মনে পড়ে। যা দেখে মনে হয়েছিল সুযোগ সুবিধে পেলে আমাকে বলত কিছু। কিন্তু তার পরেও তো ক্লাবে ক'বার দেখা হয়েছে, সেই আভাসও আর পাইনি।

সান্টু ঘোষ জিজ্ঞাসা করল, মেম সাহেব কোথায়?

লোকটা চলে যেতে যেতে জবাব দিয়ে গেল, বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

সান্টু ঘোষের বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি এড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। অদূরে রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে আছে বটে···। স্বল্প আলোয় ভালো ঠাওর হয় না।

হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে আবারও বিমূঢ় আমি।

দাঁড়িয়ে আছে ডোরা টমাস নয়। মার্থা।

কুণ্ঠিত লজ্জায় কাছে এসে বলল, তোমাকে ডেকে খুব বিরক্ত করলাম বোধ হয়?

সহজ হতে চেষ্টা করে বললাম, না না, বিরক্তি কিসের···কিন্তু এ সময়ে যে?

বিব্রত ভাবটুকু কাটিয়ে উঠতে পারছে না মার্থা। ঢোক গিলে বলল, এমনি··· তুমি ব্যস্ত ছিলে না তো?

—না, সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছি তাই আজ আর বেরুইনি।

—বাবার সঙ্গে তোমরা সেলুলার জেলে গেছলে, না?

—হ্যাঁ।

আবার একটু ইতস্তত করে মার্থা বলল, বাবা নাকি মহাদেবকে যা তা বলেছে তোমাদের কাছে···বাবাই বলছিল···বাবা ওইরকম বলে, তোমরা কিছু মনে করোনি তো! মহাদেব সত্যি খুব ভালো লোক—

এই মেয়েটার নরম স্বভাব দেখলে কেমন মায়াই হয় সব সময়। হেসে বললাম, না আমরা কিছু মনে করিনি, কিন্তু এই কথা বলতে তুমি কষ্ট করে এলে?

—না, ঠিক এই কথা বলতে আসিনি··। হেসেও সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারল না তেমন, বলল, আমার অন্য একটু কথা ছিল তোমার সঙ্গে—

এবারে আবার সেই অস্বস্তিকর বিস্ময়ের পালা। দ্বিধা কাটিয়ে ভদ্রতা করাও খুব সহজ নয়। তবু বলতে হল, ঘরে আসবে?

ব্যস্ত হয়ে জবাব দিল, না না, ওখানে হবে না। ব্যস্ততার দরুনই আবার যেন লজ্জা পেল একটু।—আজই দরকার নেই, কাল সুবিধে মত এক সময় দেখা হলে ভালো হয়।

—কিন্তু আমি তো তোমাদের বাড়ি চিনি না ঠিক···

ভাবছি, চালাক মেয়ে হলে অজুহাতটা বুঝবে যে তাদের বাড়িতে আমার যাবার ইচ্ছে খুব নেই। কিন্তু জবাব শুনে হকচকিয়ে গেলাম। ইতস্তত করে বলল, বাড়ি এই হ্যাডোতেই···কিন্তু বাড়িতেও ঠিক সুবিধে হবে না।

কি রে বাবা! এর পরে আগ বাড়িয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয় না! রাস্তা দিয়ে দু'জন একজন লোক আসছে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে না দেখে যাচ্ছে না তারা। একটু হেসে তেমনি সলজ্জ কুণ্ঠায় বিড়ম্বনার অবসান করল মার্থা!—কাল দুপুরে তুমি যদি একবারটি সমুদ্রের ধারের সেই ঘরটিতে আসতে পারো—সেই যেখানে বসে তোমার সঙ্গে প্রথম দিন আলাপ হল—আসবে?

অর্থাৎ যেতে হবে হাওয়া-ঘরে। অনুরোধ নয়, অনুনয়। আমি মুখে কিছু বলিনি। বলতে পারিনি। কিন্তু মাথা নেড়ে স্বীকৃত হয়েছি নিশ্চয়। কারণ তামাটে দাগ ভরা করুণ মুখখানি খুশিতে ভরে উঠল। বলল, আমি জানি তুমি খুব ভালো, আচ্ছা আর তোমাকে বিরক্ত করব না, কাল দেখা হবে, গুড নাইট—

বোকার মত রাস্তায় একা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব। ফিরলাম। আমি যাবার পর থেকেই হয়ত সাণ্টু ঘোষ সুস্থভাবে আর বিছানায় বসে থাকতে পারেনি। জানালায় ঠেস দিয়ে অন্ধকার রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বললাম সব। ডোরা নয়, মার্থা শুনেই সাণ্টু ঘোষের অর্ধেক উত্তেজনা গেল। তবু প্রথমে গম্ভীর এবং ক্রমশ হালকা আগ্রহে অনেক রকম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চেষ্টা করল সে।

বিশ্লেষণ আমিও কম করিনি। কাল যতক্ষণ পেরেছি ভেবেছি। আজও সকাল থেকেই ভাবছি। কূল-কিনারা পাইনি। অফিসে যাওয়ার আগে সাণ্টু ঘোষ আবার ঠাট্টা করে গেছে, ওহে, তুমি যে বিয়ে থাওয়া করে নাকে দড়ি পরে বসে আছ শ্রীমতীটি জানে তো?

বিরক্তিকর।—আমার বদলে তুমিই না হয় চান্সটা নাও! গিয়ে জানিয়ে এসো—

বিকেলে এসে সমাচার শোনার আশা নিয়ে সাণ্টু ঘোষ মনের আনন্দে অফিস করতে গেছে। আমি ভাবনা বাতিল করতে চেষ্টা করেছি তারপর। গেলেই শোনা যাবে। এত ভাবাভাবির কি আছে···।

হাওয়া-ঘরে উঠে তারপর মনে হল, দুপুরে আসতে বলেছিল, কিন্তু দুপুর মানে ক'টা? এখন তো সবে দেড়টা। যাক, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

দূর থেকে আমাকে দেখেই মার্থা থমকে দাঁড়াল একবার। তারপর একমুখ

হাসি নিয়ে এবড়ো-খেবড়ো পথ পেরিয়ে প্রায় দৌড়ে আসতে লাগল। সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠল যখন, বেশ পরিশ্রান্ত। কিন্তু বেশ আনন্দের শ্রান্তি যেন।

—হ্যালো! তুমি এসে গেছ! আমি ভাবছিলাম আমিই আগে আসছি··· কতক্ষণ এসেছ? অনেকক্ষণ?

—না এই তো···বোসো।

বাতাসের দাপট থেকে ঝাঁকড়া বাদামী চুলের গোছা সামলে দু'হাতে পিছনে ঠেলে দিল। তারপর পা মুড়ে বসে পড়ল হাঁটুর নিচে স্কার্ট গুঁজে দিয়ে।

একটু তফাতে আমিও বসলাম। তেমন খেয়াল না করেই মাঝের ব্যবধানটুকু দেখে নিল মার্থা। তারপর নীল চোখে অনুনয় মিশিয়ে বলল, তোমাকে এভাবে ডেকে এনেছি বলে রাগ করোনি তো?

—না রাগ কেন করব, আমার তো শুয়ে বসেই কাটে দুপুরটা।

শুনে খুশি হল। বলল, আমি জানি তুমি ভালো লোক, হেওয়ার্ডও তাই বলে।

হাসি পেয়ে গেল। ইন্দুমতী বলেছিল, মহাদেব পর মনে করে না বলে সেও মনে করে না। আর এদিকে হেওয়ার্ড বলে ভালো লোক তাই এও তাই জানে। ভালো লোক হয়ে হাসতে লাগলাম আর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু মার্থা যেন গল্প জুড়ে বসল ভালো লোকের সঙ্গে। বলল, ক্লাবে এরই মধ্যে কণ্ট্রাক্ট ব্রীজে তোমার খুব নাম হয়ে গেছে, হেওয়ার্ডও সেদিন বলছিল, তুমি খুব ভালো খেলো।

ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি। এভাবে খুশি করার চেষ্টা না করে আসল বক্তব্য কি বলে ফেললেই তো পারে। গত রাতের সানুনয় আহ্বান যখন ভালো লোক আর ভালো তাস খেলি বলার জন্যে নয়—এই শুনতেও আসিনি। সে-ভাব প্রকাশ না করে হেসেই জবাব দিলাম, হেওয়ার্ডের বলার দৌড় আর আমার খেলার দৌড় এক রকমই।

সরল বিস্ময়ে তার নীল চোখ দুটো যেন আমার মুখের ওপর আটকে গেল। —কেন, হেওয়ার্ড কি খারাপ খেলে নাকি?

—আচ্ছা বিপদ।—না, খারাপ খেলবে কেন···ভালোই খেলে।

—তবে? সে যখন অমন বলে নিশ্চয় তুমি খুব ভালো খেলো।

হার মেনে হাসি মুখে স্বীকার করলাম ভালো খেলি। নীরব জিজ্ঞাসায় তাকালাম। অর্থাৎ, সে তো হল—এবার কি বলার আছে বলে ফেলো। সেটুকু উপলব্ধি করেই বিব্রত লজ্জায় মাথা নোয়ালো একটু। আর মুখখানি করুণ

দেখালো তক্ষুনি। কোলের কাছ থেকে রুমালে জড়ানো বস্তুটি হাতে তুলে নিল। ওটা চোখের সামনেই পড়ে ছিল এতক্ষণ, কিন্তু খেয়াল করিনি। রুমালের ভাঁজে ভাঁজে বেশ করে জড়ানো।

ভাঁজ খুলতে লাগল। যত খুলছে, দুই চক্ষু স্থির হয়ে আসছে আমার।

রুমালের ভাঁজ থেকে বেরুলো সুদৃশ্য এক প্যাকেট তাস।

বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে আরো সঙ্কুচিত হয়ে উঠল মার্থা। প্যাকেট থেকে তাস বের করে কোন রকমে বলল, আমাকে কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ খেলাটা একটু শিখিয়ে দিয়ে যাও তুমি···আমার খুব শখ, কিন্তু কেউ শেখাবার নেই। আমি ঠিক শিখে নেবো—শেখাবে ?

অনুরোধ নয়, অনুনয়, আকূতি। তাস খেলা শিখতে চায় তাতে এত লজ্জা এত সঙ্কোচ এত গোপনতা কেন ? অনুমান করা কঠিন নয়। শিখতে চায় নিজের তাগিদে নয়, খেলার আনন্দের তাগিদেও নয়। শিখতে চায় কিছু একটা আশার তাড়নায়। সেখানেই সঙ্কোচ। ভরা দুপুরে সমুদ্রের শাঁ শাঁ বাতাসের মধ্যে বসেও গুমটের মত লাগছে। ভিতরে কি একটা অনুভূতি টনটনিয়ে উঠতে চাইছে। যে-ভাবে বলল, যদি বলত উড়তে শিখতে ইচ্ছে করছে, সাধ্যায়ত্ত হলে তাও চেষ্টা করতে ইচ্ছে যেত।

নিবিড় প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছে মার্থা। যেন একটা কথার ওপর জীবন-মরণ নির্ভর এখন। হালকা হেসে নিজে সহজ হতে চেষ্টা করলাম আগে। হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে তাসের গোছা নিলাম। আঙুলের চাপে তাসের ফর্ ফর্ শব্দ করলাম গোটা কতক। তারপর বললাম, এই কথা বলতে এত সঙ্কোচ কিসের—খুব ভালো কথা তো···কিন্তু কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ তো ঠিক এভাবে শেখার সুবিধে হবে না।

দমে গেল।—শিখতে পারব না বলছ ?

—নিশ্চয়ই পাবেে, তোমার যে-রকম আগ্রহ চট্ করেই শিখে যাবে। বলছিলাম, মুখে মুখে মাস্টারী করে শেখানোটা ঠিক সহজ হয় না, কণ্ট্রাক্ট ব্রীজের কতকগুলো খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে, গোড়ায় গোড়ায় যদি একটু আধটু বই পড় তাহলে আর কিছু কঠিন লাগবে না।

—বই ! মার্থা অবাক, এর আবার বই আছে নাকি ?

—অনেক বই আছে। মোটামুটি দুই একখানা পড়লেই হবে, গোড়া থেকে সব শেখা যাবে।

—কি আশ্চর্য ! আমি তো ভাবতেই পারিনি, কিন্তু—

খুশির মুখেও নিরাশ হয়ে পড়ল, আমি বই পাবো কোথায় ?

—আমি কলকাতায় পৌছেই তোমার নামে বই পাঠাবো।

খুশিতে, কৃতজ্ঞতায় খানিকক্ষণ কথা সরে না মার্থার মুখে। রোজ রোজ এসে তাস খেলার পাঠ নেওয়া অপেক্ষা এটা তার কাছে অনেক সহজ, অনেক নির্ঝঞ্ঝাট মনে হল। তবু, বাসনা পূরণের এত সহজ পথ পাবে এ যেন সহজে বিশ্বাস হয় না।—কিন্তু তুমি ভুলে যাবে না তো ?

—না ভুলব না, গিয়েই পাঠাবো।

আনন্দে দু'হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে ফেলল মার্থা।—খুব ভালো হবে, চমৎকার হবে…ইউ আর রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল !

কিন্তু ভাবছিলাম আমি। কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ সত্যিই আর কতটুকু জুড়বে ?

*

* *

সকলকে নিরাশ করে অথবা আশান্বিত করে যথাদিনে ইন্দুমতীকে নিয়ে মহাদেব ফিরে এলো। আসবে জানতুম। নির্দিষ্ট সময়ে পায়ে পায়ে মেরিনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

এক মুখ হেসে ইন্দুমতী বোট থেকে নেমে এলো।—আপনার যে দেখি বেজায় সাহস, একেবারে রিসিভ করতে এসে গেছেন !

মহাদেবের দিকে চোখ পড়তেই শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। তার সমস্ত মুখে গাম্ভীর্যের বর্ম আঁটা।…নতুন করে আবার কিছু নিয়ে লাগল, না কি সেই পুরনো ব্যাপারের জের ! কিন্তু মহাদেবের সেই মেজাজ তো যাবার আগেই ঠাণ্ডা হয়েছিল। ইন্দুমতীর দিকে চেয়ে মনে হল, নতুন কিছুই হবে এবং সেটা গুরুতর কিছু নয়। অন্যথায় এমন পরিতুষ্ট তাজা দেখাতো না তাকে। ইশারায় জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার ?

জবাব না দিয়ে ইন্দুমতী হাসতে লাগল। মহাদেব কাছে এসে বলল, অনেক কাজ এখন, আমি বাড়ি চললাম। আমাকে ডাকল, এসো—

ইন্দুমতী সেই দিনের মতই বাধা দিল, বা রে ! তোমার কাজ আছে তুমি যাও না, ওঁকে ডাকছ কেন ? উনি নিশ্চয় আমাকে রিসিভ করতে এসেছেন, তোমার জন্য আসেননি। চলুন…

উভয় সংকট অবস্থা। এদের ছেলেমানুষি কাণ্ডকারখানা দেখে হাসব না অবাক হব ! মহাদেব একবার সোজাসুজি নিরীক্ষণ করল তাকে। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল। সেদিকে চেয়ে ইন্দুমতী হাসতে লাগল

আবার !

মনে মনে বিব্রত বোধ করছিলাম। ইন্দুমতী যা বলল, খুব মিথ্যে নয় হয়ত শুধু মহাদেব আসছে জানলে আসতুম কি না কে জানে। কিন্তু এ সরাসরি সেটা বলে বসল কি করে! হাসিমুখে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলাম, শুধু তোমাকে রিসিভ করতে এসেছি জানলে কি করে ?

ইন্দুমতী হাসতে লাগল।—যাক, আপনি বলাটা ঘুচেছে তাহলে! আমার জন্যে না এসে থাকেন তো যান না, ওরা তো যাচ্ছে।

আর ঘাঁটানো যুক্তিযুক্ত মনে হল না। সামনের ট্যাক্সির দিকে তাকাতে ইন্দুমতী বলল, খানিক হাঁটি চলুন, বসে বসে গায়ে ব্যথা ধরে গেছে।

চড়াইয়ের পথে পা বাড়ালাম। মেরিনের দু'পাশের লোক কাজ ফেলে এদিকেই চেয়ে আছে। ফাঁকা রাস্তায় এসে জিজ্ঞাসা করলাম, মহাদেবের আজ আবার হল কি ?

হাসি চেপে ইন্দুমতী বলল, বেজায় চটেছে, সারা পথ একটাও কথা বলেনি।

—সেবার তো লেগেছিল বাগান নিয়ে, এবারে কি ?

উৎফুল্ল মুখে জবাব দিল, এবারে মাচার ঘর রঙ করা নিয়ে—বুদ্ধি দেখুন, কাঠের ঘর রঙ না করলে পোকায় কাটবে না ?

কি মনে হতে জিজ্ঞাসা করলাম, সেটা ওকে বুঝিয়ে বলেছিলে ?

ইন্দুমতী হেসে ফেলল। জবাব না দিয়ে ঘাড় নাড়ল শুধু। বলেনি।

হাভলকে মাস্টারের কথা মনে পড়ল, দিদি একটু কেয়ার করলে দাদা অত বকতেন না। কথাটা বলব ভেবেছিলাম। ভুলে গেছি। কিন্তু ইন্দুমতী কেয়ার করে না কেন ? অন্তত দেখাতে চায় কেন যে কেয়ার করে না। বললাম, আগের কালে ছেলে-মেয়ের খুব কম বয়সে বিয়ে হত যখন, দিন রাত তখন দু'টিতে তোমাদের মত এ-রকম ঝগড়াঝাঁটি করত শুনেছি।

ইন্দুমতী হালকা তর্জন করে উঠল, সে বরং আপনার বন্ধুকে শোনান গে যান —দিন রাত আছেই কেবল মেজাজের ওপর।

তর্ক না করে এবার একটা খোঁচা দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। —ওর মেজাজের লাগাম তো তোমার হাতে। সেবারের বাগান-পর্বের রাগ পড়তে তো সময় লাগেনি, এবারে লোকটাকে এতক্ষণ কষ্ট দিলে কেন ?

বলে ফেলে নিজেরই খারাপ লাগছিল। কিন্তু ওর মুখের বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখে মনে হল ভালই করেছি। ইন্দুমতী চকিতে তাকালো একবার। তারপরেই লাল হয়ে উঠল সমস্ত মুখ। ওর এত লজ্জা আছে জানতুম না। অস্ফুট স্বরে

বলল, যান্, আপনারা সবাই বড় ইয়ে—

সামনের একটা চলতি ট্যাক্সি হাত তুলে থামিয়ে ফেলল।—নিন্ উঠুন, আর হাটে না।

ট্যাক্সি চড়তেই অন্য কথা পাড়ল তাড়াতাড়ি।—এখানকার খবর কি বলুন।

রক্তিম লজ্জা-ত্রস্ততাটুকু উপভোগ করার মতই। নিজেই বা এতটা সহজ হয়ে উঠেছি কি করে জানি না। বললাম, এখানে সকলের ধারণা, মহাদেব তোমাকে নিয়ে হ্যাভলকে পালিয়েছে, আর শিগ্‌গির ফিরছে না।

—ও মা, কেন ?

—হেওয়ার্ডের ভয়ে।

শুনে রীতিমত খুশি হয়ে উঠল ইন্দুমতী।—সকলের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আপনি কি ভেবেছিলেন ?

—আমি কি ভেবেছিলাম দেখতেই তো পাচ্ছ, ঠিক দিনে ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছি। কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, হ্যাভলকে পাকাপাকিভাবে থাকতে তোমার কেমন লাগবে ?

ঘুরে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল ইন্দুমতী। পরে পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনার কি মনে হয় ?

মহাদেবের এই উৎসাহে এর সায় কতটা সে-সম্বন্ধে সংশয় ছিল বলেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাব না পেয়ে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলাম—কি জানি, তা এবারে যে জন্যে গেছলে কাজ হল ?

—হল। কিন্তু এ আর কি, আসলই বাকি। কি বলার মুখেও থমকে গেল। —থাক বাবা, খবরটা ওর মুখেই শুনবেন, আমি ফাঁস করে দিয়েছি শুনলেই হয়ত রেগে আগুন হবে আবার—আর আপনি মজা দেখবেন।

ইন্দুমতীর অনুরোধ সত্ত্বেও তার বাড়িতে নামিনি। আর একসময় আসব কথা দিয়ে ওই ট্যাক্সিতেই ফিরে চলেছি। ওদের ওই রাগের ব্যাপারটাই মনের মধ্যে আনাগোনা করছে। মহাদেবকে সমস্ত সময় রাগাতেই চায় ইন্দুমতী, কিন্তু কেন ? আর মহাদেবই বা এত অল্পে সত্যি সত্যি এমন রেগে ওঠে কেন ? অন্যের বেলায় তো এরকম হয় না ··।

ইন্দুমতী যে খবরটা দিতে গিয়েও বলল না, সেটা জানা গেল পরদিন রাত্রিতে। সোসাইটি ক্লাবে।

গভীর মনোযোগে খেলা চলছিল। পাশে বসে অনেকে দেখছেন। হেওয়ার্ডের পিছনে আজ ডোরা বসে। কারণ, পাশের এক টেবিলে টমাস সাহেব রামি

খেলছেন। মার্থা আমার তাসের দিকে ঝুঁকে আছে সেই থেকে। সারাক্ষণই তার মুখে একটা খুশির আমেজ লক্ষ্য করেছি। খেলাটা শিগ্‌গিরই ভালোভাবে করায়ত্ত করতে পারবে সেই আনন্দে সম্ভবত। খেলার ফাঁকে ফাঁকে ভাবছিলাম, মনের আকাঙ্ক্ষাটা মার্থা ডোরার কাছে ফাঁস করেছে কি না। সম্ভব না···।

ক্লাব ঘরে হঠাৎ একটা চকিত গাম্ভীর্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে মুখ তুলে দেখি মহাদেব দাঁড়িয়ে। ট্রাউজারের দুই পকেটে দুই হাত ঢোকানো! মুখে সপ্রতিভ হাসির আভাস।

হেওয়ার্ডও আগে দেখেনি। চোখে চোখ পড়তে থমকে গেল একটু। বলল, হ্যালো···।

মহাদেবও বলল, হ্যালো।

নিজের অজ্ঞাতে আমার চোখ গেল টমাস সাহেবের টেবিলে। খেলা ফেলে টমাস এদিকে ঘুরে বসেছেন প্রায়। বলা বাহুল্য তাঁর দৃষ্টি প্রসন্ন নয়। মহাদেবকে আর ডোরাকে নিরীক্ষণ করছেন তিনি।

হাতের খেলা শেষ হতে মহাদেব আমাদের দু'জনকে দু'হাতে ধরে বাইরে টেনে নিয়ে এলো। কোন ভনিতা না করে হেওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কলকাতা যাচ্ছ কবে?

সসঙ্কোচে তাকালাম হেওয়ার্ডের দিকে! পোর্টব্লেয়ারে এই প্রথম সাক্ষাৎকার দেখছি এই দুজনের। যে-ভাবে টেনে নিয়ে এলো, এককালে অন্তত হৃদ্যতা ছিলই মনে হয়। হেওয়ার্ড শান্ত মুখে প্রশ্ন করল, কেন বলো তো?

মহাদেব বলল, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব, অবশ্য আমরা দিল্লী—কলকাতা হয়েই তো যেতে হবে? এখান থেকে রিপ্রেজেনটেশান পাঠিয়ে কিচ্ছু হবে না, নিজেদেরই যাওয়া দরকার—এদিকে জাহাজ আসতেই ঢের দেরি শুনছি··· তুমি কবে পর্যন্ত যেতে পারবে?

এই আমরা বলতে আর কে যাবে মহাদেবের সঙ্গে, সেটা অনুক্ত থাকলেও না বোঝার কথা নয় কারোই। গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল একটা। হেওয়ার্ডের মুখে বিরূপতার চিহ্নমাত্র নেই। একটু ভেবে জবাব দিল, ঠিক করে বলা শক্ত, সী বেশ রাফ এখনো···। হাসল একটু, তবে তোমাদের জন্য চেষ্টা করে দেখতে পারি—পাঁচ দিনের মধ্যে পারা যাবে হয়ত।

মহাদেবও হাসল. থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আমাকে বলল, তুমি তো যাচ্ছই?

মাথা নাড়লাম, যাচ্ছি।

কি ভেবে হেওয়ার্ড হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তোমরা যাবে এখানে কাউকে

বলেছ নাকি ?

—আজই তুই একজনকে বলেছি বোধ হয়, কেন— ?

—ওয়েল, জাস্ট আস্কিং। হেওয়ার্ড কথা বাড়ালো না আর।—ঠিক আছে, ইউ বুক ইওর সীটস্।

আর একবার তাকে ধন্যবাদ দিয়ে মহাদেব আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তুমি খেলবে না আসবে ?

আমার হয়ে হেওয়ার্ড জবাব দিল, উই হ্যাভ নট ইয়েট ফিনিশ্‌ড দিস রাউণ্ড স্যর, কাম অন্!

—খেলো গে তাহলে। মহাদেব পা বাড়িয়েও থামল, হ্যাঁ ভালো কথা, থ-মিন কাল সকালে জলে নামছে, তোমার বরাতে যদি ওঠে দুই একটা শেল্—বাড়ি থেকো, আমি তোমাকে ডেকে নেব।

বাংলায় বললেও থ-মিন আর শেল শুনে হেওয়ার্ড বুঝে নিল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, থ-মিন ডাইভ করবে কাল ? এত ঢেউয়ে কি পাবে কিছু ? বাট্ থ-মিন ইজ অ্যান্ এক্সপার্ট, পেতেও পারে। আমাকে বলল, তোমাব ভালো লাগবে, ইটস্ থ্রিলিং—আমিও যেতে চেষ্টা করব।

খেলা বসল আবার। কিন্তু ঠিক জমল না। ক্লাব-ঘর সুদ্ধ্ মেয়ে পুরুষের উৎসুক গাম্ভীর্য। খেলতে খেলতে হেওয়ার্ডও যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। টমাসের মুখ দেখা গেল না, তিনি খেলায় মন দিয়েছেন আবার। হেওয়ার্ডকে নিরীক্ষণ করেও কিছু না বুঝতে পেরে ডোরা মার্থা ঘন ঘন আমার দিকেই তাকাচ্ছে। ব্রীজ খেলতে বসে হেওয়ার্ডকে কোনো দিন বিমনা হতে দেখিনি।

পরদিন।

কিছু না বলে মা-শাইনের দোকানের সামনে জিপটা থামালো মহাদেব। এখানে আসবে একবারও বলেনি। আগের আপ্যায়নের কথা ভেবে জিপে বসে থাকাটা অশোভন হতে পারে মনে করে তাকে অনুসরণ করলাম। একলা বসে মা-শাইন বুনছে কি! মহাদেব জিজ্ঞাসা করল, থ-মিন কোথায় ?

—বোসো। বোনা না থামিযে মা-শাইন মুখ তুলে আমাকেও দেখল, তারপর ইঙ্গিতে আর একটা কুশন দেখিয়ে দিল!

এটুকু থেকেই কেন জানি মনে হল, আজ ভিতরে না ঢুকলেই ভালো করতাম। মহাদেব ব্যস্তভাবেই বলল, বসবার সময় নেই, থ-মিনের আজ—

—বোসো। ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে মুখ তুলে তাকালো একবার! মহাদেব বসে পড়ল। আমি তার আগেই বসেছি। মা-শাইনের হাতের বোনা থামেনি।

—বন্ধুকে চা দেব একটু ?

সচকিত হয়ে জবাব দিলাম, অনেক ধন্যবাদ, এইমাত্র আমরা চা খেয়ে আসছি।

স্বল্প নীরবতা। বোনা থেকে মুখ তুলে মা-শাইন বলল, থ-মিন যেখানে যাবার চলে গেছে, তোমরা গেলেই তাকে পাবে।

—···ও। মহাদেব ওঠার জন্য ব্যস্ত হল আবার। মা-শাইন এক পলক চেয়ে রইল তার দিকে। পরে বোনার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিরুত্তাপ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কলকাতায় যাচ্ছ শুনলাম ?

মহাদেব জবাব দিল, কলকাতা হয়ে দিল্লী।

—কবে যাচ্ছ ?

—সেটা হেওয়ার্ড বলতে পারে—তার হাওয়াই জাহাজের ওপর নির্ভর করছে।

—ক'দিন থাকবে ?

—ঠিক নেই, কাজ হলেই ফিরে আসব। আচ্ছা আজ উঠি, তাড়া আছে।

মা-শাইন আর বাধা দিল না। তবে তার হাতের বোনা থামল এবার। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুপচাপ চেয়ে রইল।

জিপে উঠে মহাদেব একটিও কথা বলল না। কিছু বোধ হয় ভাবছে। আমার মনে মহাদেবের সেই মাকড়শার ভালবাসার উপমাটা ঘোরাফেরা করতে লাগল।

ইন্দুমতী বোটে অপেক্ষা করছিল।

সমুদ্রের ধারে জিপ থামিয়ে কাছে আসতে বলল, অনেক লেট, সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছি—কি কচ্ছিলেন এতক্ষণ, ঘুমুচ্ছিলেন নাকি ?

যে কারণেই হোক, মনে হল এই ঈষদুষ্ণ বক্রোক্তির লক্ষ্য আমি নই। বোটে উঠে জবাব দিলাম, ঘুমুব কেন, এই তো গিয়ে ডাকল আমাকে, তাছাড়া থ-মিনের খোঁজে মা-শাইনের দোকান হয়ে আসতে হল—

বোটে সারেঙ নেই, মহাদেব নিজেই চালকের জায়গায় গিয়ে বসেছে। ইন্দুমতী সেদিকে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, থ-মিন আধ-ঘণ্টা আগেই নৌকোয় এগিয়ে গেছে। দোকানে মা-শাইন ছিল ?

ঘাড় নাড়লাম, ছিল।

—তাকেও ধরে নিয়ে এলেন না কেন—

ইচ্ছে করলেই মা-শাইনকে ধরে আনা যায় কিনা সেটা আমার থেকেও ইন্দুমতী অনেক ভালো জানে। কিন্তু এরও হাবভাব আজ সুবিধের ঠেকছে না। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কে ধরে আনবে, আমি ?

কাজ হল না। অন্য সময়ে হলে ইন্দুমতী হাসত। হাসির বদলে গলা একটু

চড়িয়ে জবাব দিল, আপনি কেন, যে পারে সে-ই আনতে পারত!

মহাদেবের কানে কিছু গেল কিনা বোঝা গেল না। মোটরবোট চলতে শুরু করেছে। চুপচাপ সমুদ্রের শোভা দেখাই সমীচীন মনে হল আমার।

মিনিট দশেক লাগল গন্তব্যস্থলে যেতে। দূর থেকে দেখা গেল একটা ক্ষুদে নৌকোয় শুধু হাত-কাটা থ-মিন নয়, হেওয়ার্ডও আছে। তার পরনে সুইমিং কস্টিউম। সর্বাঙ্গ ভেজা। সম্ভব হলে হেওয়ার্ড আসবে কালই বলেছিল। থ-মিনের মুখেও শুনেছিলাম, সে জলে নামছে খবর পেলেই ক্যাপ্টেন দেখতে আসবে। কিন্তু বোটে ইন্দুমতীকে দেখে তার কথা মনে ছিল না। এখন তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুমতীর এতক্ষণের উষ্মার হেতু আঁচ করা গেল। আধঘণ্টা আগে শুধু থ-মিনকেই নৌকায় এগোতে দেখেনি ইন্দুমতী—হেওয়ার্ডকেও দেখেছে নিশ্চয়। হয়ত ভেবেছে, ওকে বিব্রত করার জন্য মহাদেবই হেওয়ার্ডকে আপ্যায়ন করেছে। সেই রাগেই খুব সম্ভব মা-শাইনকে আনার অথবা না আনার ঠেস দিতে ছাড়েনি।

বোট পাশে এসে থামতে হেওয়ার্ড ঈষৎ হেসে মাথা নোয়ালো শুধু, তারপর খুশিভরা চোখে ইন্দুমতীর দিকে তাকালো। ইন্দুমতী অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে আছে।

আমরা কিছু বলার আগেই দু'জনেই ওরা জলে ঝাঁপ দিল আবার। হেওয়ার্ড আর থ-মিন। আড় চোখে চেয়ে দেখি, ইন্দুমতী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে। তার মুখে ভয়ের ছায়া। পর মুহূর্তে সে ধমকে উঠল মহাদেবকে, ও নেমেছে কেন, হাঙরের পেটে যাবার ইচ্ছে? ওকে উঠে আসতে বলো!

হেওয়ার্ড নেমেছে বলে মহাদেবকেও যেন চিন্তিত দেখালো একটু। কিন্তু চট করে তাকে ডাকার সুযোগ পেয়ে উঠল না। খানিকটা দূরে গিয়ে ভেসে উঠল হেওয়ার্ড। মহাদেবের ডাক কানে গেল না, দু'চারটে বড় বড় দম নিয়ে আবার ডুব দিল সে। এদের ভয় দেখে আমিও শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। থ-মিনের দিকে কারোই চোখ নেই।

হেওয়ার্ড আবার ভেসে উঠতেই মহাদেব হাঁক দিল। এবারে কানে গেল। সাঁতরে বোটের কাছে এলো। মহাদেব হাত বাড়িয়ে দিল। হাত না ধরে হেওয়ার্ড বলল, আমি মাটিই ছুঁতে পারিনি, আর একবার দেখি—রিয়েলি থ্রিলিং!

যথার্থ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠল ইন্দুমতী।—হাঙরে ধরে টানলেই সব থ্রিল বেরিয়ে যাবে, ওঠো বলছি।

এই ব্যাকুল অনুশাসন যে নারীর, সে একজনকে ভালবেসেছে কি দশজনকে —সে-প্রশ্ন মনে এলো না। শুধু মনে হল, এই মুহূর্তে ঠিক এইটুকুই দরকার ছিল। মহাদেবের হাত ধরে হেওয়ার্ড বোটে উঠে এলো। মুখে সেই লাজুক হাসি। তার হাত-পাগুলো ঠিক আছে কি না ইন্দুমতী নিরীক্ষণ করে দেখে নিল একবার। তারপর রাগ করে অন্যদিকে মুখ ফেরালো। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম একটা।

এতক্ষণে হুঁশ হল, থ-মিন কোথায় ?

দেখি একখানি হাত কোমরে তুলে বোটে দাঁড়িয়ে নিষ্প্রাণ চোখে আমাদেরই দেখছে। খালি গা, লম্বা ফর্সা চেহারা, পরনে জাঙ্গিয়ার মত, তাতে ছোট্ট ছোরা গোঁজা একটা। আর কোন সরঞ্জামই নেই। আমার ধারণা ছিল, ডুবুরী মানেই অনেক কিছু সরঞ্জাম দেখব।

মহাদেবের প্রশ্নের জবাবে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থ-মিন বলল, ঢেউ খুব, আর এখানটায় জলও অনেক, দেখছি চেষ্টা করে।

আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। জলে আলোড়ন তুলে গলা দিয়ে বিকট শব্দ বার করল একটা বু বু বু বু করে। শব্দ শুনলে নাকি শার্ক ভয় পায়। তারপর ডুব দিল। সশঙ্কে প্রতীক্ষা করছি। লোকটা যেন উঠবেই না আর। ওই লোকটারই একটা হাত হাঙরে শেষ করেছে। কিন্তু তার জন্যে চিন্তিত নয় কেউ।

উঠল। উঠেই তেমনি বু-বু করে হাঁক ছাড়ল একবার। এমনি চলল প্রায় ঘণ্টা খানেক।

এক রকম নয়, তিন চার রকম শেল তুলল থ-মিন। মহাদেব জহুরীর চোখে যাচাই করতে লাগল সেগুলো। শেলের ভিতরের জীবগুলোকে নড়াচড়া করতে দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল প্রায়। থ-মিনের ভিজে পিঠ চাপড়ে দিল মহাদেব।—সাবাস। আমায় বলল, তোমার বরাত ভালো, যা উঠেছে সব তোমার।

এর পর হেওয়ার্ড গেস্ট হাউসে আপ্যায়ন জানালো সকলকে। ফকিরুদ্দিন নাকি চায়ের ব্যবস্থা রেডি করে রেখেছে ! থ-মিনও বাদ না। অনুরোধ সরাসরি শুধু ইন্দুমতীকেই করল না বা করতে পারল না সে ! কিন্তু তার বিশেষ আগ্রহটুকু না বোঝার কথা নয় কারো।

মেরিনে পা দিয়েই ইন্দুমতী অকরুণের মত বলে বসল, ক্লান্ত লাগছে, সে বাড়ি যাবে এখন।

কাউকে লক্ষ্য করে বলেনি, বলেছে শুধু। আর বলেছে বাংলায়। কিন্তু

বিব্রত মুখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি ঠিক জায়গা মত গিয়ে লেগেছে সেটুকু। হেওয়ার্ডের হাসিমাখা মুখে কুণ্ঠার ছাপ পড়েছে। প্রিয়জনের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আর্জি না মঞ্জুর হলে যেমন দেখায়।

কলকাতায় এক বন্ধুপত্নীর চায়ের নেমন্তন্ন মনে পড়ে। তখনো পত্নী হননি। পূর্বরাগের পালা চলছিল। কোনো উপলক্ষ ধরে স-বন্ধু আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন মহিলা। মনের আনন্দে গৌরবে বহুবচন হয়ে যথাসময়ে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম। আসেননি শুধু একজন। যার গরবে গরবী আমরা—সেই একজন। (না এসে নিজের দর এবং কদর বাড়াবার চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন করেছিলেন বলেই বিশ্বাস।) আমাদের প্রতি মহিলার আপ্যায়নে ত্রুটি ছিল না। বরং জোরজোর করে আরো বেশি হেসেছিলেন, তাগিদ দিয়ে কেক বিস্কুট রসগোল্লা খাইয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলো গলা দিয়ে নামাতে কষ্ট হচ্ছিল আমাদের। আর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মনে হচ্ছিল কুইনিন-গোলা জল খাচ্ছি।

হেওয়ার্ডের অভ্যর্থনায় ইন্দুমতীর না আসাটাও প্রায় সেই রকমই হয়ে দাঁড়াবার ভয় আমার। চেয়ে দেখি, এই অকোমল প্রত্যাখ্যান মহাদেবও অনুমোদন করতে পারেনি। রুষ্ট গাম্ভীর্যেই চেয়ে আছে তার দিকে।

জিপ দেখিয়ে বলল, ওঠো—

—তোমরা যাও, আমি এখান থেকে একটা—

—কথা না বলে ওঠো না! চাপা বিরক্তিতে প্রায় ধমকে উঠল মহাদেব।

নিরুপায় মুখে ইন্দুমতী জিপে উঠে বসল। ইঙ্গিতে হেওয়ার্ডকে নিয়ে আমায় উঠতে বলে গ-মিনকে ডেকে নিয়ে মহাদেব সামনে বসল। হেওয়ার্ডকে আগে ঠেলে দিয়ে জিপে উঠতে না উঠতে প্রায় এক টানেই যেরিন ছাড়িয়ে জিপ হ্যাডোর পথে।

কোণ ঘেঁষে বসে আছে ইন্দুমতী। হেওয়ার্ডের মুখে এখনো বিব্রত-ভাব একটু। আড়ে আড়ে লক্ষ্য করছি ওদের। না করে পারছি না। এখানে আসার পর এই দু'জনকে একসঙ্গে দেখার সুযোগ হবে ভাবিনি। আজ পর্যন্ত বাঙালী ছেলের বাহুলগ্ন শ্বেতাঙ্গিনীও অনেক দেখেছি। শ্বেতাঙ্গ প্রেমিক পুরুষের পার্শ্বলগ্ন বাঙালী মেয়ে দেখা এই প্রথম। হেওয়ার্ডের শাদাটে চাঁপা রঙের পাশে প্রায় কালোই দেখাচ্ছে ইন্দুমতীকে।

ফকিরুদ্দিন রেডি-ই ছিল। ধপধপে চাদরপাতা ডাইনিং টেবিলে ঝকঝকে পেয়ালাগুলো উল্টে রেখেছে ডিসের ওপর। বড় বড় প্লেটে মাখন রুটি ডিমসেদ্ধ

আর ফল। হেওয়ার্ডের নির্দেশ শোনার আগেই সেলাম ঠুকে চা আনতে ছুটল ফকিরুদ্দিন। ডাইনিং টেবিলের চার দিকে গোল হয়ে বসলাম আমরা। শেল প্রসঙ্গে কথা চলল। থ-মিনের অনেক কৃতিত্বের গল্প শোনালো মহাদেব। কিন্তু থ-মিন কিছু শুনছে কিনা সন্দেহ। বাইরের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে আছে সে।

হেওয়ার্ড জল থেকে উঠে আসার পরে এই থ-মিনের জন্যেই কেন জানি ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্যে মন ছেয়ে ছিল সারাক্ষণ। হেওয়ার্ড জলে নামার দরুন যে-ভাবে আমাদের উতলা ভাবটুকু লক্ষ্য করছিল ও, মনে আছে। তার সেই চাউনিতে বিস্ময়ও ছিল না, কৌতুকও ছিল না। শুধু অবজ্ঞা ছিল। তারপর মহাদেবের ইঙ্গিতে সে জলে নেমেছে। তার ডুবের তারিফ করেছে মহাদেব, কোন্ বার কি তুলল সাগ্রহে যাচাই করে দেখেছে তারা। হতে পারে এটাই পেশা থ-মিনের। তবু বুকের ভিতরটা দুরদুর করছিল আমার। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, কোনো অঘটন যেন না ঘটে। এত প্রশংসার মধ্যেও নিস্পৃহ মুখে তাকে ডিম রুটি চিবুতে দেখে এখন আবার সকলের প্রতি ওর সেই অবজ্ঞার আভাসটুকুই আরো যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

চায়ের পর থ-মিনের দিকে একটা দামী চুরুট বাড়িয়ে দিল হেওয়ার্ড, বলল, ইউ ডিজার্ভ দিস্—।

সবিনয়ে চুরুট নিয়ে সমনোযোগে সেটা ধরাতে লাগল থ-মিন।

ওধারে ইন্দুমতীর দিক থেকেও সাড়া-শব্দ নেই। এ দলটিকে সে ভালো করে চেনে বলেও মনে হচ্ছে না। থ-মিনের প্রশস্তি থামতে এক ফাঁকে নিচু-গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, এমন চুপচাপ যে?

মুখ তুলে চেয়ে রইল খানিক। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল, কি করলে ভালো লাগবে বলুন···? শেলের কদর তো বুঝিনে, গান গাইব?

তার সাড়া পেয়ে সাগ্রহে তাকালো হেওয়ার্ড। মহাদেবও তাকালো।

মনে মনে অপ্রস্তুত হলেও হাসিমুখে জুতসই একটা জবাব খুঁজছিলাম। কিন্তু তার দরকার হল না। ছোট্ট ঘটনাচক্রে টেবিলের হাওয়া বদলাল।

হঠাৎ সত্রাসে উঠে দাঁড়াল ইন্দুমতী। চেয়ার-সুদ্ধ পড়তে পড়তে বাঁচল প্রায়। হাতের ধাক্কায় টেবিলের পেয়ালা ওল্টালো। অস্ফুট ঝঙ্কারে বলে উঠল, ও মা গো, এটা কি।

ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের নিচে দৃষ্টি চালালাম আমরা।

শেল-সমেত ঝাড়নটা টেবিলের নিচে রেখেছিলাম। প্রায় আধসের ওজনের একটা টারবো বেরিয়ে পড়েছে। শেলসুদ্ধ ভিতরের নরম সজীব বস্তুটি যদি গুটি

দশেক হাত-পা বার করে কারো পায়ে আশ্রয় খোঁজে, তাহলে সেই পিচ্ছিল স্পর্শে ইন্দুমতী কেন, যে কেউ আঁতকে উঠবে।

হাসির রোল উঠল একটা। থ-মিন উঠে টেবিলের নীচে থেকে শেলটা তুলে নিয়ে যথাস্থানে পুরল! ইন্দুমতী দূরে সরে দাঁড়িয়ে আছে তখনো। অপ্রস্তুতের একশেষ। টিপ্পনি কাটার লোভ ছাড়া গেল না। বললাম, শেলের কদর এবারে বুঝলে একটু আধটু—না গান গাইবে?

রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল ইন্দুমতী।—যান, ভালো লাগে না, উঠবেন তো উঠুন এখন!

বিকেল না হতে মহাদেব এসে হাজির হবে আশা করিনি। তার হাতে অনেক কাজ শুনেছিলাম। বলল, তুমি আর কি পরিশ্রমটা করলে এমন যে শুয়ে আছো? উঠে পড়ো—

—কোথায়? মনে মনে ধারণা ইন্দুমতীর ওখানে।

বলল, চলো স্কুটারে খানিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি তোমাকে, ক'দিন বাদে তো চলেই যাবে, আর হয়ত আসবেই না কখনো।

ঘোরাতে নিয়ে বেরিয়েও মহাদেব কথা বলল না বিশেষ। ভাবলাম, ওদের রাগের জেরটাই চলেছে বোধ হয় এখনো। সকালে হেওয়ার্ড জলে নামার জন্য একবার ধমকে ওঠা ছাড়া সারাক্ষণের মধ্যে ইন্দুমতীকে যেচে একটি কথাও বলতে শুনিনি ওর সঙ্গে।

খানিক বাদে আবার মনে হল, তা নয়, কলোনীর ভাবনা নিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে আছে সে। কারণ, কথাবার্তা সেই প্রসঙ্গেই চলতে লাগল। দিল্লীতে গিয়ে কি কি করবে, দেখা করবে কার কার সঙ্গে, এখানকার উদ্বাস্তু বসতির যথাযথ বিবরণ খবরের কাগজে লিখতে পারি কি না, ইত্যাদি।

শুনছি। জবাবও দিচ্ছি। কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে কোথায় চলেছি ওর হুঁশ আছে কিনা সংশয় জাগছে। পাহাড়ের চারদিকে কুণ্ডলী পাকানো রাস্তা। এক একটা মাথা সমুদ্রের ধারে এসে থেমেছে। আমরাও থামছি একটু। সমুদ্র দেখছি। আবার অন্য রাস্তা ধরছি। পাকা রাস্তা ছেড়ে একটা অসমতল মেঠো পথের মধ্য দিয়ে স্কুটার চালিয়ে দিল মহাদেব। ঝাঁকুনির চোটে প্রাণান্ত অবস্থা। তার থেকেও বেশী ভাবনা, পড়ে না যাই। জায়গাটা ছাড়া-গ্রামের মত। দু'দিকে সারি সারি আটচালা ঘর কতগুলো। ভাঙাচোরা, পরিত্যক্ত। আশপাশে বেত ঝাড়।

স্কুটার থামিয়ে দু'দিকের মাটিতে দু'পা আটকে মহাদেব জিজ্ঞাসা করল, জায়গাটা চেনো ?

চেনার মত কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না। কিন্তু মহাদেবের মুখখানা যেন আরো গম্ভীর দেখাচ্ছে, গলার আওয়াজটাও ভারী লাগছে।

বলল, সাদিপুর—নাম শুনেছ ?

ঘাড় নাড়লাম, শুনেছি!

মহাদেব হাসল একটু। হাসি ঠিক নয়, একটুখানি অসহিষ্ণু অভিব্যক্তির মত। তারপর স্কুটারে স্টার্ট দিল আবার।

এবারে ভালো করে দু'দিক দেখে নিলাম। দেখার মত কিছু নেই। শুধু কুঁড়ে ঘর গোটাকতক। এগুলোর সঙ্গে, এই জায়গার সঙ্গে বিগত দিনের এক অবাঞ্ছিত স্মৃতি জড়ানো।

সাদি অর্থাৎ বিয়ে। বিয়ে হত বলে জায়গার নাম সাদিপুর। বিয়ে হত ইংরেজ আমলের স্ত্রী পুরুষ কয়েদীদের। অনেক রকম জনশ্রুতি থেকে সেই বিয়ের বিবরণ যা মেলে সেটা মর্মগ্রাহী নয় খুব।… নির্দিষ্ট কাল দণ্ড ভোগের পর রেকর্ড ভালো থাকলে স্ত্রী-পুরুষ কয়েদীদের বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হত। দেশে হয়ত কারো স্বামী আছে, কারো স্ত্রী আছে। কিন্তু থাকলেও এখানে বিয়ে করতে বাধা নেই কিছু। কারণ শাস্তির মেয়াদ শেষ করে দেশে আর ফিরছে ক'জন ? দু'পাঁচ বছরের জন্যে তো কেউ আর কালাপানি পেরিয়ে আসে না। …তাছাড়া বিয়ে যখন তারা করতে চায়, শাস্তির জাঁতাকলে সমস্ত অনুভূতি আর সত্তাবোধ তর্তদনে নিঃশেষ। তা না হলে কর্তা-ব্যক্তিদের বিচারে রেকর্ড তাদের ভালো হবেই বা কি করে ?

শুনেছি, বাংলা দেশ থেকে কোন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী আন্দামান চালান হলে জাহাজ থেকে মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেলুলার জেলের কোনো এক ইংরেজ জেল-সুপারিনটেনডেন্ট নাকি তাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, এসো, এই দেখছ সেলুলার জেল ? উই টেম লায়নস দেয়ার!

এদের নিপীড়নের যন্ত্রটি এত বড় গর্বের বস্তুই ছিল সে-দিন। অবশ্য বিপ্লবী সিংহদের সঙ্গে এখানেও শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে পারেননি তাঁরা, এখানকার নথি-পত্রে সেই নজির আছে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। তাছাড়া মোট সংখ্যার তুলনায় রাজনৈতিক বিপ্লবী আর ক'জন ?

যাই হোক সমস্ত মনুষ্যত্ব নিঙড়ে নেওয়ার পর বিয়ে করে এখানে ঘর-সংসার পাতার অনুমতি দেওয়া হত যাদের, তাদের নিয়ে আসা হত এখানে। এই

সাদিপুরে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই। দুই দলকে লাইন বেঁধে মুখোমুখি দাঁড় করানো হত। কয়েদীদের স্ত্রীর বাছাই অথবা স্বামী বাছাইয়ের মহড়া চলত তারপর। পরস্পরের অনুমোদন থাকলে ওখানেই বিয়ে শেষ। না থাকলে গোলযোগ। যে-ক্ষেত্রে ইচ্ছে করলে দিন-কতক পরস্পরকে যাচাই করে নেবার সুযোগও পেত ওই নারী-পুরুষেরা। বনিবনা হয় কি না বুঝে পাওয়ার জন্য কিছুদিন এই সব ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করত তারা! বনিবনা হলে বিয়ে পাকা হত, না হলে লাইনে দাঁড়িয়ে আবার যে যার অন্য সঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছত।

লোকাল-বর্ন সৃষ্টির উৎস এই সাদিপুর। সেই নর-নারীদের বংশধরেরা লোকাল-বর্ন।

এর কতটা গল্প আর কতটা সত্যি তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনো। শোনার ভাগ শুনেছি।...আজ মনে হল, জায়গাটা যেন মহাদেবের বুকের একটা ক্ষত-চিহ্ন।

প্রায় ঘণ্টা দুই ঘোরাঘুরির পর ফেরার রাস্তা ধরেছে কি না ঠিক ঠাওর পেলাম না। একটা বাঁক ঘুরে মহাদেব বলল, ওই সামনেই রঙ-চাঙ বীচ, দেখোনি তো? চমৎকার জায়গা—

উৎসুক নেত্রে এদিক-ওদিক তাকালাম। ঔৎসুক্য দেখার আগ্রহ যত না, তার থেকে বেশি ওর মুখের সহজ দুটো কথা শোনা গেল বলে। অনেকক্ষণ ধরেই মানুষটার মনের হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না—স্কুটারের পিছনে গা-ঘেঁষে বসে থাকা সত্ত্বেও অনেকটাই দূরে সরে ছিলাম যেন। পাহাড় ঘেরা আঁকাবাঁকা পথের শেষ মাথায় দেখা গেল একটা মোটর দাঁড়িয়ে। কেউ বেড়াতে এসেছে বোধ হয়। মোটরের পাশ কাটিয়ে ঢালু পথ ধরে সটান বাচের কাছে এনে নামালো মহাদেব! বড় বড় পাথর-ছাওয়া সমুদ্রের এই রুক্ষরূপ করবাইনস কোভ থেকেও অনেক সুন্দর।

কিন্তু দু'চার মুহূর্তও বোধ হয় দেখা হল না, মহাদেবের চোখ অনুসরণ করে দূরে একটা পাথরের উপর চোখ পড়তেই বিষম থতমত খেয়ে গেলাম।

প্রায় জলের ওপর মস্ত একটা পাথরে পাশাপাশি বসে আছে হেওয়ার্ড আর ইন্দুমতী। ইন্দুমতীর একটা হাত হেওয়ার্ডের হাতে। স্কুটারের শব্দে ফিরে তাকিয়েছে তারা; ইন্দুমতী বাঁ হাত তুলে এবং হেওয়ার্ড ডান হাত তুলে হাসি মুখেই ডাকছে আমাদের।

আমি চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে।

মহাদেব নামেইনি স্কুটার থেকে। মুখে বিচিত্র হাসির ঝলক। আমাকে

বলল, উঠে পড়ো!

পকেট থেকে রুমাল বার করে দিব্বি হাসি মুখেই নেড়ে দিল বার কতক। তারপর শাঁ করে ঘুরিয়ে দিল স্কুটারের মুখ।

ঝড়ের বেগে চালিয়ে থামল এসে একেবারে করবাইনস্ কোভের ধারে। স্কুটার থেকে নেমে বসে পড়ল হাত পা ছড়িয়ে।

হাসছে তখনো। প্রসন্ন হাসি।

আজকের সমস্ত দিনের মধ্যে এই হাসি এই প্রথম দেখলাম ওর মুখে। আজ কেন অনেক দিনের মধ্যেই বোধ হয়। সামান্য বাগান করা আর ঘর রঙ করা নিয়ে যার অমন রাগ, এই দৃশ্য দেখার পর তাকে এভাবে হাসতে দেখে আমি ঘাবড়েই গেলাম।

—কি দেখছ, বোসো—?

বসলাম। কি দেখছি বলা গেল না। বিস্ময়টুকু আঁচ করে খুশি মুখে মহাদেব জানালো, রাগের মাথায় ওকে বলে এসেছিলাম আজ আর দেখা হবে না, তোমাকে নিয়ে ঘুরতে বেরুবো। ঘুরতে বেরুলে রঙ চাঙে যে আসব ও ঠিক ধরে নিয়েছিল। মহাদেব হাসতে লাগল।

কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। মহাদেব উৎফুল্ল মুখে বলে গেল, অনেক ভুগেছে হে···তাই পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারে না—এটা এক ধরনের নিরাপদ ছলনা, বুঝলে? ··ফাঁক পেলেই চোখে আঙুল দিয়ে নিজের কদরটা দেখিয়ে রাখে।

এক মুহূর্তে হ্যাভলকের সেই দুর্বোধ্য রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেল। মাস্টার বলেছিল, দিদি যদি আর একটু কেয়ার করত···। মহাদেব খুশি, কারণ এ ছলনায় ইন্দুমতীর দুর্বলতাটুকুই বড় হয়ে ওঠে—সেই কেয়ার করাটাই বড় হয়ে ওঠে। ভয় ইন্দুমতীর, কিন্তু ভয় মহাদেবেরও কম নয়। তার অমতে ইন্দুমতীর বাগান করা, ঘর রঙ করার স্বকীয়তায় কেয়ার না করার আঁচ লাগে বলেই মহাদেব অমন ক্ষেপে ওঠে পাগলের মত।

··পরস্পরের পরস্পরকে হারানোর ভয় ওদের।

কিন্তু তবু ভালো লাগছিল না। আমার সংশয় পুরোপুরি যায়নি বলেই। অনেকবার যে সন্দেহ মনে জেগেছে, এই মুহূর্তে সেটাই আবার বড় হয়ে উঠল কেন, জানি না। খানিক চুপ করে থেকেও জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা তোমার এই সব কলোনী-টলোনীর ব্যাপারে সত্যিই ইন্দুমতীর আগ্রহ কতটুকু?

এ-সময় এই প্রশ্ন আশা করেনি মহাদেব! বিস্মিত নেত্রে তাকালো সে।

তারপর হৃষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল, আগ্রহ তারই সবটুকু, বরং আমারই কোনো আগ্রহ ছিল না আগে···। তোমাকে তো বলেছি, সে-ই আমাকে এ-কাজে টেনেছে।

হ্যাভলকে যাবার পথে বলেছিল মনে আছে। কিন্তু সেদিন যেমন বিশ্বাস করতে পারিনি, আজও প্রায় তেমনি।

সেটুকু অনুমান করেই মহাদেব তারপর বলেছিল কিছু···।

ওর সেই বলাটা কোনোদিন ভুলব না বোধ হয়।

জাহাজ এসেছিল কলকাতা থেকে। জাহাজ এলে সবাই দেখতে ছোটে এখানে। সেদিনের বেড়ানোটা জাহাজেই সারে। মহাদেবও গিয়েছিল। ডেকের এক কোণে মস্ত রিফিউজির দল এসেছিল একটা। বুড়ো কচি-কাচা অনেক। সেদিকে নজর ছিল না কারো। একধারে দাঁড়িয়ে ইন্দুমতী চুপচাপ দেখছিল তাদেরই।

ওর সেই দেখাটা বুকে খোদাই হয়ে আছে মহাদেবের।

শুধু তাই নয়। ইন্দুমতীর চোখে জল দেখেছিল মহাদেব।

পরোক্ষে অনেকবার অনেক আঘাত করেছে সে ইন্দুমতীকে, কিন্তু চোখে জল দেখা দূরে থাক, সে আঘাত যেন ওর স্বার্থোদ্ধারই করেছে। এই রিফিউজিদের জন্য এতটুকু দরদ ছিল না মহাদেবের। দরদ কারো জন্যেই ছিল না। বরং সবার প্রতি, সব কিছুর প্রতি বিদ্বেষই বড় হয়ে উঠেছিল। তবু ইন্দুমতীর ওই দেখা আর তার চোখের জল তাকে অবাক করেছিল।

এর পর ইন্দুমতীর সঙ্গে তার যোগাযোগ মা-শাইনের দোকানে। চোখের জল নিয়ে মহাদেব টিপ্পনী কাটতে ছাড়েনি।

শুনে হঠাৎ যেন ঝলসে উঠেছিল ইন্দুমতী! বলেছে, আজীবন শুধু একটা ঘৃণার বোঝাই বয়ে বেড়াবে তুমি, তোমার আর আছে কী?

মহাদেব জবাব দিয়েছে, যাদের জন্য ইন্দুমতীর চোখে জল, দশ বছর বাদে তারা যা হবে সেটা মনে হলে বয়ে বেড়াবার মত আর কি সম্পদ আছে, তার জানা নেই বটে।

শুনে আবারও যেন জ্বলে উঠেছিল ইন্দুমতী। বলেছে, দশ বছর বাদে তারা যা হবে সত্যি সত্যি ভাবলে তুমি কাঁদতে বসতে। এতকাল এখানে পাপ ছিল না, পাপ আসত বাইরে থেকে। এখন বাইরে থেকে আসছে তারা যারা কোনদিন পাপ জানে না, তাদের বাঁচার তাড়ায় এখানে পাপ গজাবে এখন—দশ বছর বাদে কি তারা হবে আমাকে দেখে টের পাও না?

মহাদেব ভুলতে পারেনি। মহাদেব ভুলতে পারবেও না কোনদিন।

কোনদিন ভাবেওনি মহাদেব…।

অষ্টপ্রহর একটা তীক্ষ্ণ স্বর যেন কানে বাজতে থাকল তার, দশ বছর বাদে কি তারা হবে আমাকে দেখে টের পাও না ?

ইন্দুমতীর সঙ্গে আবার দেখা না করে পারেনি মহাদেব। বলেছে, কথাটা কখনো ভেবে দেখিনি আমি…এখন ভাবতে রাজী আছি। আমি চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু কি করে করতে হবে সেটা, আমার জানা নেই।

ইন্দুমতী জবাব দিয়েছে, কি করে চেষ্টা করতে হবে আমারও জানা নেই, কিন্তু জানা কঠিন নয় বোধ হয়।

—চেষ্টা যদি করি তুমি থাকবে সঙ্গে ?

জবাবে ইন্দুমতী চেয়ে চেয়ে দেখছে ওকে ! অনেকক্ষণ যাচাই করে দেখেছে। তারপর বলেছে, আঁকড়ে ধরে থাকি এমন লোভনীয় কিছু নেই এখানে, চেষ্টা যদি করো, বাকী জীবন তোমাকেই আঁকড়ে ধরে থাকব—

*

* *

প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল ইন্দুমতীকে সবাই যেমন দেখে আর যেমন ভাবে, সেইটুকু সব নয়। কিন্তু সে-যে এমন সত্যি, ভাবিনি। তবু মনটা কিছুতেই যেন ভরে উঠছিল না। করবাইনস্ কোভে বসে মহাদেবের সঙ্গে আরো কিছু কথা হয়েছিল। কথা হয়েছিল হেওয়ার্ডকে নিয়েই। মহাদেব জানিয়েছে, হেওয়ার্ডের সঙ্গে অনেক দিন আগেই মুখোমুখি বসে ফয়সালা করে নিয়েছে সে। হেওয়ার্ড খুশি হয়েছিল নাকি। ওদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। হ্যাভলকে জনপদ প্রতিষ্ঠার শুভ কামনা করেছিল।

শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম কি না বলতে পারব না ! কিন্তু পরে ভেবেছি, তাই তো করবে হেওয়ার্ড, তাই তো বলবে। ও ছাড়া আর করার আছে কি, বলার আছে কি !…মহাদেব বলে, হেওয়ার্ডের সঙ্গে ইন্দুমতীর ইদানীং কালের এই প্রগল্‌ভ মেলামেশাটাও একটা নিরাপদ ছলনা।

…কিন্তু হেওয়ার্ড তো কোন ছলনার দোসর নয়।

দিনের শেষে ঘরের আলো কমে আসছে। মেরিনের দিকটা আবছা লাগছে। সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙা ফেনা নীলাভ দেখাচ্ছে। আর একটু বাদে ক্লাবের দিকে বেরিয়ে পড়া ছাড়া আর করার নেই কিছু। আজ আর মহাদেব আসবে মনে হয় না। কাল অনেকটাই হালকা হতে পেরেছিল। সাদিপুরের ছাপ মুছে গিয়েছিল। অনুরাগে ভবপুর দেখাচ্ছিল ওকে।

ভাবাবেগ গেছে বোধ হয়। ইন্দুমতীর প্রবাসে। আজ কেন, হয়ত কালই গেছে। এক একটা বিশেষ মুহূর্তের অপেক্ষা শুধু—মহাদেবের এত মান-অভিমানের আর কোন অর্থ নেই। লোভী-মন একটা চেনা বাড়ির বসার ঘরের দিকে উধাও হতে চাইছে থেকে থেকে। অনেকবার তাকে চোখ রাঙানো হয়ে গেছে।

আজ থাক, কাল দেখা যাবে।

ক্লাবে যাব ভাবছি, কিন্তু আগ্রহ নেই তেমন। গেলে হেওয়ার্ড হয়ত খুশি হয়, আর সত্যিকারের খুশি হয় মার্থা। চুপচাপ বসে সারাক্ষণ একটা আশ্বাসের উষ্ণতা উপভোগ করে যেন মেয়েটা। কিন্তু হাই সোসাইটির আর যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাদের নিস্পৃহতা প্রায় স্পষ্ট। যেচে অন্তরঙ্গতা জ্ঞাপন করতে আসেন না কেউ আর। করসাহেব, দত্তগুপ্ত.বা রে—কেউ না। তাঁদের স্ত্রীরাও না। যেটুকু করেছেন তার জন্যেই অনুতপ্ত সম্ভবত। চায়ের নেমন্তন্নের পরেও মহাদেব অথবা ইন্দুমতীর সংস্রব কাটিয়ে না ওঠাটা বিশ্বাসঘাতকতার তুল্য হয়ে থাকবে।

ওঁদের জন্য চিন্তিত নই, কিন্তু হেওয়ার্ড লোকটা সত্যিই কি ভাবে? ক্লাবে গেলে খুশি হয় খেলাটা ভাল হয় বলে। কিন্তু যে খেলায় সে হেরে বসে আছে, সেখানে আমি যে দর্শক শুধু, সেটা বিশ্বাস করে কি? কথার কথা নয়, কারণ দর্শক হলেও নিরপেক্ষ নই। সে-দিক থেকেও সরাসরি মহাদেবেরই জিত। তবু সুযোগ পেলে হেওয়ার্ডকে বলতাম, হেরে জিতেছ তুমি। থ-মিনের সঙ্গে কানাপানির জলে নেমেছিলে যখন, তখনকার ইন্দুমতীকে তুমি দেখনি, আমি দেখেছি। সেখানে মহাদেব তোমার নাগাল পাবে না কোনদিন। এর থেকে ছোট পাওয়া সৈনিককে মানায় না।

—সাব্—।

ভাবপ্রবণতার মুখে হোঁচট খেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি ফকিরুদ্দিন। সেই খাকী হাফ শার্ট, খাকী হাফ প্যাণ্ট, ব্রাউন ক্যাম্বিসের জুতো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

—ফকির যে, কি খবর?

মুখোমুখি হতে আগে সেলাম করে নিল। তারপর বলল, এদিক দিয়ে ফিরছিলাম···বাবু আউট?

বাবু মানে সান্ট্ বাবু। সর্বদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা সত্ত্বেও ওর চোখে আমি সাব বনেছি।—হ্যাঁ বাবু আউট। দরকার ছিল কিছু?

না জিজ্ঞাসা করাই ভালো ছিল। কারণ ফকিরুদ্দিন ঘরের মধ্যে এসে

দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল লোকটা এই ভর সন্ধ্যাতেই গিলে এসেছে কিছু। নিষ্প্রভ চোখ দুটো ঘোলাটে দেখাচ্ছে! লালচে মুখ। বলল, নো, নো নিড-অর্ডিনারি কামিং—

আপদ বিদেয় না হলে এ অবস্থায় ইংরেজীর খই ফুটবে বুঝতে পারছি। বিদায় দেবার মত কিছু বলার আগেই সুর পালটে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, সাব এখন ঘরে বসে যে? ওয়ান্ট এনিথিং? আই অ্যাম ফ্রী নাও—

দফা সারলে দেখছি। ওর কথার সুযোগ নিয়েই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। —না কিছু দরকার নেই, দেরি হয়ে গেছে, ক্লাবের দিকে যাব। তোমার সাহেব চলে গেছেন?

জবাব না দিয়ে মিটমিট করে তাকাতে লাগল শুধু।

—বেরোননি এখনো?

—বেরিয়েছে। নট টু ক্লাব—মা-শাইনের দোকানে। নো ক্লাব টু-ডে—

তাড়াতাড়ি বললাম, আচ্ছা ফকির তুমি আজ এসো, আমি এক্ষুনি বেরুবো।

বলা মাত্র দরজা পর্যন্ত গেল। তারপর ফিরে দাঁড়াল। ঝোঁকের মাথায় গলা চড়ল একটু।—বাট আই ডোণ্ট লাইক, সি ইজ ডেঞ্জারাস।

আরো কে বলেছিল কথাটা। কে বলেছিল…? মনে পড়েছে। সেদিন মোটরে হেওয়ার্ডের পার্শ্বলগ্ন মা-শাইনকে দেখে টমাস এই মন্তব্য করেছিলেন।

বলা শুরু করার ফলে শেষ না করে থামবে না ফকিরুদ্দিন। এক পা এগিয়ে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল।—আর ওই থ-মিন—মোর ডেঞ্জারাস—রোজ আসে সাহেবের কাছে! আই ডোণ্ট লাইক—আন্দামানের হাওয়া খারাপ এখন—ভেরি অ্যাফ্রেড---আই লাভ ক্যাপ্টেন!

আর একদিনও এই রকমই কি যেন বলছিল ফকিরুদ্দিন, থ-মিন প্রায়ই এসে গুজগুজ করে তার সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু সেদিন প্রকৃতিস্থ ছিল লোকটা। বিলক্ষণ হকচকিয়ে গেলেও ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আলনার থেকে জামা টেনে নিলাম।

কাপড়ের জুতো ঠুকেই সেলাম করল ফকিরুদ্দিন, গুড বাই সাব।

সে নিষ্ক্রান্ত হতে জামাটা আলনায় রেখে দিলাম আবার। কি হবে আর গিয়ে। মাতাল হয়ে ফকিরুদ্দিন যত আবোল-তাবোলই বকুক, তার একটা খবরে বেশ ধাক্কা খেয়েছি। হেওয়ার্ড গেছে মা-শাইনের দোকানে এবং সেখান থেকেও 'নো ক্লাব টু-ডে'। একটু আগে হেওয়ার্ডকে নিয়ে যে ভাবের স্রোতে ভাসছিলাম, মনে পড়তে হাসি পেয়ে গেল। এর থেকে সাণ্টু ঘোষের সকৌতুক

বিশ্লেষণ বরং অনেক স্বচ্ছ। সে বলেছিল, মহাদেব না থাকলে কি হত? হেওয়ার্ড বিয়ে করত ইন্দুমতীকে? স্পোর্ট, নিছক স্পোর্ট—

সৈনিকের ত্যাগের দিকটাই ভাবছিলাম বসে, লুটের দিকটা মনে পড়েনি…।

পরদিন। ইন্দুমতীর বাড়ি যাব বলে একাই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। দ্বিধা গেছে। দু'দিনের জন্যে এসেছি অত চিন্তা ভাবনার দরকার কি আমার। যেখানে ভালো লাগবে যাবো। তাছাড়া গেলবারে ওরা হ্যাভলক থেকে ফেরার পর ইন্দুমতীকে বলেও ছিলাম অন্য একদিন যাব। আজও মহাদেবের দেখা মেলেনি। হয়ত মাথায় আবার নতুন প্ল্যান গজিয়েছে কিছু। তাই নিয়েই মাতামাতি দাপাদাপি করছে। আসন্ন দিল্লী সফরের জন্যও ব্যস্ত থাকা অসম্ভব নয়। আর তো ক'টা দিনের মধ্যেই আমাদের রওনা হবার কথা।

সামনা-সামনি দেখা সান্টু ঘোষের সঙ্গে। অফিস ফেরত আসছে। অল্প অল্প খোঁড়ায় এখনো।

—চললে কোথায়?

ওর মুখ-ভাবটুকু দেখার জন্যেই সত্যি কথা বলার লোভ সামলাতে পারলুম না। শুনে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—তোমারও তো দেখি রকম সকম ভালো বুঝছি না আজকাল। যাও যাও দেরি কোরো না—

জল-ঘেরা এই ছোট্ট দ্বীপে এই বৈচিত্র্যটুকুই এদের আনন্দ। হাসি মুখে পাশ কাটালাম।

সাদর আপ্যায়ন জানালো ইন্দুমতী। চা খাওয়ালো। অনেক কথা বলল আর অনেক হাসল। তারপর বলল, চলুন, আজ আমিই আপনাকে ঘুরিয়ে আনি একটু, আপনার তো আর ভয়ডর নেই—

বাইরে এসেই আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, রঙ্গাঙ থেকে সেদিন অমন করে পালিয়ে গেলেন যে? সইল না বুঝি?

হালকা করেই জবাব দিলাম, আমার রথী পালিয়েছিল, আমি তার শরণাগত তবে আমার চোখ দুটোও ততো অভ্যস্ত নয় সে-কথাও ঠিক।

ইন্দুমতী হাসতে লাগল। বলল, একেবারে নিরামিষ চোখ বুঝি আপনার?

একটা জবাব ঠোটের ডগা থেকেই তল করে দিলাম আবার। নীতির কাড়ন থাক। তার থেকে সান্টু ঘোষের মতাবলম্বন ভালো।…সবই নিছক স্পোর্ট, স্পোর্ট থেকে বাড়তি যেটুকু মেলে। এই হাসি আর পাশাপাশি চলাটুকুও তো বাড়তি লাভ—চণ্ডীপাঠে বসব বলে তো আসিনি। বললাম, সে-রকমই

হয়ে দাঁড়িয়েছে বোধ হয়। মহাদেবের পাত্তা নেই কেন, আবার ঝগড়া করেছে?

—না। ঝগড়া ঝাঁটি শেষ করে আবার ধ্যানে বসেছে।

—নিশ্চিন্ত মনে?

হালকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জবাব দিল, নিশ্চিন্ত মনে। অ্যাবাডিনের পথে মা-শাইনের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।—একবার দেখা করে যাই, আপনার সঙ্গে তো আলাপ আছে, আসুন না—

এটা চাইনি। কিন্তু বাধা দেওয়ার অবকাশ পাওয়া গেল না। ভিতরে না ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়ালাম। ইন্দুমতী সরাসরি তার গলা জড়িয়ে ধরে ঠাস ঠাস করে দুগালে দু'টো চুমু খেয়ে বসল। পরে তার ইজিচেয়ারের গা ঘেঁষে বসে বলে উঠল, খালি দোকান দোকান আর দোকান—

তার দুই কাঁধে দু'হাত রেখে ভাল করে আর একদফা দেখে নিল আগে—তেমন তো সারেনি দেখছি, দিনকতক তোমাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত।

মা-শাইন আমাকে লক্ষ্য করেনি তখনো। ইজিচেয়ারে পিছন ফিরে বসে আছে। ইন্দুমতীকে দেখছে। প্রচ্ছন্ন কৌতুকে জবাব দিল, তোমাকে আরো ভালো দেখাচ্ছে। কে বাঁধলে?

অজ্ঞাত শঙ্কা বোধ করছি কিসের। আমাকে অবাক করে উৎফুল্ল মুখে ইন্দুমতী তার কাঁধে বেশ জোরেই ঝাঁকানি দিল একটা। তারপর বলল, চাকরি বাকরি নেই, বেকার মানুষ—খাচ্ছি-দাচ্ছি ঘুমুচ্ছি, ভালো হবে না?

মা-শাইনের দিকে চেয়ে তার কোনো অসুস্থতা আমার চোখে অন্তত পড়েনি। বরং তার শান্ত গাম্ভীর্যের আড়ালে সেই রূপের তীক্ষ্ণতাটুকুই বরাবরকার মত আগে চোখে পড়ে। দু'চোখ ভরে দেখার মত নয়, ভয়ে ভয়ে দেখার মত।

মা-শাইনের মুখে হাসির আভাস দেখা গেল একটু। মনে হল, ইন্দুমতীর ওই কথা ধরেই আবারও একটা ঘা দেবে। কিন্তু তা না করে ওর মুখের ওপর দু'চোখ আটকে নিয়ে বলল, সেদিন তোমার বাড়ির দিকে গেছলাম, তুমি ছিলে না।

—তাই নাকি। কই কেউ বলেনি তো, কবে গেছলে?

—দিন দুই আগে—যে দিন তোমরা শেল-ফিশিং-এ গেছলে সেদিন বিকেলে। বাড়ি পর্যন্ত যাইনি, পরে দেখলাম ক্যাপ্টেনের গাড়িতে তুমি কোথায় যাচ্ছ।

ক্যাপ্টেনের নাম কানে আসতে ভিতরটা উসখুস করে উঠল। ফকিরুদ্দিনের কথাগুলো মনে পড়ে। মদের ঝোঁকে কি বলেছে না বলেছে কোন অর্থ নেই। তবু...। ঘাড় ফিরিয়ে ইন্দুমতী আমার দিকে তাকালো। ভিতরে ডেকে বসতে বলবে কি বলবে না ভাবল বোধ হয়। কিছুই বলল না। নিজেরই এবার

ওঠার ইচ্ছে হয়ত। মা-শাইনকে বলল, ভুল করে যাও পা বাড়ালে তাও ওই দিনে !·· গেছলে কেন, কোন দরকারে না এমনি ?

—এমনি। কবে রওনা হচ্ছ তোমরা ?

—কাল পরশু তরশু তার পরের দিন। চলি, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। উঠে দাঁড়াল।

মা-শাইন ঘুরে তাকালো আমার দিকে।—বন্ধু সেই থেকে দাঁড়িয়ে ? বসবে না ?

যদিও ভিতরে ঢুকিনি, তবু এতক্ষণ খেয়াল না করাটা খুব স্বাভাবিক নয়। অন্যমনস্কতা ইন্দুমতী আসার দরুনও হতে পারে। বললাম, আজ যাই, যাবার আগে দেখা হবে—।

বাইরে এসেই ইন্দুমতী বড় নিশ্বাস ফেলল একটা। দুরূহ গোছের কিছু কর্তব্য সমাপন করে আসতে পারার মত।—অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম তো ? ভিতরে ঢুকলেন না কেন, আলাপ তো ছিলই ?

একটা পালটা লঘু প্রশ্ন মুখে এসে গেল।—তোমার সুবিধে হ'ত ?

হেসে ফেলে ইন্দুমতী প্রায় স্বীকার করেই নিল, সুবিধে হ'ত।

একটা খোলা মাঠ ছাড়িয়ে সমুদ্রের ধারে পড়লাম আমরা। এদিকটায় আগে আসিনি। কাঠের সিঁড়ি লাগানো উঁচু গোল মত একটা বসার জায়গা। ইন্দুমতী রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসে পড়ল। সামনে শেষ আকাশ-ছোঁয়া কালাপানি। সামুদ্রিক বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ। শব্দটা এই নির্জনতার একটা অদ্ভুত প্রাণ যেন।

ইন্দুমতী মা-শাইনের প্রসঙ্গ তুলল প্রথম, হাসতে হাসতে বলল, ওই মা শাইনের কিন্তু মনে মনে ভয়ানক রাগ আমার ওপর, জানেন···।

ঘুরে বললাম। ওই হাসির পিছনে বিবেকগত অস্বস্তি কিছু আছে কিনা সেটুকু লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলাম। বোঝা গেল না। সাদাসিধে জবাব দিলাম, তোমার খুশির কারণটা ওর তো রাগের কারণ হতেই পারে।

ইন্দুমতী চেয়ে রইল।—কিন্তু একজন যদি ওকে ভাল না বাসে আমি কি করব ?

—মহাদেবও বলবে, একজন যদি হেওয়ার্ডকে ভাল না বাসে সে কি করবে ?

ঈষৎ থতমত খেয়ে হেসে ফেললে ইন্দুমতী।—তা আমার যদি উড়তে ভালো না লাগে আর, কি করব !

থ-মিনের সঙ্গে হেওয়ার্ড জলে নেমেছিল বলে ইন্দুমতীর সেই ব্যাকুলতা মনে

পড়া সত্ত্বেও বলতে ছাড়লাম না, ভালো না লাগলে কি আর করবে⋯তবে ওরা বলে, হেওয়ার্ডের ওড়ার পাখাটি তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ।

দু' চোখ বিস্ফারিত করে ইন্দুমতী চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। চাপা হাসি উপচে উঠবে যেন।—কারা বলে ?

হাসতে হল।—সবাই বলে। সান্টু ঘোষ বলে।

—সান্টু ঘোষ। হালকা চাপল্যে ঝলমলিয়ে উঠল ইন্দুমতী।—হেওয়ার্ডের পাখা ভাঙলেও পা আছে দুটো—তার তো পা-ই ভেঙেছে !

ভারি একটা খুশির খোরাক পেয়েছে যেন। নিঃশ্বাস ছাড়ল ঘটা করে।—যাক, অনেক শুনেছেন তাহলে। আর কি বলে সবাই বলুন দেখি, শোনা যাক—

ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠেছি কেন বুঝছি না। সান্টু ঘোষের কথা ক'টাও মুখে এসে গেল ফস করে।—আর বলে একটুখানি বাড়তি লাভ ছাড়া আর কেউ কিছু আশা করে না তোমার কাছ থেকে, তারা আসে নিছক স্পোর্টের আশায়, ওই থেকে বাড়তি যেটুকু মেলে !⋯

নিঃশব্দে অনেকক্ষণ হাসল ইন্দুমতী। শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে নিল একবার। চপলতা গেছে। হাসির আভাসটুকু আছে। আস্তে আস্তে বলল, খুব সত্যি কথাই বলে ⋯ওই বাড়তির লোভটুকু কেউ ছাড়তে পারলে না বলেই তো আজও বেঁচে আছি, নইলে আমার কঙ্কালও দেখতে পেতেন না এতদিনে। এই স্পোর্টের বদলে তিলে তিলে মরতে দেখলেও কেউ ফিরে তাকাতো না। সতেরো বছরের মেয়ে তিন বছর বসেছিল না খেয়ে আধমরা হয়ে, কেউ তাকায়নি। যার তার ঘরে গিয়ে উঠতে হয়েছে তাকে, কেউ তাকায়নি।

মুখের দিকে চেয়ে থামল একটু, তারপর বলে গেল, তাকিয়েছে, যখন স্পোর্ট দেখল আর বাড়তি লাভের আশা দেখল। আমি এখান থেকে চলে যাব সেটা কেউ চায় ভাবেন নাকি ? আপনার ওই সান্টু ঘোষই কি চায় ?

হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে গেলাম যেন। ইন্দুমতী থামল না, বলে গেল, বাড়তি লাভের আশা ছাড়ে কে ? জরুরী আলোচনা আছে বলে আমাকে রঙচাঙের ওই একটা নিরিবিলি পাথরে এনে তুলেছিল আপনাদের সান্টু ঘোষও। নিজের আড়াইশ টাকার সঙ্গে আমার আড়াইশ টাকা মাইনে জুড়ে একটা সাংসারিক সচ্ছলতার ছক কেটেছে—তার ওপর আমি বাড়তি লাভ। আমি রাজী হইনি, তাতেই বা কি ? ওই বাড়তি লাভটুকুর জন্য অন্তত হাত বাড়াতে ক্ষতি কি ?⋯বেচারীর পা'টা অতটা জখম হয়ে যাবে আমি ভাবিনি।

চাপা হাসিতে ইন্দুমতীর দু'চোখ চকচকিয়ে উঠল আবার।—বলতাম না,

মহাদেবকেও বলিনি, কিন্তু এই বাড়তি লাভের কথা শুনে না বলে পারলুম না।

স্থান-কাল ভুল হয়ে গেল। মুখে কথা সরল না একটাও। সাণ্টু ঘোষের সমস্ত বিদ্বেষের পিছনে এতবড় নগ্নতা যেন আমাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলল একমুহূর্তে। মুখ তুলে আর তাকাতেও সঙ্কোচ।

*

* *

ফকিরুদ্দিন বলেছিল, এই পোর্টব্লেয়ারে ভারি রগড়ের কিছু ঘটবে একটা। কিন্তু কি ঘটবে নিজেও জানত না তখন।

ঘটেছে কিছু···

এমন কিছু, যাতে করে সমস্ত দ্বীপটাই বুঝি নাড়া খেয়ে উঠল একবার।

রবিবার। পরদিন আমরা রওনা হব। এ দিনটা কাটলে বাঁচি। ক'দিন ধরেই ভালো লাগছে না আর। একটা দিনও ভালো লাগছে না।

একই ঘরে বাস করে একজন মানুষকে কতক্ষণ এড়িয়ে চলা যায়। সারাক্ষণের বিড়ম্বনা। সহজ হওয়ার বিড়ম্বনা। চোরের দায় আমারই, এই বুঝি ধরা পড়ে যাই। সাণ্টু ঘোষ মুখের দিকে তাকালে অস্বস্তি, অস্বস্তি তার দিকে তাকাতেও। অথচ চলে যাব বলে তার মন খারাপ। সত্যিই খারাপ। শেষের ক'টা দিন আমারই জন্য সে ছুটি নেওয়ার ব্যবস্থা করছিল। এটা সেটা বলে আটকানো গেছে। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসছে রোজই। এসে দেখতে না পেলে ক্ষুণ্ণ হয়। একদিন ঠাট্টাও করেছিল, এই পোর্টব্লেয়ারে তোমার তেমন জমল না দেখছি শুধু আমার সঙ্গেই! সময়ই পেলে না—

জবাব দেওয়া যেত। আগে হলে বলা যেত, পায়ের যে অবস্থা করে রেখেছ, তোমার সঙ্গে জমাতে হলে কালাপানি টপকে এসেও ঘরের মধ্যেই কাটাতে হয় সারাক্ষণ। বলতে পারিনি। তার জখম পায়ের কথা মুখে আনতেও সঙ্কোচ। হাসতে চেষ্টা করেছিলাম। তাও পারা গেছে কিনা জানি না।

টাকার মানুষ মহাদেবকে দখল করে হিসেবী সাণ্টু ঘোষের কোনো একটা প্ল্যান বরবাদ করে দিয়েছে ইন্দুমতী—সে-রকম ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু তার হিসেবের এই সহজ দিকটা একটি বারও মনে হয়নি। শুধু ওর এই প্ল্যানটুকু ভেস্তে গেছে বলেই এমন লাগছে না। এখানেই শেষ হলে লজ্জার কারণ থাকত না। বরং শোনার পর সাণ্টু ঘোষকে নিয়েই পড়া যেত ভালো করে। এই দিবারাত্রির ক্ষোভ থেকে টেনে তোলা যেত ওকে ···হিসেব বরবাদ হওয়ার পরে যদি আর না এগোতো সে। পা জখম হওয়ার কোনো কারণ যদি না ঘটত।

রাগ করব ? বিদ্বেষে মুখ ফেরাব ? কিন্তু পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী ! বিশ্বের তনুতে সেই অতনুকে ছ'ড়িয়েছ তুমি, তার কাঁপন লাগবে না ? কার ওপরে রাগ করব ? কোন্ দিকে মুখ ফেরাব ? চারদিকে লবণাক্ত জল ঘেরা ছোট্ট এই দ্বীপটুকুর মধ্যেও অন্ধ তাড়নার শেকল খুলে দিতে ছাড়নি তুমি— এখানে এরা কি করবে ? এখানে কৃপণ দেখছি তো তোমাকেই !

রাগ করেছিলাম। বিদ্বেষে মুখও ফিরিয়েছিলাম। সমুদ্রের ধার থেকে সেদিন ইন্দুমতীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে অনির্দিষ্ট ঘোরা-ঘুরির পরে একটু রাত করেই ঘরে ফিরেছিলাম। ক্লান্ত ভেবে সাণ্টু ঘোষ বিরক্ত করেনি তেমন। তার ধারণা ক্লাব থেকে ফিরছি। সেই রাতেও সাণ্টু ঘোষকে প্রণাম সারতে দেখেছি কালী-গণেশ পটের সামনে দাঁড়িয়ে। অবাক লেগেছে, কি চায় ? কোন্ নিভর চায় ? কি চায়, বা কি চাইল জানি না। কিন্তু মনে হল, ওর অগোচরের অন্তরাত্মা চাইছে, যা দিয়েছ সব তুমি ফিরিয়ে নাও—ক্ষুধা দিয়েছ, বাসনা দিয়েছ. তাড়না দিয়েছ—তোমার দান তুমি সব ফিরিয়ে নাও। সব নাও।

চেয়ে চেয়ে নিঃশব্দে দেখেছি অনেকক্ষণ। রাগ গেছে, বিদ্বেষ গেছে। দুঃখ হয়েছে ওর জন্যে। দিনে দিনে সঙ্কোচ বেড়েছে। হাত সবাই বাড়ায়। যোগ্যতা বিশেষে তার রকমফের দেখি শুধু। সাণ্টু ঘোষের পৌরুষ নেই মহাদেবের মত, যোগ্যতা নেই হেওয়ার্ডের মত। কিন্তু হাত বাড়ানোর মূলে তফাৎ কোথায় ? সেই তাগিদের থেকে ক'জন রেহাই পায় ?

সকাল সকাল উঠে সাণ্টু ঘোষ গেছে বাজারে। ভালো-মন্দ বাজার করবে। দুদিন ধরে ফকিরুদ্দিনের আশায় থেকে তার সব সাধই পণ্ড হয়েছে। লোকটা যেন পোর্টব্লেয়ার থেকেই উবে গেছে। এই শেষের ক'টা দিন ভাল মত আমাকে খাওয়াতে না পারার দুঃখ ওর মর্মান্তিক।

একলা বসে আর কি করি। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম অ্যাবার্ডিনের দিকে। উদ্দেশ্য মা-শাইনের সঙ্গে একবার দেখা করা। যাবার আগে দেখা হবে বলেছিলাম। তার ছোট্ট বন্ধু ডাকটুকু আমার ভালো লেগেছে। এই ডাকে হৃদ্যতার থেকেও শুচিতা বেশি। অবহেলা করতে মন সরে না।

এসে দেখি দরজায় তালা লাগানো। দেখা করার আগ্রহও আর থাকল না। কারণ এ তালার অর্থ মা-শাইন কাজে গেছে। অর্থাৎ জঙ্গলে গেছে মদ চোলাই করতে।

ফিরে এলাম। বাড়ি ঢুকতে ভালো লাগল না। এক্ষুনি হয়ত সাণ্টু ঘোষ খবর শোনাতে বসবে কিছু। এগিয়ে চললাম গেস্ট হাউসের দিকে। এ ক'দিনের

মধ্যে হেওয়ার্ডের সঙ্গেও কথাবার্তা তেমন হয়নি।

গত ক'টা দিনে এঠ এক মানুষেরও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। তাস খেলায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার সেই আগ্রহই নেই আর। নরম মিষ্টি হাসিটুকুও গেছে। সে ক্লাবে আসার আগে দিশি মহলে মা-শাইনকে নিয়ে একটু-আধটু চপল ইশারার আভাস পেয়েছি। মোটরে ওদের হাওয়া খেয়ে বেড়ানোটা ইদানীং চোখে পড়েছে সকলেরই। তবে ইংরেজ পাইলট বর্মী মেয়ের দিকে ঝুঁকেছে—এমন কিছু সরগরম ব্যাপার নয় সেটা। ইন্দুমতী-অধ্যায়ে যেমন হয়ে উঠেছিল, তেমন নয়। বিদেশীর পক্ষে সাধারণ আমোদের পর্যায়ে পড়ে বোধ হয় এটা। বাঙালী মেয়ে নিয়ে লোকটা বিভ্রান্ত হয়েছিল বলে, নইলে এটাই যেন স্বাভাবিক ক্লাবের সান্ধ্য-সভ্যদের বিবেচনায়। রূপ-রসিকের চোখে কোথায় মা-শাইন আর কোথায় ইন্দুমতী! সাহস আর সামর্থ্য যদি থাকে তো সরাসরি সেই রূপের আসরে যাও। ভালবাসাবাসির ভড়ং কেন আবার।

সান্টু ঘোষ অবশ্য উল্টো বলেছে। চিরাচরিত স্থূল মন্তব্য করেছে, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে সাহেব, বেচারীর আর দোষ কি।

কিন্তু কেন জানি ফকিরুদ্দিনের কথাই আমার মনে আসছে বার বার। —পোর্টব্লেয়ারে ঘটবে কিছু একটা···রগড়ের কিছু ঘটবে। মা শাইনের দিকে কেন ঝুঁকেছে ক্যাপ্টেন অনুমান করতে পারিনে। হয়ত এঁরা যা বলেন তাই ঠিক! সাহস আর সামর্থ্য থাকলে রূপ-রসিকের মা শাইনের দিকেই আগে চোখ পড়ার কথা। কিন্তু ফকির বলে, থ-মিনও প্রায় নৈমিত্তিক আসা যাওয়া করছে তার সাহেবের কাছে। ওই হাতকাটা লোকটার প্রতি সাহেবের প্রীতি একদিন দেখেই অনুমান করতে পারি। সেই প্রীতির প্রতিদানে থ-মিন মা-শাইনের হৃদয়াসন থেকে মহাদেবকে সরিয়ে হেওয়ার্ডকে বসাতে চেষ্টা করছে, এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস হয় না। মহাদেব সরেই গেছে সেটা না বোঝার মত নির্বোধ নয় থ-মিন। কিন্তু যাই হোক. হেওয়ার্ড এত বিমর্ষ কেন? গত সন্ধ্যায় ক্লাবেই আসেনি সে। ইন্দুমতীকে না পাওয়ার খেদ এতদিনে প্রকট হয়ে উঠল? মহাদেবকে শুভেচ্ছা জানানোর পর? হ্যাভলকের শুভ-কামনা করার পর?

কি জানি···।

গেস্ট হাউসে পাওয়া গেল না হেওয়ার্ডকে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না। ফকিরুদ্দিনও নেই। রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে ফিরে চললাম আবার। গেটের মুখে দেখা ডোরা টমাসের সঙ্গে। বেতের গেট সরিয়ে ভিতরে আসার উদ্যোগ করছে।

—হ্যালো—হ্যালো! একগাল হেসে ডোরা সামনে এসে দাঁড়াল।

সবিনয়ে ছক-বাঁধা কুশল প্রশ্ন করলাম আমিও।

—ফিরে চললে যে? ফ্লাইংম্যান নেই?

বিশেষণটা এই প্রথম শুনলাম। এই মেয়েটার মুখে এ-রকমই মানায়।

বললাম, না নেই।

—গেল কোথায়! কাল রাতে এসেও তো পাইনি, কি যে হয়েছে—

চকচকে নীল চোখ দুটো মুখের ওপর এসে থামল, তুমি এখন যাচ্ছ কোথায়?

—ঘরের দিকে—

—ও...আচ্ছা চলো, তোমার সঙ্গেই যাই খানিকটা।

অন্তরঙ্গতার সুর কানে লাগছে আজও। গেস্ট-হাউস ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়েই জিজ্ঞাসা করল, কালই তাহলে চললে তোমরা?—

—সেই রকমই কথা, এখন হেওয়ার্ড জানে—

অস্ফুট হেসে ডোরা বলল. হেওয়ার্ডের বোধ হয় কিছু একটা মাথা ব্যথা হয়েছে—বড় বড় মহলে ঘোরাঘুরি করছে, যাওয়া না ভেস্তে যায় তোমাদের।

কান পেতে সন্তর্পণে অপেক্ষা করছি। নিজে থেকে যা বলে বলুক, আগ্রহ দেখালে হয়ত থেমে যাবে। কিন্তু ডোরা হেওয়ার্ড প্রসঙ্গ সেখানেই বাতিল করে দিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে আজ দেখা হয়ে গেল খুব ভালো হল, নইলে আজই একবার তোমার কাছে যেতে হত।

এ আবার কি কথা! কৌতূহল চেপে অপেক্ষা করছি। এর পর ডোরা সহাস্যে যা জানালো, তার মর্ম—সেই সে-দিন যে সে ইন্দুমতীর বাড়িতে মহাদেবের কাছে গিয়েছিল, সেটা আমারই জন্যে—মহাদেবের মারফৎ আমার কাছে একটা অনুরোধ পেশ করবে বলে।

বিস্ময় দমন করতে না পেরে বললাম, কিন্তু তার পরেও তো অনেক দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে, কিছু বলনি তো?

—আর দরকার হল না। মার্থাকে যাতে তুমি ভাল করে কণ্ট্রাক্ট ব্রীজটা শিখিয়ে দাও সেই কথা বলতে গিয়েছিলাম। তারপর তো মার্থা নিজেই বলেছে তোমাকে, বলেনি?

ঘাড় নাড়লাম, বলেছে।

ওর খুব সখ...আর তাছাড়া বুঝতেই তো পারছ—। হেসে ফেলে ঘাড় ফেরাল আবার।—সত্যিই এই বিদিকিচ্ছিরি খেলা শেখার বইপত্র আছে, না তুমি ভাঁওতা দিয়েছ মার্থাকে?

জিজ্ঞাসার ফাঁকে এই চপল মেয়ের স্বচ্ছ নীল চোখ দুটো দৃষ্টিপথে একটা ছাপ দিয়ে গেল যেন। ওরা বিশ্বাস বড করে না কাউকে সেটা তো ওদের দোষ নয়। ওদের নিয়ে খেলাই করতে দেখে সকলকে, সততা দেখে না।

বললাম, না ভাঁওতা নয়, বই আছে।

—তুমি পাঠাবে? ভুলবে না তো? মার্থা কিন্তু অনেক আশা করে আছে—

—ভুলব কেন। পাঠাবো।

—ভেরি গুড! তা বলে তুমি নিজে খরচা করতে পাবে না—এ সব বইয়ের কি রকম দাম আমার জানা নেই, দাম বলো—আমি বিকেলে তোমাকে দিয়ে আসব।

—দাম দিতে হবে না, বই আমার নিজেরই আছে। গিয়েই মার্থার নামে পাঠাবো।

খুশিতে ডোরা দাঁড়িয়ে পড়ল এবার।—ইউ আর এ জেন্টলম্যান অ্যাণ্ড রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল! গুড বাই—যাবার আগে দেখা হবে, আমরা মেরিনে থাকব।

আন্তরিকভাবে হাতে গোটাকতক ঝাঁকুনি দিয়ে তরতরিয়ে আবার গেস্ট হাউসের রাস্তা ধরে চলল ডোরা টমাস। আমি দাঁড়িয়ে। লঘু পদক্ষেপে সামনের বাঁকে আড়াল হয়ে গেল সে। এত তুচ্ছ উপলক্ষেও এমন এক আনন্দ বুকের মধ্যে টনটনিয়ে ওঠে জানতুম না? ডোরার হাব-ভাব চাল-চলনে যতটুকু প্রকাশ, সে কতটুকু? কতটুকু দেখেছি আমি? কতটুকু দেখেছে গোটা পোর্টব্লেয়ারের মানুষেরা? সেই দেখায় শুধু এক মিথুন-মনের প্রচ্ছন্ন উল্লাস ছাড়া আর কি আছে? এরই মধ্যে পরস্পরকে আগলে রেখেছে, আড়াল করে রেখেছে এই দুই ফিরিঙ্গী মেয়ে। ওরা জানে, কেউ সহায় নেই ওদের। ওদের বাবাও না।

...মনে পড়ে, হাওয়া-ঘরে প্রথম আলাপের সময় বোটানিকস-এর ধারের পাথরে ডোরাকে হেওয়ার্ডের পার্শ্বলগ্ন দেখে মার্থা বলেছিল, ওর বাবাকে বলবে, তাগিদ দিলে ডোরা এবারে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কলকাতা যেতে রাজী হবে বোধ হয়। এই বলার মধ্যে নিজের বেদনা খুব গোপন থাকেনি। কিন্তু বোনের দরদে শুভ প্রেরণাটুকুই বড হয়ে উঠেছিল তার মনে। এ ছাড়াও ডোরার অনেক চপল উচ্ছলতার মুহূর্তে মার্থার চোখে দেখেছি অন্যের বিরূপতা নিরসনের নীরব প্রয়াস। অন্য দিকে মার্থার নিভৃত মনটি জানে বলেই এই উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটা ক্লাবে রামির টেবিল ছেড়ে পারতে ঘেঁসে না ব্রীজ টেবিলের দিকে। গোপনে ইন্দুমতীর বাড়ি যায় মহাদেবকে ধরে আমায় তার বোনকে কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ খেলা

শেখাতে রাজী করানোর জন্যে।

যৌবনের ছটা নেই মার্থার। কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ শিখে সে অভাবটুকু পুরিয়ে নেবে সে-বিশ্বাসও নেই। যতদূর মনে হয় ডোরারও নেই। তবু সেই সকালে লবণাক্ত সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট এই দ্বীপের আরো ছোট্ট এই হৃদয়ের বস্তু আমাকে নাড়া দিয়েছিল।

কিন্তু তারপরেই যে এক বিপরীত ধাক্কায় সব কিছু তচনচ ওলট পালট হয়ে যাবে আবার সে-জন্যেও প্রস্তুত ছিল না মন। ফকিরুদ্দিনের সেই কিছু একটা ঘটার মুহূর্ত যে এই মুহূর্ত আর এমন মুহূর্ত—শুধু আমি কেন, এই গোটা দ্বীপের একজনও তার পূর্বাভাস পায়নি।

ঘরে ঢোকার আগেই মনে হল গোটা বাড়িটায় কিসের যেন চাপা উত্তেজনা। অনেকেই বেরিয়ে আসছে। রাস্তায় এসে দাঁড়াচ্ছে। আমাকে দেখে সাণ্টু ঘোষ দু' চোখ কপালে তুলে বলল, শুনেছ?

—কি শুনব?

—মা-শাইনকে পুলিসে ধরেছে, থ-মিনকেও ধরেছে—হেওয়ার্ড ধরিয়ে দিয়েছে, জঙ্গলে মদ চোলাই হচ্ছিল—হেওয়ার্ড পুলিস নিয়ে গিয়ে দলকে দল একেবারে হাতে-নাতে ধরিয়ে দিয়েছে! ওদের নিয়ে পুলিস সেলুলার জেলের দিকে রওনা হয়েছে! এক নিঃশ্বাসে বলে সাণ্টু ঘোষ।

হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেলাম একেবারে।

...মা-শাইনকে পুলিসে ধরেছে...থ-মিনকে পুলিসে ধরেছে...ধরিয়ে দিয়েছে হেওয়ার্ড...!

ঠিক শুনছি কি না সন্দেহ হচ্ছে। হতবুদ্ধির মতো বললাম, হেওয়ার্ড জানল কি করে কোন্ জঙ্গলে কি করছিল ওরা?

ফকিরুদ্দিন ছিল। সে আর না জানে কী?

কিছু ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু হেওয়ার্ড এ কাজ করতে গেল কেন? সে তো বরাবরই জানত ওরা এই করে!

সাণ্টু ঘোষ গম্ভীর মুখে জবাব দিল, এরা বলাবলি করছে মহাদেবের সাট আছে নইলে হেওয়ার্ডের কি দায় পড়েছে! এই মদের জন্যেই নাকি বস্তিতে মড়ক লাগে এখানে—কম করে ছ'টি বছর ঠুকে দেবে শুনছি, তা ছাড়া আর থাকতেও দেবে না বোধ হয় পোর্টব্লেয়ারে।

সচেতন হয়ে বাইরে এলাম একসময়। অনেকে চলেছে। দেখতেই চলেছে বোধ হয়। পায়ে পায়ে আমিও চলেছি উদ্দেশ্যহীন ভাবে। কোথা

থেকে কি হয়ে গেল বুঝছি না। কেন হল বুঝছি না। মা-শাইনের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের ক'টা দিনের মেলামেশা—থ-মিনের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের এই অ-সম হৃদ্যতা—তারপরেই বলা নেই কওয়া নেই, এই পাঁজর ডুমডানো সংবাদ! সম্ভব অসম্ভব নানা চিন্তার জট পাকাচ্ছে মাথায়। মহাদেব ষড় করেছে হেওয়ার্ডের সঙ্গে? বিশ্বাস হয় না। আর হেওয়ার্ডই বা তাতে নাক গলাবে কেন? এমন নাটকীয় ষড়যন্ত্র আর নাটকীয় প্রেম কে কবে শুনেছে?

হঠাৎ পিছন থেকে একটা তীব্র হর্ন কানে আসতে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হল। সেই গতির মাথায় সশব্দে থামল মহাদেবের জিপ! ঘাড় বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, আসবে?

কথা না বলে উঠে বসলাম। ঝড়ের বেগে জিপ ছুটল। একটি কথাও বলল না মহাদেব। নিজের অগোচরেই ঘন ঘন তাকাচ্ছি তার দিকে। লালচে দেখাচ্ছে তার থমথমে গম্ভীর মুখ। জিপ যেন উড়ে চলেছে সেলুলার জেলের পথে।

ব্রেক কষল মহাদেব। সামনেই চলেছে ওরা। আগে পিছে পুলিস প্রহরা। পিছনে পিছনে বহু দর্শক।··· ওই মা-শাইন···তার পিছনে থ-মিন।

লাফিয়ে নামল মহাদেব। ছুটল প্রায়।

—মা-শাইন! মা-শাইন!

দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে। পুলিসও। ফিরে দেখতে লাগল কি ব্যাপার। মা-শাইন ফিরে তাকিয়েছে। থ-মিন ফিরে তাকিয়েছে।

কোনদিকে দৃকপাত না করে দ্রুত মা-শাইনের সামনে এসে দাঁড়াল মহাদেব। —মা-শাইন! আমি কিচ্ছু জানি না। হেওয়ার্ড করেছে এ কাজ, কেন করেছে আমি জানি না, আমি কিছু করিনি মা-শাইন!

মা-শাইনের নিষ্পলক দুই চোখ মহাদেবের মুখের ওপর আটকে রইল খানিকক্ষণ। অনেকক্ষণ যেন। মনে হল একটু হাসির আভাসও দেখলাম ওই চোখে। অস্ফুটকণ্ঠে জবাব দিল, তুমি করলে খুশি হতাম।

মহাদেবের পিছনে আমাকে দেখে সত্যি হাসল যেন মা-শাইন। আরো একটু হালকা সুরে বলল, বন্ধু বলেছিল যাবার আগে দেখা হবে·· দেখা হল।

যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল মা-শাইন। পুলিসও সচেতন হয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল তাদের।

সম্বিৎ ফিরতে মহাদেব জিপে এসে উঠল। বিভ্রান্তের মত তাকে অনুসরণ করার মুখে থমকে দাঁড়ালাম। সামনেই টমাস সাহেব। পুলিস বেষ্টন ভেদ

করে নির্নিমেষে কাউকে দেখছেন তিনি। নিগূঢ় পিচ্ছিলতায় চকচক করছে দুই চোখ। দুটো পা-ই অবশ হয়ে আসছিল আমার। মহাদেবের অসহিষ্ণু তাড়া খেয়ে চমক ভাঙল। ক্ষিপ্র বেগে জিপ ছুটল আবার। দশ মিনিটও লাগল না গেস্ট-হাউসে আসতে। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল ফকিরুদ্দিন। মহাদেব জিজ্ঞাসা করল, হেওয়ার্ড কোথায় ?

বিশুদ্ধ বাংলায় জবাব দিল ফকিরুদ্দিন, ভিতরে হুজুর—

—খবর দাও।

ব্যস্তসমস্তভাবে ভিতরে চলে গেল ফকিরুদ্দিন। দাঁড়িয়ে আছি নিঃশব্দে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন ধুকধুক করছে বুকের ভিতর।

ফকিরুদ্দিন ফিরে এলো। বলল, সাহেব বড় ব্যস্ত হুজুর, এখন দেখা হবে না বলল।

খবরটা নিয়ে আর দাঁড়াল না। অসহিষ্ণুতায় দু'হাত তুলে মহাদেব সমস্ত শরীরটাই যেন ঝাঁকিয়ে নিল একবার।

এবারের লম্বা পাড়ি দেখে বুঝলাম ইন্দুমতীর বাড়ির দিকে ছুটেছে জিপ।

ইন্দুমতী শোনেইনি এখন পর্যন্ত। যাত্রার ব্যস্ততায় ঘরের বার হয়নি। শুনল। শুনে কাঠ হয়ে বসে রইল।

কথা নেই কারো মুখে। বসে আছি। অনেকক্ষণ। গুমটের মত লাগছে। চেয়ারের কাঁধে মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে মহাদেব চোখ বুজে পড়ে আছে স্থাণুর মত। হঠাৎই একসময়ে নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল সে। মুখ তুলে সোজা তাকালো ইন্দুমতীর মুখের দিকে। জিজ্ঞাসা করল, তুমি বলতে পারো হেওয়ার্ড এ-কাজ করতে গেল কেন ?

নীরস শোনালো। ত্রস্তে চেয়ে দেখি, ইন্দুমতী যেন নির্দয় রকমের ঘা খেল একটা। বিমূঢ় মুখে বলল, আমি !···আমি কেমন করে জানব ?

দু'চার মুহূর্ত···। মহাদেব চেয়ারের কাঁধে মাথা রাখল আবার। ইন্দুমতী তার দিকেই চেয়ে আছে স্থির নেত্রে। বিস্ময়ের ঘোর গিয়ে গাম্ভীর্যের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে মুখে। বলল, আমাকে এক্ষুনি একবার নিয়ে চলো দেখি—

মহাদেব মাথা তুলল।—কোথায় ?

—গেস্ট-হাউসে।

—গিয়ে কি হবে ?

—কিছু হবে না, কেন কি'হল জানা যাবে !

মহাদেবের উগ্র দৃষ্টি কোমল হয়ে আসছে ক্রমশ। ক্লান্ত দেহ চেয়ারে এলিয়ে

দিল আবার। গলার স্বরও স্তিমিত। বলল, জেনে আর কি হবে—মিছিমিছি অপমান হতে যাবে কেন।

ইন্দুমতী উঠে দাঁড়াল, কঠিন সুরে বলল, অপমান অত সস্তা নয়—।

সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে। হতভম্বের মত বসে আছি। মহাদেবের মুখেও অস্বস্তির ছাপ। পরিতাপের চিহ্ন। ইন্দুমতী প্রায় তক্ষুনি ফিরে এলো। শাড়িটা বদলে এসেছে।

শান্ত মুখে বলল, তোমার গিয়ে কাজ নেই, তুমি বোসো। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, আপনি আসুন, রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ধরে নেব।

কণ্ঠস্বরেই কিছু ছিল কিনা জানি না। মহাদেব বাধা দিতে পারেনি তাকে। আমিও যন্ত্রচালিতের মতই উঠে এসেছি।

গেস্ট-হাউসের কাছাকাছি এসে অস্বস্তি দমন করা সম্ভব হল না আর। সঙ্কোচ কাটিয়ে বললাম, এ-সবের মধ্যে আমার থাকা ঠিক হবে না…আমি বাইরে অপেক্ষা করব।

তীব্রনেত্রে ফিরে তাকালে ইন্দুমতী। উষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, আপনি না থাকলে হবে কেন? আমি যে কিছু করিনি সেটা আপনার বন্ধুকে বলবে কে? সাক্ষী দরকার নেই?

বাকস্ফুরণ হল না। আত্মস্থ হয়ে দেখি, ট্যাক্সি গেস্ট-হাউসের আঙিনায় ঢুকে পড়েছে। ড্রাইভার হর্ন বাজাতে আবারও ভিতর থেকে সামনে এসে দাঁড়াল ফকিরুদ্দিন।

ইন্দুমতী গাড়ি থেকে নেমে এসেছে ততক্ষণে। অগত্যা আমিও। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই এবারে ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে ফকিরুদ্দিন জানালো ক্যাপ্টেন আউট। এই একটু আগে হাওয়াই জাহাজের গাড়িতে চেপে জেলের বড় কর্তাদের—

শেষ করার আগেই তার মুখের ওপর এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে ইন্দুমতী পরদা সরিয়ে হলের মধ্যে ঢুকে গেল। থতমত খেয়ে ফকিরুদ্দিন ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল শুধু। আমি কি করব বুঝে উঠছি না।

ফকিরুদ্দিন মিথ্যে বলেনি। ইন্দুমতী ফিরে এলো। অস্ফুটস্বরে বলল, নেই—।

ট্যাক্সিতে উঠে বসল আবার। ট্যাক্সি স্টার্ট দিতে সচেতন হয়ে শশব্যস্ত সেলাম ঠুকল ফকিরুদ্দিন।

অনেকটা পথ চুপচাপ পেরিয়ে আসার পর আস্তে আস্তে বললাম, মিছিমিছি এভাবে না এলেও হত। মহাদেব আর কিছু ভেবে না পেয়ে ও-কথা জিজ্ঞাসা

করেছিল,···একটু পরেই তার অনুতাপ লক্ষ্য করেছি আমি। এ-রকম একটা ব্যাপারে দিশেহারা হবার কথা, নইলে সে তোমাকে অবিশ্বাস করে না। করতে পারে না।

অন্যমনস্কের মত ইন্দুমতী ভাবছে কি। একবার শুধু ফিরে তাকিয়ে সামনের দিকেই দৃষ্টি ফেরালো আবার। একটু বাদে অন্যমনস্কের মতই মৃদু জবাব দিল, জানি না আমাকে বিশ্বাস না করলে তার আর থাকে কি···।

পরদিন।

মেরিনে লোকের ভিড আসার সময় যেমন দেখেছিলাম এখনও ঠিক তেমনি। কিন্তু সেদিন এরা সকলে ছিল অপরিচিত। চেনা হোক অচেনা হোক, আজ এদের সকলের সঙ্গেই একটা সম্পর্ক গডে উঠেছে যেন। যাত্রার মুহূর্তে তাই কোথায় টান পডে। আন্দামান ভালো লাগছিল না, যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম—কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে এই দ্বীপের মানুষদের আপন-জন ছাডা আর কিছু ভাবা যাচ্ছিল না। সোসাইটির ক্লাবের মর্যাদা-সম্পন্ন সভ্যদেরও অনেকে এসেছেন। কর সাহেব, দাসগুপ্ত, রে—যাবার মুখে তাঁদের শুভেচ্ছা ফেলনা মনে হয়নি। সাণ্টু ঘোষের চোখে জল দেখে তাডাতাডি মুখ ফেরাতে হয়েছে। আসার দিন যে ধপধপে শাদা পোশাকে দেখেছিলাম ডোরা মার্থাকে—আজও তাই। কিন্তু আজ দু'হাত ভরে ওদের বিদায়ী প্রীতি গ্রহণ করার সময় মনে মনে ভেবেছি, ওদের এই শাদা অক্ষয় হোক। মার্থাকে নীরবে আশ্বাস দিয়েছি, তার অনুরোধ ভুলব না। ডোরাকে নীরবে বলতে চেয়েছি, অনেক ভুল হালকা করে গেলাম, সেইটুকু সঞ্চয়। সামনে এসে গুরুগম্ভীর সেলাম জানিয়েছে হেড-কুক ফকিরুদ্দিন। বলেছে, গুডবাই সাব! আপনি খারাপ ভেবে গেলেন, বাট মি নট ভেরি ব্যাড—

তাডাতাডি বাধা দিয়েছি, খারাপ ভাবব কেন ফকির, তুমি তো খুব ভালো! দুটো দশ টাকার নোটই তার হাতে গুঁজে দিয়েছি—'টু টেন রুপি নোটস,' ক্যাপ্টেন যেমন দেয় তাকে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য দিইনি—শুধু দিয়েছি। অপ্রত্যাশিত আনন্দে ফকির আবার সেলাম করেছে, আর বিশ্বাস করেছে, তাকে খারাপ লোক ভাবিনি।

তারপর আমরা প্লেনে উঠে বসেছি যাত্রীর মতো। আমি ইন্দুমতী আর মহাদেব।

সদলবলে হেওয়ার্ড উঠেছে ক্যাপ্টেনের মতো।

কালাপানিতে আলোড়ন তুলে প্লেন উঠেছে আকাশে। চলেছে পাহাড় পেরিয়ে, বাতাস সাঁতরে। দ্বীপগুলো দূরে সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে অনেক সৌন্দর্যের সঙ্গে কি একটা ব্যথাও যেন আহরণ করে নিয়ে চলেছি।

ইন্দুমতীর চেষ্টায় মহাদেব সহজ হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। কলোনী নিয়ে জোর আলোচনা চালিয়েছে তারা। উৎসাহ ইন্দুমতীরই বেশী। দিল্লী অভিযানের ফল কি দাঁড়াবে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলেছে। আমাকেও আলোচনার মধ্যে টানতে চেষ্টা করেছে অনেকবার। তারপর হাল ছেড়ে বলেছে, আপনার হল কী? কি ভাবছেন সেই থেকে?

কী ভাবছি নিজেও জানি না। অথচ ঘণ্টা তিনেক পেরিয়ে গেছে।

হেওয়ার্ডের কথা ভেবেছি কি? কি জানি। অনেকবার তার কথা মনে হয়েছে অবশ্য। কিন্তু আগে যেমন হত, তেমন নয়। তার আকস্মিক নির্মমতা আমাদের বিমূঢ় করেছে। শুধু মহাদেব নয়, ইন্দুমতীও বোধ হয় তাকে একেবারে মুছে ফেলেছে মন থেকে।

আরো কিছুক্ষণ বাদে উঠে অয়্যারলেসের খুপরির দিকে পা বাড়ালাম। মহাদেব বা ইন্দুমতী দেখেও কিছু বলল না। ওরা তখন বৃষ্টির জল ধরার রিজারভয়ের বসাচ্ছে হ্যাভলকে।

সামনের এঞ্জিনের ঘর খোলা। পাইলটের সীটে একা হেওয়ার্ড নিশ্চল বসে। তার শাদা বোগা হাত দুটো শুধু নড়াচড়া করছে। পাশের আসন খালি। কো-পাইলট অয়্যারলেসের ঘরে বসে।

হেওয়ার্ড ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একসময়। হাসল একটু। সেই প্রথম দেখা নরম-হাসি। ইশারায় পাশের শূন্য আসনে এসে বসতে বলল।

সন্তর্পণে গিয়ে বসলাম, যেমন আসার সময় বসেছিলাম। এক ঝাঁক মেঘের মধ্যে ঢুকে গেল প্লেনটা। মেঘ থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে চোখ রেখেই হেওয়ার্ড বলল, কেমন দেখছ ওদের? ভারি আনন্দে আছে দু'টিতে, না? প্লেনে ওঠার সময় দেখেছি, দে লুক্ড ব্রাইট অ্যাণ্ড হ্যাপি।

মাথা নেড়ে হাসতে চেষ্টা করলাম।

হেওয়ার্ড নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেছে আবার। তন্ময় হয়ে প্লেন চালাচ্ছে কি ভাবছে কিছু বোঝা গেল না। স্থির, নিশ্চল তন্ময়তা। ভাবলেশহীন শাদা মুখ, স্টিয়ারিংয়ের ওপর দুটো রোগা-রোগা হাত। পাশে কে বসে আছে সে খেয়ালও নেই বোধ হয়।

হঠাৎ সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কেঁপে উঠল আমার। একটা হিম-শীতল ভয় যেন

হাডের মধ্যে শিরশিরিয়ে উঠতে লাগল। ঝাপসা দেখছি সব কিছু।···বায়ুগতি একটা বন্যার যেন দেখছি চোখের সামনে। দেখছি, এমনি অনুভূতিশূন্য এক নিস্পন্দ-মূর্তি পাইলট কল্পান্তক মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বার বার। অন্তিম গ্রাসে মুখ থুবড়ে পড়েনি, কিন্তু পড়তে দ্বিধা নেই এতটুকু।

এ কথা বলল কেন হেওয়ার্ড? এ কথা বলল কেন?

ব্যঙ্গ? বিদ্রূপ?

মা-শাইনের প্রতি ওর নির্মমতা কতটুকু আর···? সভয়ে তাকালাম নিচের দিকে। তেরো হাজার ফুট নিচের সমুদ্র যেন হেসে উঠল খলখলিয়ে। নির্মম বীভৎস মনে হল তার নীল তরঙ্গ। আসার সময় সমস্ত ভয়, সমস্ত কাঁপুনির অবসান হয়েছিল এই এঞ্জিন-ঘরে বসে। এখন মনে হল, এই মুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে গেলে বুঝি রক্ষা পাব।

—ওকি! এবারও তোমার ভয় করছে নাকি?

চমকে তাকালাম তার দিকে। সকৌতুকে হেওয়াড নিরীক্ষণ করছে আমাকে। যে হেওয়াডকে আমার ভালো লেগেছিল, সেই হেওয়াড।

নিজের উদ্ভট কল্পনায় অপ্রস্তুতের একশেষ। হাসি দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করলাম নিজেকে।—না, ভয় নয় ঠিক··ভয় কিসের, এমনি ভাবছিলাম··

—কী ভাবছিলে?

কী জবাব দেব! জবাব হাতড়ে বেড়ানোর বিড়ম্বনা। ছেলেমানুষের মতই বলে ফেললাম, ভাবছিলাম এত উঁচু থেকে প্লেনটা সমুদ্রের ওপর আছড়ে পড়লে কি হয়।

ক্যাপ্টেন চেয়ে আছে সে চোখের দিকে সহজভাবে তাকাতে পারছি না। সকৌতুকে আমার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে যেন।

—দেখবে কি হয়?

বলার সঙ্গে সঙ্গে কলকব্জাহীন একটা ভারী পদার্থের মতই প্লেনটা মৃত্যুময় শূন্য গহ্বরে নেমে এলো বোধ করি হাজার খানেক ফুট। এই পতনের মুখে রক্ত কেমন করে জল হয় তার উপলব্ধি মর্মান্তিক।

প্লেন স্থির হল আবার। আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল। জীবনের স্পন্দন বুকে এলো। হেওয়াড হাসছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে চেয়ে চেয়ে। আমার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত উবে গেছে তাই দেখছে। চুপ করে থেকে আমাকে সামলে উঠতে সময় দিল সে। আমি জানি ওর চোখে ধরা পড়েছি। কি ভাবছিলাম তখন আর কেন ভাবছিলাম—সে বুঝতে পেরেছে।

অনেকক্ষণ বাদে হেসে বলল, দেখো···ধ্বংস এত দেখেছি যে ওতে আর লোভ নেই। সেই জন্যেই ওই কাজ ছেড়েছি। আফটার অল্ কিলিং ইজ ম্যাডনেস। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

অনেকবার হয়ত নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি মনে মনে। কিন্তু মা-শাইনের চিন্তাটা মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধছেই খচখচ করে। তার বেলায় এমন এক অকরুণ পাগলামিতে পেয়ে বসল কেন হেওয়ার্ডকে সেটা না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। সে-ও তো হত্যারই নামান্তর! তাই বোধ হয় নিজেকে ধিক্কার দেওয়া সত্ত্বেও কোনো অনুতাপের কথা মুখে এল না। এ সুযোগ গেলে আর জানাও যাবে না কেন ক্যাপ্টেন ওই বর্মী নারী পুরুষ দু'টিকে এতবড় এক দুর্ভাগ্যের মুখে ঠেলে দিয়ে এলো।

তার মুখের ওপর চোখ রেখে খুব সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম, মা-শাইন আর থ মিনের ওপর তুমি হঠাৎ এত নির্দয় হলে কেন, ও-রকম কাজ তো ওখানে অনেকেই করে?

জবাবে সামনের দিকে চেয়ে হেওয়ার্ড উল্টে যেন ওং দু'জনের হয়ে সুপারিশ করল। বলল, তা করলেও মা শাইন মেয়ে খারাপ নয়, আই লাইক্ হার—থ-মিন তো খুবই ভালো, আই অ্যাডোর হিম···

দুর্বোধ্য বিস্ময়।—তাহলে তুমি এভাবে ওদের জেলে পুরে এলে কেন?

মৃদু মৃদু হাসতে লাগল হেওয়ার্ড। যে হাসি বরাবর আমার ভালো লেগেছে। বলল, দিলাম···চারজনের চারটে জীবন নিরাপদ করার জন্যে, জাস্ট টু সেভ ফোর প্রেশাস লাইভস্···ইন্দুমতী আর মহাদেব, মা-শাইন আর থ মিন···।

চেয়ে আছি হতভম্বের মতো।

আরও নিস্পৃহ মুখে হেওয়ার্ড বলল, মা শাইন মহাদেবের জন্যে ইন্দুমতীকে সরাতো, আর তারপর থ-মিন মা-শাইনের জন্যে মহাদেবকে সরাতো, আর এই করতে গিয়ে ধরা পড়ে ওদের ফাঁসি হতে পারতো।

···কতক্ষণ বসেছিলাম ঠিক নেই। এঞ্জিন খুপরি থেকে কখন উঠে এসেছি খেয়াল নেই। ইন্দুমতী আর মহাদেব কী বলছিল স্মরণ নেই। আত্মস্থ হলাম যখন, প্লেন ল্যাণ্ড করেছে এরোড্রোমে।

দরজা খোলা হল। সিঁড়ি বেয়ে আমরা নেমে এলাম। এঞ্জিন ছেড়ে হেওয়ার্ডও নামল। আমাদের সকলেরই দিকে চেয়ে হাসল একটু। তাকে লক্ষ্য না করার ব্যস্ততা দেখাল ইন্দুমতী আর মহাদেব।

আগে আগে বিশাল এরোড্রোম-প্রাঙ্গণ পেরিয়ে চলল হেওয়ার্ড। রোগা লম্বা

শাদাটে মূর্তি। শিথিল দুর্বল চলার ভঙ্গি। চেয়ে আছি। যত এগিয়ে যাচ্ছে ততো যেন বড় হয়ে উঠছে ওই মূর্তি। চেয়েই আছি।

গোটা এরোড্রোমটা জুড়ে আগে আগে পা ফেলে চলেছে ক্যাপ্টেন হেওয়ার্ড।

তৃতীয় ভাগ

আবার কর্ণফুলী আবার সমুদ্র

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রিয়বরেষু

হিসেব করে দেখা হয়নি, তবু চলতি মাসের মধ্যে কম করে চোদ্দ-পনের দিন সোমেন মিত্তির এখানকার এই আসরে হাজিরা দিয়েছেন। আর সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত, অর্থাৎ সকলের আপত্তির বেড়া টপকে এখান থেকে গা তোলার আগে পর্যন্ত লোকটাকে জানলার পাশের ওই একই জায়গায় একই টেবিলে বসে থাকতে দেখেছেন।

দেখেছেন বলতে লক্ষ্য করেছেন। কেন সেটা নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। এই প্রমোদ-গড্ডলিকার আসরে কেউ কাউকে বিশেষ করে দেখে না, লক্ষ্য করে না। যদি না স্বার্থের যোগ থাকে। যদি না প্রবৃত্তির লাগাম ভব্যতার মুঠো থেকে খসে পড়ে। সে-ক্ষেত্রে দেখা বা লক্ষ্য করাটা শিকারের সামিল। যার পকেটের জোর কম সে ভারী পকেটওয়ালার গা সেঁটে আছে। যার রিপু উসখুস, ঘোরলাগা দু চোখ টান-টান করে সে কাছে-দূরের রংদার আধুনিকাদের যৌবন জৌলুসের আনন্দে বিভোর। এর নাম দেখাও নয়, লক্ষ্য করাও নয়।

সোমেন মিত্র ওই লোকটাকে দেখেন। লক্ষ্য করেন।

বছর তেতাল্লিশের মত বয়স মনে হয়। গায়ের রং না ফর্সা না কালো। দেখলেই মনে হবে এর থেকে বেশি ফর্সা হলে মানাতো না, বেশি কালো হলেও না। বেশ লম্বা। সুঠাম স্বাস্থ্য সুরার প্রভাবেই হয়তো একটু মোটার দিকে ঘেঁষেছে। তাও বে-মানান নয়। মুখখানাও একটু ভারী, কিন্তু মিষ্টি। দাড়ি গোঁপ পরিষ্কার কামানো। মাথায় ঝাঁকড়া লম্বা চুল। অনেক দিন ওতে তেল বা কাঁচি পড়েনি। পরনে কোনদিন বাদামী কোনদিন বা ভুসো রঙের ট্রাউজার। গায়ের সার্টের বুকের দিকের সামান্য খানিকটা দেখা যায়, কারণ সার্টের ওপর সাদা কাপড়ের লম্বাটে কোর্তা। কাজের সময় হাসপাতালের বা চেম্বারের ডাক্তারেরা যেমন পরে। এখানে ও-রকম ঢোলা কোর্তা আর পাঁচজনের নজর কাড়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু এই বেশে লোকটাকে মানায় ভালো তাও ঠিক। গত চৌদ্দ-পনেরটা রাতের মধ্যে বহুবার তার সঙ্গে সোমেন মিত্তিরের চোখাচোখি হয়েছে। তবু ওই দুটো চোখের সঠিক বিশ্লেষণ এখন পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি তিনি। শুধু মনে হয়েছে, ও-চোখের বিশেষ একটা ভাব আছে, ভাষা আছে, আর তার গভীরে আরো যেন কিছু আছে।

কিন্তু ভালো করে দেখার জো নেই। তার আগেই দীপু সরকার ফোড়ন কেটে বসবে। সে ওই লোকটার হাবভাব বা চাউনি বরদাস্ত করতে পারে না। আর তার মুরুব্বি মোহন চৌধুরী একটু উসকে দিলে তো দীপু সরকার গলা উঁচিয়েই ওই লোকের উদ্দেশ্যে বাতাসে মন্তব্য ছুঁড়বে। অদূরের আসন থেকে ভদ্রলোক কিছু আঁচ করতে পারলেও একইভাবে চেয়ে থাকে। ফলে সোমেনবাবুকে অন্তত চোখ ফেরাতে হয়।

জানলার ধারের ওই ছোট্ট টেবিলটার সামনে একটাই চেয়ার। যতদূর মনে পড়ে টেবিলের উল্টো দিকে কিছুদিন আগেও আর একটা চেয়ার ছিল। অর্থাৎ মুখোমুখি দু'জনার বসার ব্যবস্থা ছিল। এ-সব জায়গায় নিছক একলা কেউ বড আসে না। মনে হয়, বর্তমানের ওই খদ্দেরটির নির্দেশে বয় সামনের চেয়ারটা সরিয়ে ফেলেছে। ভদ্রলোক এলেই ওদিকের বয়টাকে শশব্যস্তে সেলাম ঠুকতে দেখা যায়। তার হাতের মস্ত পেট-মোটা শৌখিন ব্যাগটা বহন করে টেবিলে পৌঁছে দেবার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ পরিবেশে ভদ্রলোকের গায়ের ঢোলা সাদা কোর্তাটা যেমন দ্রষ্টব্য বস্তু হাতের পেট-মোটা ব্যাগটাও তাই।

কিন্তু ব্যাগটা ভদ্রলোক বয়ের হাতে ছাড়ে না। নিজেই বয়ে এনে নিজের চেয়ারের পাশে মাটিতে রাখে। তারপর ক্লান্ত শরীরটাকে চেয়ারে ছেড়ে দেয়। যখন আসে তখন বেশ শ্রান্তই মনে হয় তাকে। ওই মোটা ব্যাগে কি থাকতে পারে সেও এক-একদিন এ-দিকের অর্থাৎ মোহন চৌধুরীর প্রগল্‌ভ আসরের গবেষণার বিষয়।

ভদ্রলোক আসার আগে আর কোনো বিচ্ছিন্ন খদ্দের ওই টেবিলের দিকে এগোলে বয় তাকে বাধা দিয়ে অন্য টেবিলে নিয়ে যায় সোমেনবাবুরা তাও লক্ষ্য করেছেন। হয়তো বলে ওটা রিজার্ভ টেবিল। মোটা বখশিস মেলে নিশ্চয়। কত মেলে সোমেনবাবু দেখেন নি। কারণ সে ওঠার আগেই তাঁর ওঠার সময় হয়ে যায়।

ওই ছোট্ট টেবিলটা একেবারে জানলার গায়ে ঠেকানো। ওখানে বসলে পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিচের জমজমাট রাতের রাস্তা দেখা যায়। একের পর এক গেলাস খালি করার ফাঁকে লোকটা কখনো চেয়ারে হেলান দেয়, কখনো শিথিল কাঁধ জানলার গায়ে রেখে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে, কখনো বা একটু সামনে ঝুঁকে কৌতুক-ছোঁয়া ভারী মুখখানা দু' হাতের চেটোয় রেখে মোহনবাবুদের জমাট আসরখানা পর্যবেক্ষণ করে।

দর্শনের এই শেষের পর্যায়ে খোঁচা মেরে কেউ দীপু সরকারকে সচেতন করে

দিলে তার ঘোর-লাগা চোখ দুটো সেদিকে ধাওয়া করে আর ভারী জিভ চিড়বিড় করে ওঠে। ওই মানুষটার চোখের তারায় তখন যেন আরো একটু মজার ছোঁয়া লাগে। তাই দেখে সোমেনবাবুর ভয় ধরে দীপু সরকারের মুখ দিয়ে তখন অশ্রাব্য কুশ্রাব্য কিছু না ছোটে।

দক্ষিণ-ঘেঁষা কলকাতার এই অভিজাত এলাকায় এটাই সব-থেকে নাম-করা বার রেস্তরাঁ এবং অতিথি নিবাস। নাম বিদিশা। নামের জলুস যেমন তাৎপর্যও তেমনি। তিনতলা ফ্যাশনের বাড়িটা পেল্লায় নয় খুব, মাঝারি গোছের। সমস্ত একতলায় ছোট-বড় নানা আকারের শৌখিন দোকান-পাট। দোতলার সবটা জুড়ে এই মস্ত হল। এখানে বার আর রেস্তরাঁ। এক মাথায় হালকা সবুজ পার্টিশন। তার সামনের বড় বড় কাঁচের আলমারিতে লেবেল আঁটা লম্বা মোটা বেঁটে খাটো নানা আকারের মদের বোতল। আলমারিগুলোর সামনে বুক উঁচু সার্ভিং ডেস্ক। ডেস্ক-এর এক ধারেও রকমারি বোতল সাজানো। ডেস্ক-এর ওধারে জনা চারেক লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বয়দের অর্ডার মাফিক যান্ত্রিক তৎপরতায় বোতল থেকে পেগ মেপে গেলাসে মদ ঢেলে চলেছে। তাদের একপাশে গদি আঁটা হাইচেয়ারে ম্যানেজার বসে থাকে। ডেস্ক-এর বোতল ফুরলে ম্যানেজার আলমারি থেকে নতুন বোতল বার করে দেয়। পার্টিশনের ওধারের সমস্তটাই কিচেন। সেখানে সর্বদা গরম খাবার মজুত। এছাড়া এতবড় হলের কোথাও ক্যাবিন বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই। এখানে মেয়েপুরুষ যারা আসে তারা কোনরকম আব্রুর বা গোপনতার পরোয়া করে না। ছোট বা বড় দল অনুযায়ী টেবিল চেয়ার সাজানো। এই সাজানোর মধ্যেই যেটুকু বিচ্ছিন্নতা এবং রুচির পরিচয়। আসর জমে উঠলে আশপাশের আর কোন্ দল কিরকম মজলিশে মেতে উঠেছে কার এত দেখার সময়?

তিন তলার সবটা এক বা দু ঘরের ফার্নিশড স্যুইট। ফারনিশড বলতে ফাইভ স্টার ফোর স্টার ছেড়ে ট্রিপল স্টার ডাবল স্টার হোটেলেরও ধারেকাছে কিছু নয়। তবু এসব স্যুইটেও পয়সাঅলা অতিথির সমাগম ঘটে থাকে। আর স্বল্পমেয়াদী বাসিন্দাদেরই আনাগোনা বেশি এখানে। কেন সে সম্পর্কে মোহন চৌধুরীর অন্তরঙ্গ সাগরেদ দীপু সরকারের অনেক রসের গল্প জিভের ডগায় মজুত। তার নাকি অনেক জানা অনেক দেখা। প্রসঙ্গ জমে উঠলে সেসব চ্যালেঞ্জ করার মতো বেরসিক কেউ নয়।

আজই আসর শুরু হবার মুখে দীপু সরকার একটা রংদার খবরের পটকা ফাটাতে পেরেছে ভাবছে। প্রথম দফার গেলাস টেবিলে আসামাত্র পরপর দু-তিন

চুমুক জঠরে চালান দিয়ে শুধু সোমেনবাবুকে ছেড়ে আর সকলের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, মিস্টার আউল দি ফিলসফার এই বিদিশার তিন তলার একখানা ঘর নিয়ে আছে, এবং যে দু' একটি অতিথিকে তার কাছে আসতে দেখা যায় তারা যাকে বলে নির্ভেজাল মেয়েছেলে। এখন লেখক যদি এ খবরটাকে চ্যালেঞ্জ করে কিছু বাজী রাখতে চায়—এ শর্মা রাজি।

লেখক বলতে সোমেন মিত্র। মিস্টার আউল জানালার পাশেই ওই নির্দিষ্ট একক আসনের আপাত অনুপস্থিত ভদ্রলোক। পেঁচার মতো ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে অতএব দীপু সরকারের ভাষায় সে মিস্টার আউল। পেঁচার সঙ্গে দর্শন শাস্ত্রের কিছু যোগ আছে তাই ফিলসফার। ঠাট্টার ছলে এই যোগের ব্যাপারটা সোমেনবাবুই দীপু সরকারকে বলেছিলেন। সেটা সে তক্ষুনি মেনে নিয়ে আউলের সঙ্গে ফিলসফার জুড়েছে। যে জীব দিনে ঘুমোয় রাতে দেখে তাকে দর্শনকলা-পটু বলতে ওর আপত্তি নেই। যদিও ওই দর্শনের হ্যাংলামিটাই দীপু সরকারের আসল গাত্রদাহের কারণ। তার বদ্ধ বিশ্বাস, ঘুরে ফিরে জানলার পাশের ওই লোক এ-টেবিলে সকলের দিকে যে চেয়ে থাকে সেটা ভাঁওতা। আসলে এ-টেবিলের একজনই তার চোখের ভোজ। দেখেও সেই একজনকেই।

এ টেবিলে সেই একজনের নামটা আর তার জিভ ঠেলে বেরোয়নি, তার বদলে নাকের পাশের উঁচু হাড়ের খাঁজে ঢোকা দু চোখ যে সুশ্রী রমণী-মুখের ওপর চড়াও হয়েছে—তার দুগালে লালের ছোপ। সোমেন মিত্তিরের পাশ থেকে নূপুর ব্যানার্জি সুন্দর মুখে ভ্রুকুটি তুলে অস্ফুট মন্তব্য করেছে, অসভ্যের ধাড়ি!

আলোচনা গরম রাখার জন্যেই আপত্তির সুরে সোমেন বাবু বলেছিলেন, কেন, সেদিন তো ও-ভদ্রলোক মঞ্জু দত্তকে দর্শন করছিল ভেবে তোমার মেজাজ বিগড়েছিল—

নামী লেখকের বিবেচনার দৈন্য দেখে দীপু সরকারের হালছাড়া মুখ—আপনি এরকম বলবেন ভাবিনি। সেরকম খদের মুখে মুড়িও চিকেন চাউমিনের মতো বাহার লাগে, বুঝলেন? সেদিন কি আপনার পাশের ওই উনি ছিলেন ওখানে!

না, সেদিন নূপুর ব্যানার্জি আসেনি, মঞ্জু দত্ত একলাই ছিল বটে। নূপুর শুধু সোমেনবাবুকে শুনিয়ে আবার মন্তব্য করেছে, পাজীর পাঝাড়া একেবারে—

আজ দীপু সরকারের আত্মতুষ্টির কারণ একটু থাকতেই পারে। জানলার পাশের একক টেবিলের ওই লোকটাকে নিয়ে ভিতরে ভিতরে সোমেন মিত্তির যে একটু গবেষণা চালাচ্ছেন সেটা সে ঠিকই আঁচ করেছে। রসদের ক্রিয়ার

শরীর মন হালকা হতে এর মধ্যে দুদিন মিস্টার আউল দি ফিলসফারের সঙ্গে একটু রসানো আলাপের বাসনায় সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। দর্শনের ঠাণ্ডা ছুরি চালিয়ে ভদ্রলোক সেই থেকে নূপুর ব্যানার্জির নরম শরীর ফালা ফালা করে চলেছে নাকি। অতএব নেড়েচেড়ে দেখা দরকার একটু।

দীপু সরকারের উক্তির সবটাই রং-চড়ানো এ অবশ্য জোর করে বলা চলে না। ভদ্রলোক এ-টেবিলের সকলকেই দেখে, তার মধ্যে নূপুর ব্যানার্জিকে হয়তো বা বেশিই দেখে। শুধু সোমেন মিত্তির আর নূপুর ছাড়া আর সকলেও তখন রসের ঘোরে। মজা দেখতে আপত্তি নেই কারো। দীপু সরকার চেয়ার ঠেলে এগিয়ে আসার আগেই ফিসফস করে নূপুর সোমেন মিত্তিরকে বলেছে, বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে, আটকান ওকে—

না বললেও আটকাতেন। সোমেন মিত্তির জোর করেই তাকে আবার চেয়ারে ঠেলে দিয়েছেন। সমঝে দেবার মতো করে বলেছেন, ওই লোক তোমার ইয়ার্কির পাত্র নয়, এটুকু আমার কাছ থেকে শুনে রাখো।

কেন বলেছিলেন জানেন না। ধারণা, মিথ্যে বলেননি। লেখক সোমেন মিত্র জীবনের রঙ্গমঞ্চে কম ঘোরাফেরা করেননি, কম দেখেননি। বার্ধক্যের লোলুপতাও অনেক দেখেছেন, দেখছেন। মুখোমুখি বসে মোহন চৌধুরীকে দেখছেন, তার পাশে সহযোগী প্রযোজক স্বল্পভাষী উপেন হালদারকে দেখছেন। রঙের ঘোরে দীপু সরকার যদি তাদের কারো ওপর চড়াও হতে চাইতো সোমেন মিত্তির তখনো বাধা দিতেন হয়তো কিন্তু মনে মনে হাসতেন। এরকম শংকা বোধ করতেন না।

যাক, সেই থেকে জানলার পাশের ওই লোকের প্রসঙ্গ উঠলে বা সে এই টেবিলের দিকে চেয়ে থাকলে দীপু সরকার সোমেন মিত্তিরকে ঠেস দিয়ে কথা বলতে ছাড়ে না। প্রায়ই বলে যে-লোক একলা এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে মদ চালায় আর তার পরেও মুখ বুজেই চলে যায় সে সাংঘাতিক মানুষ না হয়ে যায় না। সোমেনবাবুকেই উসকে দিতে চায়, আমার বদলে আপনিই ওখানে ভিড়ে পড়ুন—দুর্দান্ত গোছের কোনো প্লট পেয়ে যাবেন বলে দিলাম।

দীপু সরকারের কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো কিনা সোমেন মিত্তির তাও ভেবেছেন। কিন্তু লোকটাকে সামনাসামনি দেখলে সাংঘাতিক আদৌ মনে হয় না। কৌতুক ছোঁয়া ওই গভীর দৃষ্টির মুখোমুখি হলে বিপরীত কিছুই বরং ভাবতে ইচ্ছে করে। তাকে নিয়ে এদিকের মজলিশের চাপা গরম ভাবটা সে টের পায়। দুদিন দীপু সরকারকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দেবার

পর তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে কেন যেন নিজেই লজ্জা পেয়েছেন সোমেনবাবু। মনে হয়েছে, কেন কি করছেন ভদ্রলোকের তাও অগোচর নয়।

কিন্তু আজ দীপু সরকারকে ঠেকায় কে? এতদিন বাদে ঝুনো লেখকের কল্পনা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে ভাবছে। সুরাসভার প্রধান মোহন চৌধুরি, তার সহযোগী প্রযোজক উপেন হালদার, ক্যামেরাম্যান অজিত শ্রীমল, সুরকার নিশীথ কর, সহনায়িকা থেকে নায়িকা হবার সাধ যার ষোল আনা সেই মঞ্জু দত্ত, এমন কি অনেক প্রত্যাশার ভাবী নায়িকা নূপুর ব্যানার্জিও হালকা বিস্ময়ে সোমেনবাবুর দিকে চেয়ে আছে। দীপু সরকারের মিস্টার আউল দি ফিলসফার এই বিদিশার তিনতলাতেই একঘরের স্যুইট নিয়ে আছে সেটা যেন বিচিত্র খবর, আর যে একটি দুটি অতিথিকে তার কাছে আসতে দেখা যায় তারা মেয়েছেলে—এ যেন একেবারে তাজ্জব খবর!

মজার গরমে দীপু সরকার আর একদিকে চেয়ে থাকলেও সোমেন মিত্তির ফিরলেন তার দিকে। একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিন তলার স্যুইটে থাকলে ভদ্রলোক রোজ ভারী ব্যাগটা এখানে বয়ে আনে কেন? গায়ের কোর্তাটাই বা ঘরে ছেড়ে রেখে আসে না কেন?

গেলাসের বাকিটুকু গলায় ঢালা শেষ দীপু সরকারের। আসর জমানোর নতুন খোরাক পেয়ে অদূরের বয়ের উদ্দেশে দু আঙুলের তুড়ি ঠুকলো মোহন চৌধুরী। বয় ছুটে এসে গেলাস বদলে দিয়ে গেল। অতএব কৃতজ্ঞতার দায়েও লেখককে কোণ-ঠাসা করা দরকার দীপু সরকারের। তার মুখ গম্ভীর, কোটরগত চোখে হাসির ঝিলিক।—আপনার গল্পের নায়ক-নায়িকারা হয় মেলে নয়তো তকাতে হটে—দু'কথায় ঝপ করে সেটা বলে না দিয়ে একশ দু'শ পাতার ভণিতা চালান কেন? আবহাওয়া টইটুম্বুর পাকা করে তোলার জন্য কিনা?

তার বক্তব্য উপসংহারে গড়ানোর অপেক্ষায় সোমেনবাবু চুপ। তাঁর পাশের চেয়ারে নূপুর ব্যানার্জি বিরক্ত একটু। সোমেনবাবুর প্রতি অঢেল ভক্তিশ্রদ্ধা। তাঁর পিছনে লাগাটা সে-ই শুধু বরদাস্ত করতে চায় না। তাছাড়া দীপু সরকারের প্রায় সব কথাতে ওই মেয়ের বিরক্তি। সভার অন্য সকলে উৎসুক।

—এও ঠিক তাই বুঝলেন? দীপু সরকার গেলাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে ঠক করে টেবিলে রাখল সেটা।—ওই পেটমোটা ব্যাগ, ওই বেশবাশ, ওই হাবভাব সবই তাকে ঘিরে স্রেফ একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করার জন্য। মিস্টার আউল তার জীবনের গল্পে নিজেকে নায়ক সাজিয়ে রেখেছে—সে-গল্পের শাঁস বার করতে গেলে দেখবেন ওই তিনতলার একখানা ঘর আর একটা দুটো মেয়েছেলের

যাতায়াত, ব্যস্।

দীপু সরকার লেখা পড়া জানা ছেলে, এম-এ পাশ। মদের মাত্রা না বাড়া পর্যন্ত অনেক ভারী কথাও বেশ হালকা করে বলতে পারে। ইস্কুল মাষ্টারি ছেড়ে কিছু একটা কলাবিশারদ হয়ে বসার আশায় ছবির জগতে ভিড়েছিল। কিন্তু কলালক্ষ্মী শেষ পর্যন্ত তাকে পরিপুষ্ট একখানা কলা দেখিয়েই ছেড়েছে নাকি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আর অনেক তোষামোদের তেল ঢেলে গাল-ভরা নামের কিছু দায়িত্ব কপালে জুটেছে। প্রোডাকশন ম্যানেজার। এক কথায় হরেক রকমের হুজ্জৎ কাঁধে নিয়ে যোগানদারীর কাজ, আর সেই সঙ্গে টাকা যারা ঢালছে তাদের মন যুগিয়ে চলার কাজ। সখেদে নিজেই সে এ-সব কথা সোমেনবাবুকে বলেছিল একদিন।

আর সকলের মতো কথার ফানুসে হাসির রোল তোলার মানুষ নন সোমেন-বাবু। ফিরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুটো খবর তোমাকে কে দিলে?

—যে-ই দিক, আধখানা বড় নোট টেবিলে ছাড়ুন, এ খবর ছেড়ে শ্যাম-সুন্দরের নাড়ির খবর টেনে বার করে আপনার সামনে ফেলে দিচ্ছি। আর রসের খবর ছেড়ে শুধু দু'চারটে গন্ধ কথায় যদি মন ভরে, একখানা পেঁচো নোট তার ওই পেয়ারের বেয়ারার পকেটে গুঁজে দিন, সে-ও সাদাসাপটাভাবে সাহেবের তিনতলার ঘরের নম্বর আর তার হেঁয়ালিপনার কিছু রসদ আপনার কানে ঢুকিয়ে দেবে।

দীপু সরকারের আধখানা বড় নোট বলতে পঞ্চাশ টাকার নোট, আর পেঁচো নোট বলতে পাঁচ টাকার নোট। পরের পকেটের টাকাকড়ি সে লোষ্ট্রবৎ দেখে থাকে, কিন্তু নিজের পাঁচ টাকা ছেড়ে পাঁচ সিকের ওপরেও প্রগাঢ় মমতা। অতএব শ্যামসুন্দরের অর্থাৎ এত আলোচনার ওই মানুষটার খবর জানার জন্য সে তার পেয়ারের বেয়ারার পকেটে পাঁচ টাকা ছেড়ে পাঁচ পয়সাও গুঁজেছে এমন সম্ভাবনা মাথায় আসছে না। বখশিসের আশায় বেয়ারাটা হয়তো বা সবে মুখ খুলেছিল আর ওটুকু খবর পাচার করার পরেও হাতে কিছু না আসাতে বুদ্ধিমানের মত মুখ শেলাই করেছে। অন্যথায় ওটুকু খবর পেয়ে দীপু সরকার তুষ্ট হবার পাত্র নয়।

মোহন চৌধুরীর আমেজ-লাগা মগজে এবারে আর এক সম্ভাবনার আলোক-পাত ঘটে গেল। হাতের গেলাসটা দিয়ে টেবিলে ঠুক-ঠুক শব্দ করল বার দুই, তারপর চোখের পাতা টান করে সোমেন মিত্তিরের দিকেই ফিরল।—কি রকম সাসপিশাস ব্যাপার মনে হচ্ছে মশাই—বড়দরের স্মাগলার-টাগলার নয় তো!···

বাঙালী কিনা তাও তো ঠিক বোঝা যায় না, আর ওই ব্যাগটাতেই বা কি আছে কে জানে—সবক্ষণ ওটা বয়ে বেড়ায় কেন ?

এই টেবিলের হালকা বাতাসে হঠাৎ যেন গুমোট ধরল একটু। মন্তব্য শোনার আশায় ক্যামেরাম্যান অজিত শ্রীমল, সুরকার নিশীথ কর, সহ নায়িকা মঞ্জু দত্ত আর ভাবী নায়িকা নূপুর ব্যানার্জীর জোড়া-জোড়া চোখ সোমেন মিত্তিরের দিকে ঘুরেছে। রোমাঞ্চকর কিছু শুনলে নায়িকার মুখশ্রীর ভাবান্তর অনুধাবনের চেষ্টা সহযোগী প্রযোজক উপেন হালদারের—তার দুচোখ নূপুর ব্যানার্জীর মুখের ওপর। শুধু দীপু সরকারের হাড়ের খাঁজের উদ্ভাসিত দৃষ্টিটা তখনো মোহন চৌধুরীর মুখখানাকেই আঁকড়ে আছে।

স্মাগলার ছেড়ে অনেক রকম চক্রের মেয়ে-পুরুষের আনাগোনা স্বাভাবিক এ-সব জায়গায়। সোমেনবাবুর অন্তত তা নিয়ে বাড়তি কোনো উদ্দীপনার হেতু নেই—কারণ তাঁর হাতে কোকাকোলার গেলাস। তবু যে-লোকের প্রসঙ্গে আলোচনা তার সম্পর্কে কোনো অজ্ঞাত কারণেই যেন কৌতূহল একটু আছেই। তাই মোহন চৌধুরীর এই নয়া সন্দেহটা কল্পনায় ওই লোকের মুখের ওপর ফেলে একটু নাড়াচাড়া করে দেখছিলেন সোমেনবাবু—সম্ভব কি সম্ভব না। আজকের এই জটিল যুগে সুন্দর মুখ আর যা-ই হোক ভিতরেব দর্পণ নয় সকল ক্ষেত্রে।

একটু নীরবতার ফাঁকে যাকে বলে অ্যাকশন শুরু করে দিল দীপু সরকার। হঠাৎ দেখা গেল উবুড় হয়ে নিজের মাথাটাকে টেবিলের নিচে ঢোকাচ্ছে সে। ফলে সকলের জোড়া জোড়া চোখ আবার তার দিকে। এমন কি উপেন হালদারেরও নায়িকার প্রতি মনোযোগে ছেদ পড়েছে।

কিছু একটা অস্বস্তিতেই বুঝি মোহন চৌধুরীর উর্ধ্ব অঙ্গ নড়েচড়ে উঠল একটু। তারপর ব্যাপারটা বোঝা গেল। উবুড় হয়ে টেবিলের নিচে মাথা গলিয়েও দীপু সরকার মোহন চৌধুরীর পায়ের নাগাল পায়নি। এক পায়ের হাটুর নিচের স্পর্শটুকু নিয়ে টেবিলের তলা থেকে মাথা বার করে হাতটা কপালে ঠেকালো। চোখের ঘোর-লাগা তারা দুটো তেমনি উদ্ভাসিত।

—জবাব নেই মোহনদা! উঃ এ দিকটা মাথায়ই আসেনি আমাদের কারো! শালা ধর্মযাজকের মতো আলখাল্লা পরে কোন্ মতলব হাঁসিল করে এখানে এসে মদ গেলে কে জানে! ওই মোটা ব্যাগ খুললে তার মধ্যেও সাংঘাতিক কিছু বেরুবেই আমি বলে দিলাম—

সাময়িক উত্তেজনাটুকু জারিয়ে নেবার জন্যেই হয়তো এবারে যে-যার গেলাস তুলে লম্বা চুমুক লাগালো। এমন কি দেখা-দেখি মঞ্জু দত্ত আর নূপুর ব্যানার্জিও

তাদের সফট ড্রিংক-এর গেলাস হাতে তুলে নিয়েছে। মঞ্জু দত্ত আসরে মদ খায় না, কিন্তু বাড়িতে যে খায় এ নাকি দীপু সরকারের চাক্ষুষ দেখা। আর নূপুর সম্পর্কে তার ভবিষ্যদ্বাণী এখন মদের গন্ধে নাক সিঁটকোয় কিন্তু একদিন মদ ওকে খাবে। দুর্বল মুহূর্তে তার এ-সব অন্তরঙ্গ আলাপও আবার সোমেন মিত্তিরের সঙ্গেই। নিজের স্বার্থেই ভদ্রলোক কখনো-সখনো ওর পিছনে দু'দশ টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করেন না। অনেক রকমের রসদ থাকে ওর ঝুলিতে। তাছাড়া প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে ওর হাত দিয়ে প্রাপ্তির টাকা পেতে হলে সকলকেই কিছু অন্তত খসাতে হয়। এবারেও ব্ল্যাকের বাকি টাকা সোমেনবাবুর হাতে দিয়ে নিরীহ আবেদনের সুরে বলেছিল, আপনার হাতখানা তো দিব্বি গরম হল, আর আমার হাতটা ধরে দেখুন স্যার—কি বেজায় ঠাণ্ডা!

সেদিনও সোমেন মিত্তির একলা তাকে এই বিদিশায় নিয়ে এসেছিলেন।

সকলের হাতের গেলাস প্রায় একসঙ্গেই টেবিলে নেমে এলো আবার। বয়ের উদ্দেশে এবারে আরো জোরে দু-আঙুলের মেজাজী তুড়ি ঠুকে মোহন চৌধুরী তাকে হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে দিল।

অভ্যস্ত বেয়ারা এ-ভাষা জলের মতো বোঝে। দীপু সরকারের গেলাসে তৃতীয় দফা আর বাকি চারজনের গেলাসে দ্বিতীয় দফা নতুন রসদ এলো। অপর তিনজনের সফট ড্রিংক-এর গেলাসগুলোকে বেয়ারারাও বিরক্তি বা করুণার চোখে দেখে। খেমটার আসরে এসে ঘোমটা টানার মতো ভাবে।

সোডার বোতলের ছিপি খুলে-খুলে বয় সামনে রাখছে। লোকটা বাঙালী। কিন্তু মোহন চৌধুরীর তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলার মেজাজ নয় এখন। জানলার ধারের ছোট টেবিলটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, উও সাহাব আজ নহীঁ আয়েঙ্গে?

বয় জবাব দিল, আসবেন বোধহয়···রোজই আসছেন—

—উন্‌কা নাম কেয়া হ্যায়?

—বড়ুয়া সাহেব।

শুনেই দীপু সরকারের গর্তে ঢোকা দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠতে চাইল। —বুঝুন এবার! অসমীয়া-টসমীয়া হবে নিশ্চয়—

বাঙ্গালী না হওয়াটাই যেন তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ কিছু। বয়ের উদ্দেশে মোহন চৌধুরী আবার প্রশ্ন ছুঁড়ল, সাহাব হিঁয়াই রহতেঁ হ্যায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সোডার বোতলের ছিপি খোলা শেষ। জবাবটা দিয়েই নির্লিপ্ত মুখে

প্রস্থান করল সে। দুহাতের চেটোয় নিজের গেলাসটা আয়েস করে ধরে দীপু সরকার বলল, ও-ব্যাটার মুখের সেলাই কাটতে হলে পকেটে কিছু গুঁজে দিতে হবে মোহনদা, এমনিতে হবে না—আমি চেষ্টা করেছিলাম।

আসর আরো একটু গরম করে তোলার জন্যেই প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যে সোমেন মিত্তির আরো একটু বাড়তি ভাবনার মধ্যে ডুবলেন যেন। নিজের মনেই বললেন, অনেক কিছুই হতে পারে···যে দিনকাল পড়েছে। বে-আইনী চালান ছেড়ে মেয়ে চালানের ব্যবসাও তো কম ফেঁপে ওঠেনি সর্বত্র। দিন কয়েক আগে একটা ইন্টারন্যাশন্যাল রিংএর খবর তো কাগজেই বেরিয়েছিল। চিন্তাচ্ছন্ন দুচোখ এবার দীপু সরকারের মুখের ওপর।—যে মেয়েছেলেরা ওই ভদ্রলোকের কাছে আসে তাদের বয়েস কি রকম খবর নিয়েছ ?

যা ভেবেছিলেন তাই। প্রশ্নের জবাব পেলেন না। মন্তব্যটাই ওদের মগজে কেটে বসেছে। বিশেষ করে মোহন চৌধুরী, দীপু সবকার আর সহযোগী প্রযোজক উপেন হালদারের। তিন জোড়া ঘোলাটে চোখ তাঁর মুখের ওপর হোঁচট খেল এক-প্রস্থ, তারপর একসঙ্গে নূপুব ব্যানার্জির দিকে ঘুরে গেল।

এতক্ষণে যেন রহস্যের রোমহর্ষক হদিস কিছু মিলেছে। ওদের ধারণা, একেবারে নির্ভুল জায়গাটিতেই আঙুল ফেলেছেন সোমেন মিত্তির। তা যদি হয় তো এ-টেবিলের অব্যর্থ শিকার ওই এক জনই। তিন-জোড়া চোখের এই নিগূঢ় বিশ্লেষণের ধাক্কায় চেহারা নূপুর ব্যানার্জি অস্বস্তিতে উসখুস করে উঠল একটু। পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি পুরুষদের এতখানি বিচ্ছিন্ন মনোযোগ মঞ্জু দত্ত হ্যাংলামি ভাবছে। আধখানা ঘাড় বেঁকিয়ে সেও নূপুরকেই দেখছে।

দুশ্চিন্তায় কিনা বলা যায় না, মোহন চৌধুরীর গলার স্বর মোটা শোনালো একটু। বিশ্লেষণরত দুচোখ তখনো নূপুরের মুখের ওপর। —শুনলে ?

সামান্য বিরক্ত মেশানো সুচারু ঝংকার তুলে নূপুর ব্যানার্জি বলল, শুনলাম তো। তা সে যাই হোক না কেন তাতে আমার কি ? আমি কি কচি খুকি নাকি '

মোহন চৌধুরী বা উপেন হালদারের আমেজ লাগা চোখে কচি খুকির মতো লাগছে না আদৌ। ফলে কিছুটা নিশ্চিন্ত কিছুটা বা পরিতৃপ্ত চাউনি তাদের। কিন্তু এ-কথার পরেও হালছাড়া মুখেই গোল পাকিয়ে বসল দীপু সরকার। সে বলে উঠল, আপনার নায়িকার বিবেচনা বুঝুন মোহনদা—যেন ওই সব লোক কচি খুকিদের ধরবার জন্যেই এইসব জায়গায় জাল বিছিয়ে বসে। সামান্য ম্যানেজার হলেও আমি এটুকু জানি, একবার ওদের খপ্পরে পড়লে অতি বুদ্ধিমতী মেয়েদেরও মগজ অ্যায়সা ধোলাই হয়ে যায় যে তখন তারা দিনের আকাশে

রাতের চাঁদ দেখে আর নিজের আপনার জনকেও শত্রু ভাবে।

ততোধিক বিরক্তিতে নূপুর ব্যানার্জি ঝটকা মেরে বলে উঠল, ওঃ, উনি তো সবজান্তা হয়ে বসে আছেন একেবারে!

ওরা দুজন এরকমই পরোক্ষে কথা ছোঁড়াছুঁড়ি করে, সামনাসামনি তর্ক করে না। এ ব্যাপারটা সোমেন মিত্তির আগেও লক্ষ্য করেছেন। প্রতিষ্ঠিত চিত্রতারকারা সামান্য প্রোডাকশন ম্যানেজার ছেড়ে এ লাইনের হোমরা-চোমরাদেরও খুব একটা পরোয়া করে না। কিন্তু নতুন তারকাদের বিপরীত রীতি। সকলকেই তারা কম-বেশী খুশি রেখে চলে। কিন্তু নূপুর ব্যানার্জির আচরণের ব্যতিক্রম শুধু এই প্রোডাকশন ম্যানেজারটির অর্থাৎ দীপু সরকারের বেলায়। তাকে ঠেস দেবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না বড়। আর সকলের কাছে সেটা উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু রসদের গুণে হোক বা যে কারণেই হোক মোহন চৌধুরীর মগজে দুশ্চিন্তার আঁচড় পড়েছে আপাতত। একটা কিছু ভাবনা মাথায় ঢুকলে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে ছাড়ে না। এই কারণে অন্তরঙ্গজনেরা বাহবাও দিয়ে থাকে তাকে। সামনের গেলাস তুলে ছোট একটা চুমুক দিয়ে ভারী চাউনিটা এবারে লেখকের দিকে ঘোরালো সে। টেনে টেনে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে ব্যাপারখানা কি দাঁড়াল?

সময় নেবার অছিলায় সোমেন মিত্তির কোকাকোলার গেলাস মুখে তুললেন। এই ফাঁকটুকু কেউ না কেউ ভরাট করতে চাইবেই। দীপু সরকারের এটা তৃতীয় গেলাস, জবাবও আগ বাড়িয়ে সেই দিল। গলার স্বরে বাড়তি জোর দিয়ে বলল, ব্যাপার জটিল না হলে আপনি ভাববার মানুষ নয় মোহনদা, আর আমিও গোড়া থেকেই বলে আসছি ওই লোক সাংঘাতিক একজন না হয়ে যায় না—একলা একখানা টেবিল দখল করে সমস্তক্ষণ এদিকে চেয়ে-চেয়ে সে যে কিছু একটা মতলব ভেঁজে চলেছে সেটা এখন বোধহয় সকলেই বুঝছেন!

সওয়ালের শেষ মন্তব্যটা নূপুর ব্যানার্জির মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে দীপু সরকার তার গেলাস তুলে নিল।

সমাধানের সাদাসিধে দিকটাই মাথায় এলো ক্যামেরাম্যান অজিত শ্রীমলের। সে বলল, আমরা আমাদের টেবিল চেঞ্জ করলে কি হয়?

নির্লিপ্ত শুধু সোমেন মিত্র। শ্রীমলের পরামর্শটা এত বড় এক জটিল ব্যাপারের ওপর এক বালতি জল ঢেলে দেবার মতো জলো লাগল বাকি সকলের। বিনা বাক্যব্যয়ে মোহন চৌধুরীই সেটা প্রথম বুঝিয়ে দিল। হাতের গেলাস

নাড়তে নাড়তে সদয় দৃষ্টিটা শ্রীমলের মুখের ওপর তুলল একবার। আর এই দৃষ্টির মর্ম অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গে ও-দিক থেকে দীপু সরকার বলে উঠল, ইণ্টারন্যাশনাল শক্র নিয়ে কারবার আর আপনি ক্যামেরার একখানা এস্-শট ঝাড়লেন বটে মশাই।

আবহাওয়া অনুযায়ী চিন্তা ভাবনা তবু মঞ্জু দত্তর। নূপুরের ও-পাশ থেকে সে প্রস্তাব করল, আই বি-তে একটা উড়ো টেলিফোন করে দিলে কি হয়—এসে খোঁজ খবর করুক।

সহযোগী প্রযোজক উপেন হালদার লোকটা এমনিতে কথাবার্তা খুব বেশি বলে না। লোহা-লক্কড়ের কারবারে ফেঁপে ওঠা বাড়তি টাকা নিভরযোগ্য সুড়ঙ্গ পথে চালান করার তাগিদে মোহন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ। এই নতুন পথে রং-এর ছড়াছড়ি, কিন্তু পথের ঘাট-ঘোট ভালো জানা নেই বলেই ব্যবসায়ী মন সর্বদা সন্দিগ্ধ একটু। নতুন বয়েসের কালে রংদার মেজাজ ছিল ভদ্রলোকের। দোলে আর পূজা-পার্বণে নেশার ঝোঁকে একটু বেশি মাত্রায় হৈ-হুল্লোড় মারামারি করে একাধিক বার হাজত বাসের গৌরব অর্জন করেছে। সে সব মুখরোচক গপ্পও এই আসরে দীপু সরকারের মুখ থেকেই শুনেছে সকলে। গপ্পের শেষে লোহাকে তেলে জারানোর মতো গদগদ মুখ তার।—বা-ব্বা! সেসব দিনে উপেনদা যাকে বলে পাড়ার হীরো···মেজাজ বিগড়ালেই ডাইরেক্ট অ্যাকশন, আঙুল তুলে না ডাকলে আমরাও কাছে ঘেঁষতে পেতাম না।

শুনে নতুন পার্টনার একটু তারিফ তখন মোহন চৌধুরীও করেছে। তার ভারী হাসির মুখে খাঁজ পড়েছে, আর মোটা শরীর অল্প অল্প দুলেছে। উপেন হালদারের দেহের কাঠামো সত্যিই বেশ মজবুত এখনো। হাতের গেলাস মুখে তোলার ফাঁকে তার লজ্জা লজ্জা চোরা চাউনি নূপুর ব্যানার্জির মুখের ওপর ওঠা-নামা করেছে। আর, সকলের অগোচরে দীপু সরকার এক-চোখের রসালো বাণ নিক্ষেপ করেছে সোমেন মিত্তিরের দিকে। ভাবখানা, তেলে লোহা ভেজে কিনা দেখে নিন সার।

উপস্থিত সংকটে সকলের এই মিনমিনে ভাবটা আদৌ পছন্দ নয় এ হেন উপেন হালদারের। মঞ্জু দত্তর উড়ো টেলিফোনের প্রস্তাব বাতিল করে পাথর চিবুনো গুরু-গম্ভীর স্বরে সে বলে উঠল, ধড় থেকে ওই লোকটার মাথাটা ছিঁড়ে আনার ব্যবস্থা করলে কি হয়? সঙ্কল্পবদ্ধ একটা আঙুলের নিশানা জানলার ধারের ওই শূন্য টেবিলটার দিকে।

ডাইরেকট অ্যাকশনের এমন প্রস্তাব কেউ আশা করেনি। সকলেই ভ্যাবা-

ধাক্কা খেয়ে গেল একটু।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবহাওয়ার নাটকীয় পরিবর্তন এক প্রস্থ।

হল-এর ও-প্রান্তের দরজা দিয়ে বিতর্কিত মানুষটির পদার্পণ। ও-দিক থেকে ঢোকার কারণ স্পষ্ট। পিছনে ল্যাভেটরি। ভেজা মুখ রুমালে মুছতে মুছতে ভিতরে ঢুকেছে। গায়ে সেই সাদা কোর্তা। হাতে মোটা ব্যাগ। তাকে দেখা মাত্র বশংবদ বেয়ারাটা সেলাম বাজিয়ে ছুটে এগিয়ে গেছে। আজ দেরি হয়ে গেছে বলেই হয়তো লোকটা অর্থাৎ বড়ুয়া সাহেব সার্ভিং ডেস্কএর সামনে দাঁড়িয়ে বেয়ারাকে অর্ডার পেশ করছে।

সোমেন মিত্তির ঘড়ি দেখলেন। রাত পৌনে ন-টা। ড্রিংক সরবরাহের মেয়াদ রাত সাড়ে ন-টা পর্যন্ত। ঠিক ন-টা পঁনেরয় ম্যানেজার তার ডেস্ক ছেড়ে ও মাথা থেকে এ-মাথায় আসতে আসতে বার কয়েক ঘোষণা করবে, ইটস নাইন ফিফটিন, অর্ডার ইওর লাস্ট ড্রিংক প্লীজ।

যত রাত খুশি বসে খাওয়া চলবে, কিন্তু টেবিলে রসদ মজুদ রাখার শেষ সময় রাত সাড়ে ন-টা।

এক-আধ দিন এমনি দেরি হয়ে গেলে বড়ুয়া সাহেবকে একসঙ্গে পাঁচ ছ-টা গেলাস আর গোটা তিন চার সোডার বোতল টেবিলে সাজিয়ে বসতে দেখা গেছে। রাত হওয়ার দরুন আজও বোধহয় বেয়ারাটাকে সেই রকমই কিছু নির্দেশ দিচ্ছে।

কিন্তু সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে দীপু সরকার যে-কাণ্ডটা করে বসল, দেখে সকলেরই চক্ষু স্থির এবং টেবিলের। নিজের তৃতীয় গেলাসের আধা-আধি সাবাড়। ঘোর কিছু লেগেইছে। বুকের পাটাও দ্বিগুণ হঠাৎ। দূরের সার্ভিং-টেবিল থেকে বড়ুয়াসাহেবকে এদিকে ফেরার আগেই নিজের আধ-খাওয়া গেলাসটা হাতে নিয়ে দীপু সরকার উঠে দাঁড়াল। তারপর জানলার পাশের ওই একক-টেবিলের দিকে এগুলো।

সকলে বিমূঢ় এমন যে কেউ বাধা দেবার অবকাশ পেল না। অর্ডার পেশ করে বড়ুয়া সাহেব এদিকে পা বাড়িয়েছে।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেল আবার। কারণ দীপু সরকার ততক্ষণে গেলাস টেবিলে রেখে চেয়ারটা দখল করে বসেছে।

প্রায় মিনিট খানেক লোকটা দাঁড়িয়েই রইল চুপচাপ। এদিক থেকে জোড়া জোড়া বিস্ফারিত চোখ তার মুখের ওপর। চোখের সামনে টেবিল আর চেয়ার বেদখল হতে দেখে কিছুমাত্র বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ মনে হল না তাকে। বরং কৌতুক

মাখা চোখে সে-ও যেন উপভোগ্য ব্যাপার দেখছে কিছু। কালো-ঘেঁষা মুখখান আরো মিষ্টি লাগছে। ব্যাপার বোঝার চেষ্টায় আশ-পাশের আরো কেউ কেউ ওদের দুজনকেই ফিরে ফিরে দেখছে। পরনে সাদা ঢোলা কোর্তা আর হাতে পেট-মোটা ব্যাগ—জানলার ধারের একক-আসনের ওই বড়ুয়া সাহেবকে আগেও অনেকেই লক্ষ্য করেছে হয়তো।

কিন্তু দীপু সরকার নির্বিকার। গেলাসে একটা ছোট চুমুক দিয়ে সেটা আবার টেবিলে রেখে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে লাগল সে।

পলকা কমনীয় গাম্ভীর্যে বড়ুয়া সাহেব এদিকেই পা বাড়ালো আবার। কিন্তু গতি এত মন্থর এখন যে, ওই ছোট টেবিলে পৌছনোর আগেই পিছনে ট্রে হাতে বয় হাজির। ট্রে-তে পাঁচটি গেলাস পাঁচ পেগ রঙিন রসদ।

এদিক থেকে সকলকে একটু অবাক করে দীপু সরকারের উদ্দেশে চাপা গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল নূপুর ব্যানার্জি,, আঃ, হচ্ছে কি ? উঠে এসো বলছি।

বড়ুয়া সাহেব তখন ওই ছোট টেবিলের তিন গজের মধ্যে। কথাগুলো ঠিক ঠিক কানে না যাক, রমণীর ঘাড় ফেরানো ঝাঁঝালো মুখশ্রী ঠিকই লক্ষ্য করেছে। নূপুরের দিকে সরাসরি চেয়ে অল্প হেসে আর অল্প মাথা নেড়ে যেন আশ্বস্ত করতে চাইল তাকে। নূপুর ব্যানার্জি তাইতেই থতমত খেল একটু। অজ্ঞাতকুলশীল মানুষটার আসল লক্ষ্য এই মেয়েটাই এ-ধারণা এই টেবিলের কারো কারো আরো বদ্ধমূল হল বোধহয়। গায়ে পড়ে ভাব জমানোর চেষ্টার এটাই যেন প্রথম সূচনা।

কোটরগত দু-চোখ বড করে তোলার চেষ্টা দীপু সরকারেরও। বড়ুয়া সাহেব তার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। একটু ঝুঁকে তার পায়ের কাছেই হাতের মোটা ব্যাগটা রাখল, তারপর টান হয়ে দাঁড়াল। পিছনে ট্রে হাতে বয়। তার মুখখানা দেখলে মনে হবে বিপন্ন যেন সে-ই।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে আছে। বড়ুয়া সাহেব আর দীপু সরকার। এ টেবিলের সকলের নিঃশ্বাস রুদ্ধ। চোখে চোখ রেখে বড়ুয়া সাহেব নিঃশব্দে বড করে হাসল হঠাৎ, আর, তারপরেই টুপ করে হাসিটা নিভিয়ে দিয়ে গম্ভীর আবার। দীপু সরকারও অবিকল তাই করল, কিন্তু তার হাসিটা ভেঙচি কাটার মতো মনে হল।

আধখানা ফিবে বড়ুয়া সাহেব স্থাণুমূর্তি বয়ের ট্রে থেকে একটা গেলাস তুলে নিল। গেলাসের রঙিন পদার্থটুকু নির্জলা গলায় ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আপাদ-মস্তকে আপনা থেকেই যেন ঝঙ্কার উঠল একটু। তার পর স্থির আবার।

এবারে দীপু সরকারের পালা। সেও নিজের গেলাস তুলে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তার তিন ভাগ গলায় ঢেলে দিয়ে মুখে একটু চেষ্টাকৃত বিকৃতি ফোটালো। তারপর গেলাস ঠক করে টেবিলে রেখে মুখ তুলে তাকালো। অর্থাৎ পরের মহড়ার জন্য প্রস্তুত সে।

বোবার মতো বসে এ-টেবিলের সকলে নির্বাক প্রহসন দেখছে একটা।

হাতের শূন্য গেলাস বয়ের ট্রেতে রেখে এবারে দু হাতে দুটো নতুন গেলাস তুলে নিল বড়ুয়া সাহেব। বাঁ হাতের গেলাসের জিনিস উপুড় করে দীপু সরকারের গেলাসে ঢেলে দিল। তারপর আগের মতো আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটিয়েই গম্ভীর আবার।

এই বদান্যতার জন্য দীপু সরকার প্রস্তুত ছিল না হয়তো। সামান্য থমকে গেলাসটা তুলে নাকের কাছে ধরল। লম্বা করে ঘ্রাণ নিল। তারপর ভদ্রলোকের দিকে মুখ তুলে খুশি মুখেই তার হাসিটা নকল করতে চেষ্টা করল।

এই অঙ্ক নাটকের সবাক মোচড়। বাঁ হাতের খালি গেলাস টে-তে রেখে ডান হাতের গেলাস দীপু সরকারের মুখের কাছে একটু দুলিয়ে স্পষ্ট বাংলায় বড়ুয়া সাহেব বলল, এটুকুও নির্জলা গলায় ঢেলে দেবার পর আমি যদি আপনাকে তুলে ওই জানলা গলিয়ে নিচে ফেলে দিতে চেষ্টা করি তাহলে দোষ আমার হবে, না এই ড্রিঙ্ক-এর?

ভদ্রলোকের গলার স্বর গুরু-গম্ভীর অথচ মিষ্টি। এ টেবিল থেকেও স্পষ্ট শোনা গেল। আর তার ফলেই যেন ডবল চুপ সকলে।

ওদিকে হতচকিত মুখ দীপু সরকারের। তার নেশা আর মজা দুই-ই উঠে যাওয়ার দাখিল।—বা রে! জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন মানে! মগের মুলুক নাকি—

জবাবে হাতের গেলাস প্রথমবারের মতোই আবার গলায় উপুড় করল লোকটা। তারপর সামান্য ঝংকার তুলে সেটা ট্রে-তে রেখে টান হয়ে দাঁড়াল। ঢোলা কোর্তার বাঁ-হাতের আস্তিন ডান হাতে করে কনুইয়ের ওপর টেনে তুলতে তুলতে বলল, কোন্ মুলুক দেখাই যাক—

—দেখুন মশাই, ইয়ারকির জায়গা নয় এটা—

মুখের কথা শেষ না হতে দীপু সরকার চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর টেবিল থেকে নিজের গেলাস তুলে নিয়ে লোকটাকে এক রকম ঠেলেই এ টেবিলের দিকে ধাওয়া করল। এ দিকের কারো মুখে রা নেই এখনো। সকলেই দেখছে লোকটাকে।···শ্যাম সুশ্রী মুখখানা নিঃশব্দ হাসিতে ভরাট হয়ে গেল।

ঝকঝকে দু'পাটি দাঁতের আভাস দেখা গেল। হাসিটা সুন্দরই বটে। চেয়ারে বসতে বসতে ওই হাসির সঙ্গে সামান্য মাথাও নাড়ল নূপুর ব্যানার্জির দিকে চেয়ে। যেন বলতে চাইল, নিছক মজা ছাড়া আর কিছু নয়, কিছু মনে করো না—

নিজের নিরাপদ আসন দখল করে ঈষৎ উত্তেজনায় দীপু সরকার বলে উঠল, সাহস কত! কি বলল শুনলেন না আপনারা? বলল, আমাকে তুলে জানলা গলিয়ে নীচে ফেলে দেবে!

শুনেছে সকলেই। এখনো চুপ।

চাপা উত্তেজনায় দীপু সরকারও এক লম্বা চুমুকে তার গেলাস খালি করে ঠক করে টেবিলের ওপর রাখল। অর্থাৎ বড়ুয়া সাহেবের দেওয়া জিনিসটুকু প্রায় নির্জলাই জঠরস্থ করল সে। তারপর ঠোঁট আর জিভ দিয়ে চপ-চপ শব্দ বার করল দু-তিনটে। মাথা নীচু করে চাপা গলায় আবার বলল, ব্যাটা খাঁটী স্কচ খায়—ওই পাঁচ ছ' পেগের দামই তো দেড়শ দুশো টাকা। কি ভাবে কত টাকা রোজগার করে কে জানে।

বিদিশা কেন, নিজের পয়সায় ওই বিলিতি দ্রব্যের খদ্দের সর্বত্রই নামমাত্র। বেশির ভাগই দিশির মধ্যে বাছাই চলে—দাম যার বিলি'তর সিকি ভাগও নয়। অতএব দীপু সরকারের বিস্ময়ও নিছক জলীয় কারণে নয়।

··লোকটা এখনো এদিকেই চেয়ে আছে আর মিটিমিটি হাসছে। ওই হাসির ফাঁকে শুধু একজনেরই দাক্ষিণ্য লাভের চেষ্টা যে—এ-চিন্তাটা প্রায় সকলেরই মনে এঁটে বসার দাখিল এখন। শুধু সোমেন মিত্তিরই কিছু ভাবছেন না, লোকটাকে ভালো করে দেখে নিচ্ছেন।

চোখাচোখি হতে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। কারো অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখে ধীরেসুস্থে ওর টেবিলের দিকে এগোলেন।

এই নাটকের জন্যেও প্রস্তুত ছিল না কেউ। ওই টেবিলের বড়ুয়া সাহেবও না। কৌতুক-ছোঁয়া দু চোখ সোমেনবাবুর মুখের ওপর।

তার মুখোমুখি টেবিলের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সোমেন মিত্তির। অভিবাদনের মতো করে সামান্য মাথা নাড়লেন একটু।

জবাবে লোকটিও তাই করল।

হালকা সুরে সোমেনবাবু বললেন, কালও আপনার আগে এসে উপস্থিত হতে পারলে এই চেয়ার আর টেবিল আমার দখলে আসবে ··ওই জানলাটা কত বড় দেখার ইচ্ছে থাকল।

হঠাৎ বোকা-বোকা মুখ করে লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে রইল কয়েক পলক।

তারপর ঘাড় ফিরিয়ে অদূরের বয়ের উদ্দেশে নরম সুবেলা শিস দিল একটু। বয় দৌড়ে এলো।

একটা আঙুল তুলে সামনের দিকটা দেখিয়ে সে হুকুম করল, কাল ওখানে আর একটা চেয়ার দেবে, এই সাহেব বসবেন।

এত বড় পরিবেশে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মানুষ হয়তো সোমেনবাবু একাই। তবু সাহেব বলা হল। বিমূঢ় বয় জো-হুকুম জানিয়ে প্রস্থান করতে লোকটার দু' চোখ আবার তাঁর মুখের ওপর। একটা সখ্যতা সূচক ফয়সালাই হয়ে গেল যেন।

তাঁর চোখের কৌতুক মুখের দিকে ছড়াচ্ছে।

সোমেন মিত্তিরও হাসি মুখেই ফিরলেন আবার।

তাঁর এত দিনের নীরব পর্যবেক্ষণ এই রাতে একটা পরিণামের দিকে গড়ালো যেন।

॥ দুই ॥

পর দিন ছেড়ে পরের সাত দিনের মধ্যেও সোমেন মিত্র বিদিশায় হাজিরা দিতে পারলেন না। সন্ধ্যার স্নানটা বেশ কিছু দিন ধরে বেশি রাতে সারতে হচ্ছিল। সর্দিজ্বরে পড়ে গেলেন। ফলে স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের শাসনে অনিয়মে অভ্যস্ত মানুষটার পায়ে বেড়ি। ফাঁক পেয়ে স্ত্রীর সরব অনুযোগ, রাত দশটা নেই এগারোটা নেই সিনেমার দল নিয়ে পড়েছেন উনি—যে বয়সের যা, অত সইবে কেন?

হেসে ফেলে মায়ের কোপে পড়ার ভয়ে ছেলেমেয়ে এদিক ওদিক সরে যায়। মায়ের সামান্য একটু দুর্বলতার খবর তারাও রাখে। বয়েসের অনুযোগ মিথ্যে নয়। সোমেন মিত্রর বয়েস প্রায় ছাপান্ন এখন। কিন্তু বয়েসের তুলনায় শরীর একটু বেশি মজবুত। সেই কারণেই ভিতরে ভিতরে একটু চাপা অস্বস্তি মহিলার। প্রথম জীবনে অনটনের মধ্যে কাটিয়েছেন। তাই সিনেমার কনট্রাকট থেকে থোক থোক টাকা এলে খুশিই হন। মনের সাধে এখন অনেক রকমের কর্তব্য করে তৃপ্তি পান। কিন্তু স্বামীটিকে ওই সিনেমা-অলাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দেখলে স্বস্তি বোধ করেন না খুব। এই রাজ্যের ছেলেমেয়েদের বাড়িতে এসে হানা দেওয়াটাও পছন্দ করেন না। অনেক দিন বলেছেন, ঘরে বসে লেখা হল গিয়ে কাজ তোমার, বই ছাপা হলে যাদের পছন্দ হবে তারা টাকা দিয়ে ছবির রাইট কিনে নিয়ে যাবে—ফুরিয়ে গেল। ওদের সঙ্গে

অত মাখামাখির দরকার কি তোমার ! এরপর লোকে বলবে সিনেমা-সাহিত্যিক।

স্ত্রীর অনুযোগ একেবারে মিথ্যে না হোক, পুরোপুরি সত্যিও নয়। সত্যি নয় এই কারণে, বাজারে কম করে পঞ্চাশখানার ওপর চালু উপন্যাস আছে সোমেন মিত্রের। বছরের মধ্যে সেগুলোর কোনটার না কোনটার এডিশন হচ্ছেই, আর সব মিলিয়ে এই খাতেও মাস গেলে মোটা রয়্যালটি আসছে। তাছাড়া সাহিত্যিক হিসাবে পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন বলেই এ-যাবৎ অনেক পুরস্কার আর সম্মান পাওয়া হয়ে গেছে। অতএব এরপর কে কি বলবে, না বলবে তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না তিনি।

কিন্তু স্ত্রীর অনুযোগের সত্যের দিকটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না তা বলে। তাঁর ইদানীংকালের লেখায় নাটকের দিকটাই প্রখর হয়ে উঠেছে। ফলে ছবির জন্য তাঁর গল্পের চাহিদাও বেড়েই চলেছে। স্ত্রীর কথা মতো গল্প বেচে টাকা নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারতেন। কিন্তু নিজের লেখার ওপর মায়া আছে বলেই তা পারেন না। তাছাড়া ছবির জগৎটাকেও ভিতরে ভিতরে ভালই বাসেন। ওদের হাতে ছেড়ে দিলে গল্পের গরু গাছে তুলে দেবার ভয়। এই স্বার্থেই চিত্র-নাট্য বা নাটক রচনার ব্যাপারে নিজে থেকে সাহায্যের হাত বাড়ান—মতের অমিল হলে তর্কাতর্কি ঝকাঝকিও করেন। তার সুফলও মেলে। মিলেছে। ছবির বাজারেও জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে তিনি পুরোভাগে। অতএব স্ত্রী যা-বলুন, তাঁর কানে তুলো পিঠে কুলো।

মোহন চৌধুরীর এই নতুন ছবির ব্যাপারে তিনি যে একটু বেশিই জড়িয়ে গেছেন এও সত্যি কথাই। তার কারণও আছে। কেউ দেখে শেখে কেউ ঠেকে শেখে—মোহন চৌধুরী ঠেকে শিখেছে, আর চার বছর বাদে ফিরে আবার তার দোরে এসে ধর্না দিয়েছে।

ভদ্রলোকের বয়েস এখন একচল্লিশ। প্রযোজক হিসেবে পঁয়ত্রিশে ছবির জগতে তার প্রথম আবির্ভাব। লেখাপড়া জানা মানুষ, মগজে বুদ্ধির ধারও কিছু ছিল। সোমেনবাবুর দুটো গল্প নিয়ে পর পর দুটো ছবি করার পরেই মাথা বিগড়ালো ভদ্রলোকের, বুদ্ধির ধার নিজেকেই কাটতে লাগল। প্রথম দুটো ছবিই মোটামুটি হিট, পয়সার গরমে প্রতিভার চমক দেখাবার ঝোঁক চাপল মাথায়। তারিফ করার মতো মোসায়েবও জুটল কিছু। সোমেন মিত্তিরের তৃতীয় গল্পের চিত্রনাট্যের ওপর প্রতিভার এমন স্টীম রোলার চালানো শুরু হল যে লেখকের চক্ষু স্থির। বিতর্ক প্রথমে বিবাদের দিকে গড়ালো, তারপর ছাড়াছাড়ি। সোমেন মিত্তির টাকা ফেরত দিলেন, মোহন চৌধুরী গল্প ফেরত দিল।

নিজের মগজের ওপর নির্ভর করে ভদ্রলোক আরো তিনখানা ছবি করল এরপর। প্রতিভাই পথে বসালো তাকে। তিন ছবিই মার। তৃতীয় আর চতুর্থ ছবিতে প্রথম দুটো ছবির লাভের কড়ি কানা। পঞ্চম ছবিতে একগলা দেনা।

ঠেকে শেখা শেষ। এবারে আবার নতুন করে দু পায়ে দাঁড়ানোর তাগিদ। প্রোডাকশন ম্যানেজার দীপু সরকারকে সঙ্গে করে বাড়ি এসে হাজির এক সকালে। আসন নিয়ে সোমেনবাবুর দুই হাঁটুতে তার দু হাত। চেষ্টা করেও সেই হাত সরানো গেল না।—ঘাট হয়েছে, জীবনের মতো শিক্ষাও হয়েছে। ওমুক গল্পটা তার চাই—চাই-ই চাই। এবারে লেখক যা বলবেন তাই হবে, যেমন বলবেন তেমনি হবে। সবব্যাপারে তাঁর অনুমোদন ভিন্ন কিছু হবে না, কিছুই হবে না।

লেখকের এত কদর দেখে দীপু সরকার অবাক একটু। চতুর্থ ছবির কাল থেকে সে মোহন চৌধুরীর সঙ্গে যুক্ত। তার আগেও নাকি কার একটা বিফল ছবিতে প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছে। বলা বাহুল্য, সোমেন মিত্তির সেই প্রথম দেখলেন তাকে।

ঝোপ বুঝে বিনয়ের কোপ ঝাড়ল সে-ও।—আমারও একই দশা স্যর, তিনটে ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজার—তিন ছবিই মার। মোহনদা বলেছিলেন, আপনি হাল ধরলে ডুবন্ত নৌকোও পাল তুলে ছোটে—এখন আপনি রাখতে হয় রাখুন, কাটতে হয় কাটুন।

হা-ভাতে মূর্তি ছেলেটাকে প্রথম দিনই বেশ চৌকশ মনে হয়েছিল সোমেন-বাবুর। পরে আরো ভালো করে জানার সুযোগ হয়েছে ওকে। দু কান কাটা, চোখেরও পর্দার বালাই নেই। দরকার হলে দিনকে রাত করতে পারে। তবু ছেলেটাকে কেন যে একটু পছন্দই করেন সোমেনবাবু, নিজেও ভালো জানেন না। দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও সহজেই আপনার জন হয়ে ওঠার মতো গুণ আছে একটু। দু-চার দিন আসা যাওয়ার ফাঁকে বউদি বউদি করে স্ত্রীর সঙ্গেও খাতির করে নিয়েছে। বউদির পা দুখানা দেখলেই ওর নাকি প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। কোন্ পুণ্যে দাদার অর্থাৎ সোমেনবাবুর এত আয়পয় সেটা নাকি ও এখন ভালো করেই বুঝতে পারছে। কিন্তু দুঃখ এই দাদা সেটা ভুল করেও বাইরে কখনো ফাঁস করেন না, সব ক্রেডিট একলাই হজম করে বসে থাকেন।

সিনেমাঅলাদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি পছন্দ না হলেও এই ছেলের প্রতি স্ত্রীও বিরূপ নয় খুব। মুখে অবশ্য বলেন পাজির পা-ঝাড়া একটা। কিন্তু বাড়ি

এলে চা-বিস্কুটও এগিয়ে দেন। প্রণাম করার জন্য ঝকাঝকি করতে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বয়েস কত ?

দীপু সরকার বলেছিল, একান্ন—

সন্ত্রস্ত হয়ে, স্ত্রী দুপা সরে দাঁড়িয়েছিলেন, ওমা—তাহলে প্রণাম কি আবার—বয়েসে—

বাধা পেয়ে দীপু সরকার গম্ভীর।—আর যদি বলি একত্রিশ ?

—তাহলে অবশ্য অনেক ছোট।

ঘটা করে বড় নিঃশ্বাস ফেলেছে দীপু সরকার।—তাহলে আমার দুর্দশা বুঝুন বউদি, একত্রিশকে একান্ন বললেও চট করে কেউ অবিশ্বাস করে না—একলার মরুভূমির মধ্যে বাস করা ছাড়া আমার কি আর কিছু উপায় আছে ?

অর্থাৎ এই কারণেই জীবনে ওর দোসর জোটার আশা মরীচিকা।

স্ত্রীর হাসির ফাঁকে ও প্রণাম সেরে নিয়েছে।

মোহন চৌধুরীর নির্ভরতার আতিশয্যে সোমেন মিত্তিরের কাঁধে দায়িত্বের ভার একটু বেশিই চেপেছে। তাঁরই পরামর্শ মতো অল্প টাকায় ভালো কাজ করবে এমন ডাইরেকটর বেছে নিয়েছে। পর পর ক-রাত তার সঙ্গে বসে সোমেনবাবুই চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন। তাদের বাহবার জন্যে নয়, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই সোমেন মিত্তিরের মনে হয়েছে, স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী ঠিক ঠিক করে যেতে পারলে ছবিটা লাগবে। অস্বস্তি যেটুকু ছিল সেটা ভিন্ন কারণে। গল্পের দাম পুরো পেলেও পার্টির এখন টাকার জোর কম সেটা গোড়া থেকেই বোঝা গেছে। স্ক্রিপ্টের টাকাটা পর্যন্ত পরে নেবার চুক্তি তাঁর সঙ্গে। অনেকদিন আছে বলে স্টুডিও ভাড়া থেকে শুরু করে অনেক ব্যাপারেই এই রকম পরে টাকা দেবার চুক্তি মোহন চৌধুরীর সঙ্গে। ছবির কাজ এগোলে ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে টাকার যোগান আসবে এই স্থির বিশ্বাসে চোখ-কান বুজে নেমে পড়েছে ভদ্রলোক।

এই কারণেই দুশ্চিন্তা সোমেন মিত্তিরের। কোন পর্যন্ত এসে ছবি আটকে যাবে বলা যায় না। তবে ভরসার কথা টাকা অলা মানুষ আছে দুজন মোহন চৌধুরীর সঙ্গে। একজন এক সিনেমা হল-এর মালিক—তার বন্ধু। প্রাথমিক মূলধন হিসেবে সেই ভদ্রলোক পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছে মোহন চৌধুরীর হাতে। দ্বিতীয় জন লোহার কারবারের মালিক উপেন হালদার। পঁচাত্তর হাজার টাকা নগদ গুণে দিয়ে সে এ-ছবির পার্টনার হয়েছে। আরো পঁচিশ হাজার দেবে। দীপু সরকার চুপি চুপি সোমেন মিত্তিরকে বলেছে, ওই লোহার

কার্তিককে ঘায়েল করার সমস্ত ক্রেডিট তার।

'লোহার কার্তিক' শব্দটার অর্থ দীপু সরকারের জানা নেই হয়তো। মানে কালো কুৎসিত মানুষ। উপেন হালদারের বয়েস পঁয়ত্রিশ। গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা আর স্বাস্থ্যবান পুরুষটা দেখতে দীপু সরকারের থেকে খারাপ নয় অন্তত। তবে ভালো স্বাস্থ্য এখন মেদের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বটে।

যাই হোক, ছবি কিছুদূর টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো টাকা এদের হাতে আছে। তারপর ব্যক্তি-প্রভাব আর ছবির আনুষঙ্গিক চটকের জোর থাকলে ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে টাকার যোগান আসে এও সত্যি কথাই। মোহন চৌধুরীর ধারণা, এ দুই-ই তার আছে।

তবু শুরুতে হিসেব করেই পা ফেলা হয়েছিল। নায়কের ভূমিকায় একজন নামী শিল্পীকেই বহাল করা হয়েছে। গোল বেধেছিল নায়িকা নির্বাচনের ব্যাপারে। মোহন চৌধুরীর মতে, এ-দেশে নায়িকার দুর্ভিক্ষ এখন। নামী নায়িকার পিছনে ছুটতে গেলে টাকার কাঁড়ি ঢালাই সার হবে। তাদের মধ্যে কারোই যাকে বলে তেমন আর 'ইয়ে' নেই এখন। তার থেকে দর্শকের চোখ মন ভরে দিতে পারে এমন একজন নতুন মেয়ে আনা ঢের ভালো। সন্ধানে সেরকম মেয়ে আছেও একজন—নতুন আবার আনকোরা নতুনও নয় একেবারে। মেয়েটাকে পেলে একটা ভাল পাবলিসিটি স্টাণ্ট হবে দেখবেন—

দীপু সরকার সংশয়ের আঁচড় কাটল, বলে তো দিলেন, নূপুর ব্যানার্জিকে আপনি সিওর পাচ্ছেন কিনা দেখুন আগে—ছবিতে আবার ফিরে আসছে খবর পেয়েই অলরেডি কজনের লাইন পড়ে গেছে কে জানে!

ওদের কাছ থেকেই ভাবি নায়িকার বিবরণ পেলেন সোমেন মিত্তির আর চিনলেনও। বছর নয় আগে খুব একজন নামী ডিরেকটরের ছবিতে এক সর্বস্ব খোয়ানো বিলাসী বুড়োর ফ্রক-পরা নাতনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিল মেয়েটা। নেচে গেয়ে ওই কিশোরী মেয়েটা তার দাদুকে আগলে রাখত সর্বদা। বলতে মনে পড়ল সোমেনবাবুর। সেই ছোট্ট রোলে মেয়েটা সকলের প্রশংসা পেয়েছিল বটে। ন'বছর বাদে সেই মেয়ে কিরকম দাঁড়িয়েছে সেটা অবশ্য ধারণা করা যাচ্ছে না। কারণ এরপর আর কোনো ছবিতে তাকে দেখা যায়নি।…এ-গল্পটা নায়িকা-প্রধান। আর সেই কারণেই লেখকের খুঁতখুঁতুনি।

সেটা বুঝেই মোহন চৌধুরী আশ্বাস দিলেন, কিছু ভাববেন না, আপনার পছন্দ হলে তবে কথা, আপনার পছন্দ না হলে আমি কোনো রিস্ক নেব না, আপনার ডিসিসনই ফাইন্যাল মশাই। বুঝলেন? কিন্তু একবার দেখুন মেয়েটাকে,

লেখা-পড়া জানা বড় ঘরের মেয়ে, চালচলন ভালো, দেখতে শুনতে তো ভালই। তার দিক থেকেও আবার গল্প পছন্দ হওয়া চাই—খুব মন দিয়ে আপনার বই পড়ছে—এগিয়ে এলে তখন ভেবে-চিন্তে দেখা যাবে।

শেষের কথাগুলো সোমেন মিত্তিরের খুব ভালো লাগল না। তাঁর গল্প শুনলে অনেক নামী নায়িকাও চোখ-কান বুজে এগিয়ে আসে। এতদিনে এটুকু সুনাম আর খ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন। ওই বড় ঘরের লেখা-পড়া জানা মেয়ের দেমাক আছে বলতে হবে। ভাবী নায়িকাটি ভালো নাচতে গাইতে পারে শুনেছেন, কিন্তু তাঁর বিবেচনায় এ-গল্পের নায়িকার ওই গুণ দুটি শুধু অনাবশ্যক নয়, চরিত্র-বিচারে অবাঞ্ছিতও। কিন্তু তখনকার মতো সোমেনবাবু এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না।

দিন তিন-চারের মধ্যে মোহন চৌধুরীর গাড়ি আবার তাঁর দোরগোড়ায়। কিন্তু গাড়ি থেকে নামল দীপু সরকার, তার পিছনে একটি মেয়ে। বছর বাইশ তেইশ হবে বয়েস। লম্বা, স্বাস্থ্য ভালো, গায়ের রং খুব পরিষ্কার না হলেও ফর্সাই। মুখখানা মিষ্টি, তার থেকেও মিষ্টি আয়ত কালো চোখের ঠাণ্ডা চাউনি। কে হতে পারে সোমেন মিত্তির দেখেই অনুমান করেছেন। নূপুর ব্যানার্জি। ন' বছর আগে নামী ডিরেকটারের ছবিতে যে কিশোরীর ভূমিকায় একে দেখেছিলেন তার মুখের আদল মনে নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে এই রমণী শ্রী দুচোখ প্রসন্ন হবার মতোই।

সামান্য সংকোচ সত্ত্বেও সপ্রতিভ-হাসি মুখেই। দীপু সরকার সহাস্যে জিজ্ঞাসা করল, কে বুঝতে পারছেন ?

সোমেন মিত্তিরও হাসি মুখেই মাথা নাড়লেন। তিনি বাধা দেবার আগেই নূপুর ব্যানার্জি এগিয়ে এসে নত হয়ে পায়ে হাত রেখে প্রণাম করল।

—বোসো বোসো।

দীপু সরকার জানান দিল, আপনার বই শেষ করেই ট্যাক্সি হাঁকিয়ে টালা থেকে বালিগঞ্জে ছুটে এসেছেন মোহনদার কাছে—ফাইন্যাল ডিসিসনের জন্য তিনি সোজা আপনার এখানে পাঠিয়ে দিলেন। গল্প পড়ার পর ইনি যাকে বলে একেবারে এনেমারড্ হয়ে আছেন।

সপ্রতিভ মুখে নূপুর ব্যানার্জি বলল, মোহনবাবু না পাঠালেও আপনাকে দেখার আর পায়ের ধুলো নেবার জন্য এখানে আসতাম।

গলার আওয়াজও সুপুষ্ট মিষ্টি। মেয়েটি ভাল নাচতে গাইতে জানে। ছবির সেই কিশোরীর নাচ গান সোমেনবাবুর এখন আর মনে নেই। এই মেয়ের ঘরে

আসা নত হয়ে প্রণাম করা বা চেয়ারে গিয়ে বসার ভঙ্গীটুকু দেখে মনে হল বেশ একটা ছন্দই যেন দেহশ্রী জুড়ে আছে, ইচ্ছে করলেই যেন উচ্ছল হতে পারে আবার সংযমের মাধুর্য-ও জানে। সত্যি ভালো লেগেছে সোমেনবাবুর।

জিজ্ঞাসা করলেন, গল্প পছন্দ হয়েছে তাহলে ?

মাথা কাঁধের দিকে হেলিয়ে সায় দিল। বলল, এ-গল্পের নায়িকার রোল আপনারা আমাকে দিতে পারেন বিশ্বাস করতেও ভয় করছে।

সোমেনবাবু হাসতে লাগলেন।—রোল দেবার ব্যাপারে আমি কেউ না, এঁরাই সব—

নূপুর মাথা নাড়ল, মোহনবাবু বলে দিয়েছেন আপনিই সব।

দীপু সরকার মাথা ঝাঁকিয়ে তার কথায় সায় দিল। সোমেনবাবুর প্রতি ইদানিং এদের আনুগত্য বাড়ার আরো একটু কারণ আছে। তাঁর একজন অন্তরঙ্গ আর স্নেহভাজন বন্ধু মোটামুটি চালু ডিস্ট্রিবিউটার। গল্পটা তারও পছন্দের। মোহন চৌধুরীকে নিয়ে সোমেন মিত্তির তার কাছে গেছলেন, সব শুনে সেই ডিস্ট্রিবিউটার বন্ধু ফিরে সোমেনবাবুকেই বলেছেন, উনি সক্রিয়ভাবে এই ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তবেই সে দায়িত্ব নেবার কথা ভাবতে পারে। মোহন চৌধুরী অম্লানবদনে তাকে জানিয়েছে, উনিই এ-ছবির আসল কর্ণধার, ওঁর পরামর্শ ভিন্ন এক পাও এগনো হচ্ছে না।

অতএব সোমেন মিত্তির সদয় থাকলে নির্ভরযোগ্য ডিস্ট্রিবিউটার হাতে পাওয়ার আশা।

দীপু সরকারের মাথা ঝাঁকানি দেখে তিনি হেসেই বললেন, তোমরা আমাকে এভাবে জড়িয়ে ভাল করছ না। নূপুরকে বললেন, তুমি তো ভাল নাচতে গাইতে পারো শুনেছি—

সঙ্গে সঙ্গে দীপু সরকারের দরাজ তারিফ।—শুনেছেন কি, ন'বছর আগের সেই 'ক্ষয়' ছবিতে দেখেননি! গান অবশ্য এখন আর করে না, কিন্তু এখনকার নাচ যদি দেখতেন! গলার স্বরে প্রত্যাশার উদ্দীপনা।—আচ্ছা দাদা, এ-গল্পে ওঁর একটা নাচ কোনরকমে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না!

—ধ্যেৎ! সোমেনবাবু কিছু বলার আগেই নূপুর ব্যানার্জি বলে উঠল, নাচ ঢুকিয়ে এ গল্প মার্ডার করার থেকে আমাকে বাদ দেওয়াই ভালো।

এম এ পাস দীপু সরকারের পছন্দটা ছবির সস্তা চটকের দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু মেয়েটিকে সত্যিকারের বুদ্ধিমতী মনে হল সোমেনবাবুর। হেসে মন্তব্য করলেন, না, এ ছবিতে নাচ আসে না।…আচ্ছা, মোহনবাবুর সঙ্গে কথা-বার্তা

বলে যা হয় ঠিক করা যাবে—

নূপুর ব্যানার্জি উঠল তক্ষুনি, বাধা না মেনে আবার পায়ের ধুলো নিল। বলল, ছবিতে আসব যখন ঠিক করেছি একদিন না একদিন আসবই দাদা···তবে শুরুতে আপনার আশীর্বাদ নিয়ে এই গল্পে নামতে পারলে সত্যিকারের ভাগ্য জানব।···আসলে গল্পটা আমি দুবার পড়া শেষ করেছি কাল রাত্রে···আর তারপর হবে কি হবে না এই আশার মধ্যে পড়ে সমস্ত রাত ভালো ঘুমুতে পারি নি।

এরা বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে সোমেন মিত্তিরের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। হাসির খোঁচা মেরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাহলে লেখা ছেড়ে ছবির রাজ্যে ঢুকলে এখন?

সোমেনবাবু হালকা সুরে পাল্টা অনুযোগ করলেন, সেই রাগেই এক পেয়ালা চা-ও দিলে না ··।

—আপ্যায়নের ইচ্ছে থাকলে বললে না কেন!···তোমার এ-গল্পে বাপু ওই আদুরে মুখ মানাবে না বলে দিলাম।

মায়ের ভয়ে মেয়ে ঘরে ঢুকতে সাহস করল না। ও-ঘর থেকেই জানান দিল, ভালো মানাবে বাবা—

মুখ ঝামটা দিয়ে স্ত্রীটি ও-ঘরের দিকে তাকালেন। সোমেনবাবু হাসতে লাগলেন।

ভিতরে ভিতরে একটু ভাবছেন তিনিও। স্ত্রীর মন্তব্য একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। এ গল্পের নায়িকার মুখ আরো একটু সংযত কঠিন হলে ভালো হত। এই চরিত্রে ঘা-পোড় খাওয়া মেয়ের নরম দিকটা উবেই গেছে প্রায়। কিন্তু গৃহিণীর উক্তির সবটাই ঠিক তাও বলা যায় না। মেয়েটির কমনীয় মুখের চাউনিটা বেশ স্বচ্ছ অথচ ঠাণ্ডা। ভালো মতো তালিম পেলে হবে না এমন নয়। তবু সোমেন মিত্তির ভাবনার আরো একটু কারণ আছে। ডিস্ট্রিবিউটার বন্ধুর আশ্বাস পেয়ে কোনো নামী নায়িকাকে আনার প্রস্তাবটাও মনে এসেছিল তাঁর।

কিন্তু মোহন চৌধুরীর ইউনিটের সঙ্গে দেখা হতে সে রকম কিছু বলাই গেল না আর। দীপু সরকারের উচ্ছ্বাসের ফলে তারা ধরেই নিয়েছে লেখকের নায়িকা পছন্দ হয়েছে। সেদিন ঘর থেকে বেরুবার আগে উদ্‌গ্রীব মুখে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন দেখলেন দাদা?

সোমেন মিত্তির হেসে বলেছিলেন, ভালই তো···।

সেই ভালোটা সকলের কাছে কত গুণ ফাঁপিয়েছে যে, বলা যায় না। এদিকে

মোহন চৌধুরী আর উপেন হালদার ছেড়ে অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান অজিত শাসমলও সার্টিফিকেটে দিয়েছে, চমৎকার নায়িকা হয়েছে, দর্শক যা চায় তার সব কিছুই নাকি ফোটোগ্রাফিতে চমৎকার আসবে—আর চোখের এক্সপ্রেশনের তো কথাই নেই। নূপুর ব্যানার্জির নানা ভঙ্গীর কয়েকটা ছবিও ফেলে দেওয়া হল তাঁর সামনে'।

অগত্যা শেষ খুঁতখুঁতুনিটুকুও বাতিল করতে হল লেখককে।

মহা সমারোহে ছবির মহরৎ হয়ে গেল। দু দফায় পাঁচ দিনের শুটিংও শেষ পরের এক মাসের মধ্যে। বিদিশার আসরে বসে মোহন চৌধুরী অল্প অল্প হাসে আর একটু একটু দোলে আর বলে, আপনার নায়িকা চমৎকার মশাই।

সহযোগী প্রযোজক উপেন হালদার মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তারও পরিতুষ্ট চাউনি নায়িকার মুখের ওপর উছলে ওঠে যেন। দীপু সরকার আনন্দে মৃদু মৃদু টেবিল চাপড়ায় আর নূপুর ব্যানার্জির মুখখানা সরাসরিই চেয়ে দেখে। সোমেন মিত্তিরের এখানকার এই সান্ধ্য আসর খুব যে পছন্দ তা নয়। কিন্তু ছবির রাজ্যের এই রীতি জানা আছে তাঁর। এসব জায়গায় এসে না বসলে এদের অনেকের মাথা খোলে না, আলোচনাও জমে না। গোড়াতেই লেখককে শুনিয়ে রেখেছে মোহন চৌধুরী অবকাশ বিনোদনের এ খরচা দুই প্রযোজকের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আসছে। আলোচনার প্রয়োজনে নায়িকাকে প্রায়ই ধরে আনা হয়, নায়কের দর্শন মেলে এক-একদিন। তবে নতুন নায়িকার জড়তা কাটানোটাই বেশি দরকার মনে করে তারা। আর সোমেন মিত্তির না আসতে চাইলে এখান থেকেই টেলিফোনে জোর তলব যায় বাড়িতে। তাছাড়া বাড়তি কিছু দায়িত্ব যখন নিতেই চলেছেন, দেখাশুনা আলাপ আলোচনা হওয়া একটু দরকারও। সেকারণে স্টুডিওতে আসা যাওয়াটা আরো খারাপ লাগে।

কিন্তু আসর জমে উঠলে অর্থাৎ জলীয় পদার্থের মাত্রা বাড়তে থাকলে আলোচনা খুব এগোয় না। শুরু থেকে অর্থাৎ এই গত দু' মাসের মধ্যে খোদ প্রযোজক দুটিরই আচরণে বেশ একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন তিনি। বলাবাহুল্য সে আচরণের সবটাই নূপুর ব্যানার্জিকে কেন্দ্র করে। ছবি করাটাই যেন শেষ কথা নয় এদের। নায়িকাকে নিয়ে একটু যেন চাপা রেষারেষি শুরু হয়েছে দুজনার। এ লাইনে এই চরিত্রের মানুষও দেখা আছে সোমেনবাবুর, আর স্বতঃসিদ্ধ পরিণামও জানা আছে। দায়িত্বের ঝুঁকি নেবার মুখে এই কারণেই চিন্তিত তিনি।

এই ব্যাপারে নূপুর ব্যানার্জিকে আভাসে একটু সমঝে দেবার ইচ্ছে থাকলেও

পেরে উঠছেন না। মেয়েটাকে এখনো সত্যিই ভালো লাগে তাঁর। এই ছবি ধ্যান-জ্ঞান। ফাঁক পেলে সে-ই শুধু সোমেনবাবুর সঙ্গে অভিনয়ের প্রসঙ্গে আলোচনা জুড়ে দেয়। পরামর্শ চায়। তাঁর প্রতি একটু কৃতজ্ঞও বটে মেয়েটা। তাছাড়া বলবেনই বা কি, লেখাপড়া জানা বড ঘরের মেয়ে, চেহারা-পত্র ভালো, পুরুষের এই নির্লজ্জ স্তুতির দিকটা ভালই জানে। তার সুবিধে ছাড়া অসুবিধে কি। আর, এ লাইনে এলে রাতের এই গোছের জমাট আসরের পরিবেশে অভ্যস্ত হতেও সময় লাগে না খুব।

তবু হালকা ঠেসের সুরে বাড়িতে একদিন দীপু সরকারকেই বলেছিলেন কথাটা।—তোমার প্রোডিউসার দুটির তো দেখি ছবির থেকে নায়িকাকে নিয়েই উৎসাহ বেশি—

ভেবেছিলেন, তড়বড় করে দীপু সরকার পাঁচটা বাজে কথা তুলে প্রসঙ্গ চাপা দিতে চেষ্টা করবে। তার বদলে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসেছে।—আপনি লক্ষ্য করেছেন! পায়ের ধুলো দিন দাদা—এই না হলে এতবড লেখক এমনি হয়।

সোমেন মিত্র বলেছেন, এ রকম হলে আমার পক্ষে একটু অসুবিধে, ডিস্ট্রিবিউটার আমার ওপর কিছুটা নির্ভর করছে, জানই তো। ছবি মনের মতো না হলে তার ওপর জোর করা কঠিন হবে।

ভেবেছিলেন, কথাগুলো দীপু সরকারেরও পছন্দ হবে না, আর তার মারফৎ ওই দুই প্রোডিউসারের কানে উঠবে। কিন্তু তার বদলে সাগ্রহে সামনে ঝুঁকেছে ও।—আপনি ওঁদের একটু সমঝে দিন না দাদা, আর নূপুরকেও একটু বলে দিন। বেলেল্লাপনা মনে হলে কেন এসবের মধ্যে থাকতে যাবেন! একথা শুনলে সকলের টনক নড়বে আমাকে বলে কি হবে, প্রোডাকশন ম্যানেজার বলুন আর যাই বলুন, পেয়ারের চাকর ছাড়া আর কেউ কিছু ভাবে না। আর হিরোইনরা তো আমাদের মানুষ বলেই গণ্য করে না।

ঈর্ষা এই ছেলেটাকেও তলায় তলায় কাটছে কিনা সোমেনবাবু ঠাওর করে উঠতে পারেন নি।

জ্বরের দরুন বিদিশার সান্ধ্য আসরে পর পর তিনদিন অনুপস্থিত। দীপু সরকার তাই বাড়িতে দেখতে এসেছে তাকে। বলেছে, তাড়াতাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠুন দাদা, এই কাজের সময় আপনি বিছানায় পড়ে থাকলে চলে। মোহনদা দেখতে পাঠালেন, আপনার নায়িকাও খুব চিন্তিত। তাছাড়া কদিন আপনাকে না দেখে মিস্টার আউল দি ফিলসফারের চোখ আমাদের টেবিল থেকে আর নড়ছেই না বলতে গেলে। তবে গত সন্ধ্যায় আপনাদের হিরোইনটি

আসেন নি বলে তার আর অতটা ইনটারেস্ট ছিল না অবশ্য—

যাবার আগে দীপু সরকার জানান দিয়ে গেল, সেইদিনই সন্ধ্যায় গাড়িতে জামসেদপুরের এক জায়গায় লোকেশন শুটিং-এর সাইট দেখতে যাচ্ছে মোহন চৌধুরীর সঙ্গে। দুদিন বাদে ফিরে এসে আবার দাদার শরীরের খবর নেবে।

কিন্তু দিন-তিনেক পরের সকালে এসে শরীরের খবর নিতে সে ভুলেই গেল। অবশ্য মোটামুটি ভালই আছেন সোমেনবাবু। দীপু সরকারের বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর, সাইট দেখা হল ?

শুকনো জবাব এলো, হ্যাঁ, কাল সকালেই ফিরেছি। কিন্তু খবর ভালো নয় সাব।

বেশি সিরিয়াস বা বেশি প্রগল্‌ভ না হলে দীপু সরকার 'সাব' বলে না। এখন সিরিয়াস।

সোমেন মিত্তির জিজ্ঞাসু নেত্রে লক্ষ্য করলেন একটু।—কি ব্যাপার ?

—উপেন হালদারের নিরেট মাথায় কি ঢুকেছে কে জানে। মোহনদার ওপরে অনেক দিন ধরে তেতে আছে দেখছেন তো—কাল জামসেদপুর থেকে ফেরার পর জোর খটাখটি লেগে গেল।

—কেন ?

—কেমন করে যেন জানতে পেরেছে নূপুর ব্যানার্জিও গেছল আমাদের সঙ্গে। আসলে সেই রাগ। মুখের ওপর যাচ্ছেতাই বলে দিলে মোহনদাকে, অযথা টাকা ওড়ানো হচ্ছে কিনা সেই সন্দেহে খাতাপত্র দেখতে চাইলে। মোহনদা জাত প্রোডিউসার, এতটা বরদাস্ত করার পাত্র নন—তিনিও দুকথা শোনালেন।

শুনে সোমেন মিত্র হতভম্ব, বিরক্তও।

—এই করলে আর ছবি হয়েছে। তোমরা গেলে শুটিং-এর সাইট দেখতে, নূপুরের যাওয়ার দরকার হল কেন ?

দীপু সরকার ঠাণ্ডা জবাব দিল, মোহনদা প্রস্তাব করলেন, উনিও বেড়াবার শখে চলে গেলেন—

—নূপুরের বাবা মা, মানে বাড়িতে গার্জেন কেউ নেই ?

—সবাই আছেন। এ লাইনের দস্তুর তো জানেন দাদা, গোড়ায় গোড়ায় একটু-আধটু প্রোডিউসারের মন রেখে চলতেই হয়। সামনে ঝুঁকল একটু।—আপনাকে আপনার জন ভাবি বলেই বলছি, কাউকে বলবেন না যেন—একচল্লিশ

গড়িয়ে চলল মোহনদার বয়েস, কিন্তু এসব রস ভদ্রলোকের দিনে দিনে বাড়ছেই যেন···আমি সঙ্গে না থাকলে বা সন্ধ্যের পর ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে মদে ডুবিয়ে না রাখলে ভদ্রমহিলাকে একটু মুশকিলেই পডতে হত বোধ হয়—ইউনিটের সঙ্গে ছাড়া আর তিনি এভাবে বেড়াতে বেরুবেন বলে মনে হয় না।

ভিতরটা এত তিক্ত হয়ে গেল সোমেনবাবুর যে এ নিয়ে আর কথা বাড়ানোর রুচি থাকল না।

পরদিন একে একে দুই প্রযোজকেরই পদার্পণ ঘটল তাঁর বাড়িতে। প্রথম ঝকমকে গাড়ি হাঁকিয়ে এলো উপেন হালদার। তার বক্তব্য মোহন চৌধুরী ছবির টাকা অন্ধভাবে ওড়াচ্ছে, তাকে বিশ্বাস করা এখনই অসম্ভব হয়ে উঠছে, পরে আরো তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এখন লেখক যদি তাঁর বন্ধু ডিস্ট্রিবিউটারের সঙ্গে পাকা ব্যবস্থা করেন তাহলে পার্টনারশিপ ব্রেক করে একাই সে ছবি আধা-আধি টেনে নিয়ে যাবার হিম্মৎ রাখে।

সোমেনবাবু তাকে জানালেন, সেটা সম্ভব নয়, কারণ গল্প মোহন চৌধুরীর একার নামে কেনা—ফয়েসলা তাঁর সঙ্গেই করতে হবে। আর এও জানিয়ে দিলেন কোনো গোলযোগের মধ্যে তাঁর থাকার ইচ্ছে নেই।

সে বিদায় হবার আধ ঘণ্টার মধ্যে মোহন চৌধুরীর গাড়ি বাড়ির দরজায়। উপেন হালদারের মতো অত মাথা গরম নয় এই মানুষের। তার থেকে বুদ্ধিও বেশি ধরে। চালচলনেও আভিজাত্যের ভাব আছে। তা হলেও সোমেন মিত্তিরের চাপা রাগ এর ওপরেই বেশি। এই ভদ্রলোকের ওপর নির্ভর করেই অনেক সময় নষ্ট করেছেন, অনেকখানি এগিয়েছেন।

মোহন চৌধুরীর আগমনের উদ্দেশ্যও অনেকটা একই। তারও বক্তব্য, লোহার কারবারির সঙ্গে জোট বাঁধাটাই ভুল হয়েছে। যাই হোক, গল্প তার নামে কেনা আর তার কোম্পানীর নামেই ছবির কাজ এগোচ্ছে। এখনো তার নিজস্ব কিছু সংগতি আছে, এখন লেখকের সেই বন্ধু ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে আরো একটু ভরসা পেলে পার্টনারশিপ নাকচ করার কথাই ভাবছে সে।

সোমেন মিত্তির বললেন, খানিক আগে উপেন হালদারও এই একই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন।

শুনে কৌতুক বোধ করল যেন ভদ্রলোক।—ওই লোহার মাথার মগজের জোরে ছবি শেষ করবে!

সোমেনবাবু রসিকতার ধার দিয়েও গেলেন না। সাফসুফ বলে দিলেন, আপনারা নিজেদের মধ্যে যদি মিট-মাট করে নিতে না পারেন, এ ছবি আর বেশি

দব এগোবে বলে আমার মনে হয় না। সে চেষ্টাই দেখুন, নয় তো আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি, আর পারবো না।

আহত মনোভাব নিয়ে প্রস্থান করল মোহন চৌধুরীও।

এর তিন দিন বাদে দীপু সরকার এসে ঝুলোঝুলি—সন্ধ্যার পরে বিদিশায় হাজিরা দিতেই হবে আজ। মিটমাটের আশায় অনেক কষ্টে আজ ওখানে আসর বসানোর ব্যবস্থা করা গেছে। যে যার মন পরিষ্কার করে নেবার এই এক সুযোগ। এর মধ্যে লেখক উপস্থিত না থাকলে মিটমাটের কোনো আশাই নেই।

সন্ধ্যায় সোমেন মিত্তিরের দরকারি কাজ ছিল কিছু। বললেন, যেতে পারি, কিন্তু আমার দেরি হবে একটু।

দীপু সরকার বলল, দেরি হলেও আসুন—অবশ্য আসুন।

সুরার প্রতিক্রিয়ার প্রগল্‌ভ দিলদরিয়া রূপটা অনেক দেখা আছে সোমেন মিত্তিরের। কিন্তু এর বিপরীত রূপটা জানা থাকলেও এমন ভাব কখনও দেখেন নি।

তিনি হাজিরা দিয়েছেন রাত প্রায় ন'টায়। ভিতরে পা দিয়েই জানালার ধারের একক আসনের মানুষটাকে অর্থাৎ বড়ুয়া সাহেবকে যথাস্থানে সমাসীন দেখেছেন। সামনের সারি সারি গেলাসের তিনটে খালি, একটার সদ্ব্যবহার চলছে, এবং আরো দুটো মজুত। পরনে সেই সাদা ঢোলা কোর্তা, পাশে মাটিতে সেই মোটা ব্যাগ। কৌতুকমাখা নিবিষ্ট দৃষ্টি এদিকের অর্থাৎ মোহনবাবুদের টেবিলে। ওখান থেকেও কিছু উপভোগের রসদও মিলছে যেন। সোমেনবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে পরিচিতের মতোই সামান্য মাথা নেড়ে অভ্যর্থনা জানালো। ভাবখানা, এতদিনে আবার দেখা হল তাহলে।

সোমেন মিত্তির আজ আর কেন যেন তেমন পাত্তা দিতে চাইলেন না লোকটিকে। সামান্য মাথা নেড়ে নিজেদের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বয়কে ডেকে দীপু সরকার তাঁর জন্য সফ্‌ট ড্রিংক-এর অর্ডার দিল। নূপুর ব্যানার্জির পাশের চেয়ারটা হয়তো তাঁর জন্যই খালি রাখা হয়েছে। সোমেনবাবুকে দেখে মেয়েটার মুখে যেন আশার ছোঁয়া লাগল একটু। কিন্তু সোমেনবাবু তাকেও এক-রকম উপেক্ষা করেই চেয়ার টেনে নিলেন। ভিতরে ভিতরে এখন বিরূপ এর উপরেও। তাছাড়া আজ ঠিক প্রগল্‌ভ অবকাশ বিনোদনের সমাবেশ নয় এটা। সেই কারণেই আজ অন্তত দলটাকে ছোট করা উচিত ছিল। কিন্তু এক মঞ্জু দত্ত ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত আজও।

আসন নেবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সোমেন মিত্তির অনুভব করলেন

ব্যাপার সুবিধের নয়। আসরের বাতাস থমথমে। পানেরও কিছু মাত্রাধিক্য ঘটেছে মনে হয়। মোহন চৌধুরী একটু বেশি দুলছে কিন্তু মুখ গম্ভীর। উপেন হালদার পাঁচ আঙুলে যে-ভাবে তার গেলাস চেপে বসে আছে তাইতেই তার ভিতরের আঁচ বোঝা যায়। নাকের ডগা লাল। ক্যামেরাম্যান অজিত শাসমল আর মিউজিক ডাইরেকটার নিশীথ কর যেন তাদের উপস্থিতির কারণেই ম্রিয়মাণ। দীপু সরকারের কোটরের ঘোলাটে চোখে হালছাড়া ভাব। শুধু নূপুরের মুখখানাই দ্বিতীয়বার আর লক্ষ্য করলেন না সোমেনবাবু।

বললেন, কি ব্যাপার, সব এত চুপচাপ যে ?

নড়েচড়ে ঠোঁটে একটু হাসি মাখাতে চেষ্টা করল মোহন চৌধুরী। বলল, আর পারা গেল না মশাই, ছবি ছেড়ে এখন হিসেবের জাল তৈরির ব্যাপারটা বড় হয়ে উঠছে—

দেড় হাত ফারাক থেকে উপেন হালদার ফোঁস করে উঠল, আপনি একেবারে মন-প্রাণ ঢেলে ছবি করছেন—কেমন ?

সচকিত সোমেন মিত্তির পাশের দিকে ঘাড় ফেরালেন একটু। ও-ধারের বড়ুয়াসাহেবের সজাগ চোখ আর কান এখনো এই বড় টেবিলের দিকে; বিব্রত সোমেন মিত্তির আবেদন জানালেন, আস্তে !

সে-কথায় কান না দিয়ে মোহন চৌধুরীর দু চোখ উপেন হালদারের মুখের ওপর টান হল। টেনে টেনে জবাব দিল, আমি ছবিই করছি, আপনি বরং এ-সব ছেড়ে ঝাঁকায় করে লোহা ফেরি করুনগে যান—

চেয়ার ঘুরিয়ে তার দিকে ফিরল উপেন হালদার। নেশায় আগুন ধরল বুঝি।—লজ্জা করে না মুখ নেড়ে কথা বলতে ? কাণ্ড ভেঙে হিরোইনকে নিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন—তাকে হীরের দুল প্রেজেণ্ট করেছেন, বেনারসী প্রেজেণ্ট করেছেন—এ-সব আমার জানতে বাকি ? উনি ছবি করছেন—

—শাট আপ !

—ইউ শাট আপ !

—স্টুপিড !

ঝটকা মেরে উঠতে গিয়ে উপেন হালদারের মাজার ধাক্কায় টেবিলের দু তিনটে গেলাস উল্টে গেল। ওদিকে মোহন চৌধুরীও প্রায় নিজের অগোচরে ভারী দেহটা আধখানা টেনে তুলেছে চেয়ার থেকে। ঠিক তখনই এক হাতে তার গলা চেপে ধরল উপেন হালদার, অন্য হাত নাক-মুখ বেড়িয়ে বিপুল ওজনের ঘুঁষি একখানা।—স্কাউণ্ড্রেল !

একটা কাচের গেলাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল মোহন চৌধুরী। কিন্তু গলায় হাত পড়ার সময় উপেন হালদারের জামার বুকের কাছটা মুঠো করে ধরতে পেরেছিল সে। সেই আকর্ষণে টাল রাখতে না পেরে সেও টেবিলের ওপরেই আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের দুটো সোডার বোতল, আর জলের বড় জাগটা মাটিতে পড়ে চূর্ণ-চূর্ণ। সামাল দেবার চেষ্টায় উঠে পড়েছে দীপু সরকার, অজিত শাসমল আর নিশীথ কর। কিন্তু পানের মাত্রাধিক্য আর পরিস্থিতির কারণে তারাও বেসামাল। তাদের হাতের ধাক্কায় আরো দুটো গেলাস আর দুটো বোতল মাটিতে পড়ে ভাঙল।

এক মিনিট দেড় মিনিটের মধ্যে এই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

এতবড় হল-এর সকলের চোখ এখন এই টেবিলে। কেউ কেউ চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে। বয়গুলো দৌড়ে এসেছে। ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারও দ্রুত দুর্যোগ ক্ষেত্রে হাজির।

উপেন হালদার নিজেও দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণে দীপু সরকার আর অজিত শাসমল মোহন চৌধুরীকে টেনে তুলেছে। গেলাসের কাচে তার কপাল কেটে রক্তাক্ত। ঘুষিটা পড়েছে নাকের পাশের হাড়ের ওপর। সে জায়গাটা মারবেলের মতো ফুলে উঠেছে। ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে।

টেনে তোলা হতে মোহন চৌধুরী দু-চোখ টান করে তার শত্রুর দিকেই তাকালো প্রথম। লম্বা দম নিয়ে বলল, সোয়াইন!

উপেন হালদার আবার মাথার ওপর হাত উঁচালো। কিন্তু থাবা নেমে আসার আগে পাশ থেকে এবার সেটা ধরে ফেললেন সোমেন মিত্তির। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, বসুন চুপ করে!

বয়ের দল আর ম্যানেজার ছেড়ে এখন অনেক খদ্দেরও রণ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত। ম্যানেজারটি কেবল বলছে, ভেরি ব্যাড—ভেরি ব্যাড!

—ইয়েস, ভেরি ভেরি ব্যাড। নাও জেন্টলম্যান, কোয়ায়েটলি টু ইওর প্লেসেস প্লীজ—হি নিডস্ সাম অ্যাটেনশান।

সকলে সচকিত হয়ে দেখল, বক্তা জানলার ধারের একক আসনের ঢোলা কোর্তা-পরা লোকটি। গলার ভারী স্বরে হুকুমের আমেজ। সকলকে যার যার জায়গায় চলে যেতে বলছে। 'হি' অর্থাৎ আহত লোকটার শুশ্রূষা দরকার বলছে।

তিন চারজন বয় আর ম্যানেজার ছাড়া আর সকলে সরে গেল। হাত ধরে বড়ুয়া সাহেব মোহন চৌধুরীকে একটা চেয়ারে টেনে বসালো।··· বি কোয়ায়েট

এণ্ড লেট মি সী।

চুলে হাত দিয়ে মাথাটা পিছন দিকে ঠেলে ধরল মোহন চৌধুরীর। ঝুঁকে ক্ষত জায়গাটা দেখল।—জাস্ট এ মিনিট—

লম্বা পা ফেলে নিজের জায়গা থেকে পেট মোটা ব্যাগটা নিয়ে এলো। এই টেবিলের ওপর রেখে সেটা খুলে ফেলল। মস্ত ব্যাগটার ভিতরে অনেক রকমের ওষুধের শিশি, যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম ইনজেকশনের বাক্স, ব্লাড প্রেসার মাপার ছোট যন্ত্র, আরো কত কি।

সকলে নির্বাক দাঁড়িয়ে দেখছে। খানিকটা তুলো ছিঁড়ে একটা শিশির আরকে ভিজিয়ে পাকা হাতের তৎপর মনোযোগে কপালের ক্ষত স্থান পরিষ্কার করল। তারপর একটা সরু টর্চ বার করে কপালের ওপর জেলে ঝুঁকে দেখতে লাগল। সেটা রেখে আরক-ভেজানো তুলো দিয়ে নাকের পাশটা আর কাটা ঠোঁটও পরিষ্কার করে দিল। শেষে কপালে শাদা-মতো ওষুধের গুঁড়ো ছিটিয়ে তার ওপর লিউকো-প্লাস্ট এঁটে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে তাকালো একবার। মৃদুগম্ভীর গলায় বলল, আমার মতে এরপর একটা এ-টি-এস নিয়ে নেওয়া ভালো।

ব্যাগটা গোছাতে গোছাতে ক্রুদ্ধ-বদন ম্যানেজারের দিকে চেয়ে বলল, নাও ইউ মে গেট্ ইওর লস্ কভারড্ অ্যাণ্ড লেট্ দেম গো টু হেল!

ব্যাগ হাতে সামনে পা বাড়িয়েই থামল আবার। নূপুর ব্যানার্জির মুখোমুখি। সোমেন মিত্তির দেখছেন। নিঃশব্দে একটা ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণু ঝাপটা এসে লাগল যেন মেয়েটার মুখের ওপর। বেচারী তাইতেই ভ্যাবাচ্যাকা।

লম্বা পা ফেলে নিজের টেবিলে ফিরে গিয়ে ব্যাগ মাটিতে রেখে বসল।

এবারে সকলের খেয়াল হল, উপেন হালদারের চেয়ার খালি। অর্থাৎ এই ফাঁকে কখন উঠে পিছনের দরজা দিয়ে চলে গেছে সে। জায়গা পরিষ্কার করার জন্য আরো দুটো লোক এই টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ম্যানেজার তার পাওনা বুঝে নিয়ে প্রস্থান করল। বাকি কজনের বিদায়ের অপেক্ষায় বেয়ারা ক'টা এবং ঝাড়ুদার দাঁড়িয়ে। দীপু সরকার আর অজিত শাসমল মোহন চৌধুরীকে দু'দিক থেকে ধরে নিয়ে এগিয়ে চলল। তাদের পিছনে নিশীথ কর। নূপুর ব্যানার্জী দু'পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল! সোমেন মিত্তিরই শুধু দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতে তিনি ইশারায় চলে যেতেই বললেন তাকে।

কিন্তু ফেরার আগে নূপুরের দুচোখ যেন আপনা থেকেই জানলার ধারের

টেবিলের ওই মানুষটার মুখের ওপর ধাক্কা খেল আবার। সোমেন মিত্তিরও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। চিরে চিরে দেখার মতো করে নূপুরের দিকেই চেয়ে আছে লোকটা। চাউনি তীক্ষ্ণ রূঢ়।

ঘাবড়ে গিয়েই নূপুর ব্যানার্জি তাড়াতাড়ি ঘুরে দরজার দিকে চলল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সকলেই চোখের আড়ালে।

সোমেন মিত্তির তখনো ওই লোকের দিকেই চেয়ে আছেন। বড়ুয়া সাহেবও দেখল তাঁকে। তারপর একটু একটু করে যেন মেজাজে ফিরতে লাগল। কৌতুক মাখা চাউনিতে ঈষৎ আপ্যায়নের আভাস।

বাঁ-হাতে একটা চেয়ার টেনে সোমেনবাবু সেদিকে এগোলেন।

॥ তিন ॥

—আপনি তাহলে ডাক্তার?

—ইয়েস সার, এ লোকিং সার্জন, ডক্টর এল বড়ুয়া—লোকানন্দ বড়ুয়া। তিনি এসে বসাতে এতক্ষণের অপ্রিয় ব্যাপারটার ওপর যেন এক ঝলক খুশীর আলো পড়ল। চটপট চারটে খালি গেলাস আর দুটো খালি সোডার বোতল সোমেনবাবুর সামনে থেকে তুলে একপাশে মাটিতে রাখল। সেগুলো তুলে নেবার জন্য বয় ছুটে এলো। টেবিলে এখন দুটো গেলাস, একটাতে রসদ মজুত, অন্যটা হাতে। মুখের দিকে চেয়ে হাসছে অল্প অল্প।—হাউ ডু ইউ লাইক মাই নেম সার?

সোমেন বাবু জবাব দিলেন, বেশ নতুন গোছের—

হাতের গেলাস মুখের কাছে তুলেও সামনে রাখল আবার। চাউনিটা উৎফুল্ল।—ভেরি ফানি। কেবল ছুরিং চালিয়ে গেলাম, জীবনে কোনো লোককে কোনদিন এক ফোঁটা আনন্দ দিলাম না—বাট আই অ্যাম লোকানন্দ।

এবারে গেলাস তুলে এই মজাটাই যেন জঠরস্থ করে নিল ভদ্রলোক। সোমেনবাবুর কেমন মনে হল, সকৌতুকে যে ছুরি চালানোর কথা বলল সেটা কেবল ডাক্তারের অপারেশনের হাতের ছুরিই নয়। এই লোকের প্রতি কেন এতদিন ধরে এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করেছেন, আজ মুখোমুখি বসে সেটুকুই বুঝে নেবার চেষ্টা সোমেনবাবুর। হেসেই বললেন, অনেক দিন ধরে আপনাকে দেখছি, আলাপ করারও ইচ্ছে—আজ এরকম একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার থেকেই সুযোগটা হয়ে গেল।

—কেন, আট দশ দিন আগেই তো আপনি এ টেবিলে বসবেন বলে শাসিয়ে

গেছলেন—স্ট্রেঞ্জ, সেদিনই প্রথম আপনাকে একটু ভালো লেগেছিল—আসেননি কেন ?

—অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম দিনকতক। হাসলেন, আপনি ডাক্তার জানলে আলাপের ইচ্ছেয় আপনাকেই হয়তো খবর পাঠাতাম।···আপনি বড়ুয়া বলতে কোথাকার বড়ুয়া ?

—চাটগাঁয়ের। নট ফ্রম আসাম—

—তার মানে বৌদ্ধ ?

—খবর রাখেন দেখছি। চাটগাঁয়ের বড়ুয়ারা বৌদ্ধই বটে। কিন্তু আমি সবরকম ধর্মের আর সব-রকম অধর্মের একটা ইনস্টিটিউশন—সামটাইমস আই কেয়ার ফর এভরিথিং, সামটাইমস আই কেয়ার ফর নাথিং। যাক, আপনার পরিচয় বলুন—আপনি তো লেখক একজন ?

—আপনি জানলেন কি করে ?

—আই কুড্ গেস্—দে টক্ অ্যালাউড অ্যাণ্ড দে থিংক অ্যালাউড—আই মীন আপনার ওই সিনেমার দলটি।···কি নাম বলুন।

—সোমেন্দ্র মিত্র। সকলে সোমেন মিত্তির বলে।

—সকলে বলে মানে·· ইউ আর ভেরি পপুলার ?

সোমেনবাবু আশা করেছিলেন নাম বললে এও চিনবে কারণ বড ডাক্তারদের মধ্যেও তাঁর ভক্ত পাঠক কিছু আছে। বোঝা গেল এ লোক সাহিত্যের কোনো খবর রাখে না। জবাব না দিয়ে হাসলেন শুধু।

লোকানন্দ বড়ুযা পঞ্চম গেলাস শেষ করে সেটা সরিযে রেখে শেষ গেলাসটা হাতের কাছে টেনে নিল। তাতে সোডা ঢালতে ঢালতে বলল, আপনি নির্জলা বসে থাকলে গল্প করা শক্ত—একটা সফ্ট্ ড্রিংক দিতে বলি ?

অনুভব-শক্তিটা বরাবরই প্রখর সোমেনবাবুব। এই অনুভূতির আঙুলের ইশারায় অনেক অজানা অচেনা জায়গায় মাথা গলিয়ে এ-যাবৎ জীবনের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তিনি। আজও এটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁর মনে হয়েছে এই রাতের আলাপটুকু সূচনা মাত্র, শেষ নয। শেষ হলে তাঁরই লোকসান। জবাব দিলেন, একটা কোল্ড্ বীয়ারও বলতে পারেন।

এটা যেন আশা করেননি ভদ্রলোক। ইশারায বয়কে ডেকে খুশি মুখে সব থেকে সেরা কোল্ড্ বীয়ারের অর্ডার দিলেন।—আপনি ওখানে তাহলে কোকো-কোলা আর অরেঞ্জ নিয়ে বসে থাকতেন কেন ?

—আপনার মতো স্নাযুর ওপর এত দখল আর ক'জনের! জুলুমের ভয়ে সাধু

সাজা নিরাপদ।

স্নায়ুর ওপর দখলের কথাটা বাড়িয়ে বলেননি সোমেনবাবু। চার গেলাসের পর মোহন চৌধুরীর শুশ্রূষা পর্ব খানিক আগেই দেখেছেন। এখন পাঁচ গেলাসের পর দেখছেন। চোখের পাতা একটু ভারী আর মুখ একটু ফোলাফোলা লাগছে। গলার ভারী স্বরও একটু যা মন্থর লয়ের। ব্যাস, এইটুকুই।

মুখের দিকে চেয়ে লোকানন্দ বড়ুয়া আবার হাসছে অল্প অল্প।—আপনি আসেন অথচ কিছু খান না দেখে গোড়ায় আপনাকেই সব থেকে বাজে মোসায়েব ভাবতাম ওই ফিল্মওয়ালাদের। পরে অবশ্য লক্ষ্য করেছি ওরা আপনাকে মান্য-গণ্য করে একটু, মেয়েটা তো করেই। আপনি পপুলার লেখক যখন বাজারে বই-পত্র আছে অনেক?

—সত্তর-আশীখানা হতে পারে।

—স্ট্রেঞ্জ, আপনি তাহলে এ-সব সিনেমা-অলাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান কেন?

সোমেন মিত্তির ভিতরে ভিতরে ধাক্কা খেলেন একটু। তাকে জানলে বা চিনলে লোকটা আর একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলত। জবাব দেবার আগে বয় বীয়ারের বোতল আর গেলাস এনে হাজির করল। লোকানন্দ বড়ুয়া নিজের হাত-ঘড়ি দেখে নিল। সাড়ে ন'টা বাজতে মিনিট দুই বাকি। অনেকক্ষণ আগেই ম্যানেজারের লাস্ট ড্রিংক নেবার আবেদন শোনা গেছে। গেলাসে বীয়ার ঢেলে দিচ্ছিল বয়, তাকে হুকুম করল, আমার জন্য আর একটা হুইস্কি—কুইক! সোমেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, এর পর পাওয়া যাবে না, আপনার জন্য আর একটা এনে রাখবে?

—না, না।

বেয়ারা ছুটে চলে গেল। সোমেনবাবু বললেন, আজ একটু বেশি খাচ্ছেন বোধহয়?

—আই ডোণ্ট নো, আই হেট দিস—খেতে হয় বলে খাই।

অন্য প্রসঙ্গ ছেড়ে মানুষটার প্রতিই সোমেনবাবুর কৌতূহল আবার। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এখানে কোথায় প্র্যাকটিস করেন?

—রাস্তায় বা যেখানে সেখানে।

বয় আর একটা গেলাসে রঙিন পানীয় আর একটা সোডার বোতল রেখে গেল। সোমেন মিত্তির হাসতে চেষ্টা করলেন একটু।—রাস্তায় বা যেখানে সেখানে রোগী খুঁজে বেড়ান?

চোখের পাতা আরো একটু একটু ভারী লাগছে। ঢিমে তালে মাথা নেড়ে

জবাব দিল, অনেকটা তাই।

—এই জন্যেই সঙ্গে সর্বদা ওই ব্যাগ—আর গায়ে এই শাদা পোষাক?

—ইয়েস সার, দে হুইপ মাই কনশেন্স ওয়েল, বিবেকের কড়া চাবুক বলতে পারেন এ দুটোকে।

ভিতরে ভিতরে আরো একটু সজাগ হয়ে উঠলেন সোমেন মিত্তির। লোকটা ভারী চোখের পাতা তাঁর মুখের ওপর স্থির একটু। হাসির ছোঁয়া লেগে আছে তাতে। ওই হাসিটুকু হঠাৎ কেমন বেদনার্ত মনে হল সোমেনবাবুর। না, মুহূর্তের এই অনুভূতিটুকু ভুল হবার নয়, ভোলবারও নয়। সহজ হবার চেষ্টায় বীয়ারের গেলাস মুখে তুলে নিলেন। তারপর হালকা সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে মানে কলকাতায় এ রকম প্র্যাকটিস আপনি কত দিন ধরে করছেন?

—মাস তিনেক।

—তার আগে বাংলাদেশে মানে পূব-বাংলায় ছিলেন?

সোমেনবাবু তখনো ভাবছেন, বাংলাদেশের বিগত উত্থান সংঘাতে ভদ্রলোকের জীবনে মর্মান্তিক কিছু ঘটে গেল কিনা। চাটগাঁও তো কম বিধ্বস্ত হয়নি সে-সময়।

লোকানন্দ বড়ুয়া হাতের গেলাসের দিকে সোনালি জলে নিজেকে দেখছে। মাথা নাড়ল।—না, পুব বাংলার দেশছাড়া হয়েছি সেই ছাত্র জীবন থেকে।

—তারপর?

গেলাস থেকে মুখ তুলে তাকানো। কৌতূহলের আঁচ পেয়ে চোখে খুশির আমেজ লাগল যেন একটু। গেলাসে ছোট একটা চুমুক দিয়ে সেটা সামনে রাখল।—তারপর ডাক্তারী পাস করা পর্যন্ত বোম্বাইতে, সেখান থেকে এফ, আর, সি, এস হয়ে আসার জন্য দেড় বছর ইংল্যাণ্ডে, সেখান থেকে ফিরে মোটা পসার জমানোর তাগিদে তারপর একটানা অনেকগুলো বছর গোয়াতে। গেল বছর গোয়া থেকে পলায়ন, কিছু দিন দমন আর দিউতে, সেখান থেকে আবার কিছু দিন বোম্বাই—তারপর মাস তিনেক আগে বোম্বাই থেকে এই কলকাতায়।—ব্যাস?

অর্থাৎ আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? জবাবের অপেক্ষা না করে লম্বা চুমুকে গেলাস খালি করে সেটা পাশে সরালো। শেষ নতুন গেলাস কাছে নিয়ে তাতে সোডা ঢালতে লাগল। এটা সপ্তম দফা। তিন চার দফার পরেই বহু লোকের বেসামাল অবস্থা দেখেছেন সোমেন মিত্তির। আর মোহন চৌধুরী—উপেন হালদারের কাণ্ড তো কিছুক্ষণ আগেই দেখেছেন।

আজ সাত দফার গেলাস হাতে এই একজনকে দেখছেন। এমন স্বতন্ত্র

কোনো মানুষকে আর বুঝি দেখেন নি।

চেয়ে আছে। হাসছেও অল্প অল্প। এবারের হাসিটা অন্যরকম। নিজের ভিতরের সঙ্গে যোগ নেই। প্রসঙ্গ বদলে সোজা জিজ্ঞাসা করল, যে ছবির জন্য এত ব্যাপার সেটা আপনার লেখা গল্প ?

সোমেন মিত্তির মাথা নেড়ে সায় দিলেন।—ডিস্ট্রিবিশন অ্যারেঞ্জমেণ্টের ব্যাপারে আমার আরো কিছু দায়িত্বও ছিল··· ।

—কি নাম গল্পের ?

—পসরা।

—ইউ মীন দি গার্ল সেলস হারসেলফ ?

—সেইভাবেই তাকে ব্যবহার করা হচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিশাস সার্কল থেকে সে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

মনঃপূত হল না যেন। অল্প অল্প মাথা নাড়তে লাগল।—যে দুজন মারামারি করল তারা প্রোডিউসিং পার্টনারস ?

—হ্যাঁ।

—আর ওই যে লাভ্‌লি মেয়েটি, যার নাম নূপুর ব্যানার্জি আই থিংক—সে হিরোইন ?

নাম আর লাভলি শুনে সোমেন মিত্তিরের ভিতরে বাঁকা আঁচড় পড়ল একটা। সায় দিলেন, তাই।

—নতুন আর্টিস্ট ?

—নায়িকা হিসেবে নতুন। কি ভেবে একটু ইন্ধন যোগালেন সোমেন মিত্তির, মন-প্রাণ ঢেলে চমৎকার অভিনয় করছিল··· ।

—রিয়েলি ? উৎসুক যেন।—সে ছবির বারটা বেজে গেল ?

—মনে হয়।

—সী উইল বি শক্‌ড্‌ ?

—খুব বেশি রকম !

—ওই দুটো স্কাউনড্রেলকে বাদ দিয়ে ছবি আপনারা শেষ করতে পারেন না ?

—লোকটার ভেতর বোঝার কৌতূহল না থাকলে সোমেন মিত্তির এ আলোচনা আগেই ছেঁটে দিতেন। জবাব দিলেন, সেটা সম্ভব নয়, অনেক টাকার ব্যাপার ?

—কত টাকার ?

—চার-পাঁচ লাখ !

—ওনলি ? সত্যিই অবাক যেন। বম্বেতে তো সত্তর আশী লাখ টাকা খরচ হয় একটা ছবিতে। চার পাঁচ লাখ ইজ নাথিং।

বোতলের বাকী বীয়ার গেলাসে ঢালতে ঢালতে সোমেন মিত্তির আরো একটু লঘু সুরে বললেন, আপনার তাহলে অনেক টাকা বুঝতে হবে।

মৃদু হেসে মেনেই নিল। বলল, ওরকম দু-পাঁচটা ছবি করার মতো টাকা থাকাটা বেশি কিছু নয়।···আচ্ছা, যে-লোকটা মেরে বসল তার নাম কি ?

—উপেন হালদার।

—হি ইজ এ রোগ। আর যে লোকটা মার খেল ?

—মোহন চৌধুরী।

—হি ইজ ওয়ার্স। হি ইজ এ শাক। দি গার্ল ইজ ফাইন উইথ হার ডেঞ্জেরাস কারভস—আই অ্যাম শিউর হি উড্‌ল চেজ হার স্টিল। সামনের গেলাস একটু পাশে সরিয়ে সামনে ঝুঁকল একটু। ঝিম-লাগা চোখে আবার একপ্রস্থ কৌতুক উকিঝুঁকি দিল যেন।—আর ইউ শিউর দ্যাট সী টুক দোজ থিংস ফ্রম হিম ?

এবারে একটু বিরক্তি বোধ করেছেন সোমেন মিত্তির। তবু জবাব দিলেন, কি বলছেন ঠিক বুঝলাম না—

বিরক্ত যেন সে ও।—আঃ····· হোয়াট ? আই মীন দোজ প্রেজেনটেশানস—আপনাদের হিরোইন ওই লোকটার কাছ থেকে হীরের দুল আর বেনারসী সত্যি নিয়েছে ?

সোমেন মিত্তির নিস্পৃহ জবাব দিলেন, নিতে পারে। নায়িকা হতে পারাটা যে মেয়ের ধ্যান-জ্ঞান, নতুন ছবিতে নেমে আর যা-ই করুক সে প্রডিউসার চটাবে না, তার হাত থেকে প্রেজেনটেশান নেওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়—

—আই নো, আই নো। চোখের কৌতুক আরো বেশি উপচে উঠতে লাগল।—বাট হু কুড হ্যাভ ডাইভালজড দিস সুইট সিক্রেট টু দি আদার ডেভিল ? হালদারের কানে খবরটা কে তুলে দিলে ? আপনাদের হিরোইন নূপুর ব্যানার্জি নিজে নয় নিশ্চয়, আর যে দিয়েছে সে-ও নয়। দেন হু অ্যাণ্ড হোয়াই ? এই মজার ব্যাপারটা আপনার মনে এল না আপনি কি-রকম সাহিত্যিক মশাই !

সোমেন মিত্র এবার যথার্থই থমকালেন একটু। এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাননি বটে। সঙ্গে সঙ্গে দীপু সরকারের মুখখানাই চোখের সামনে নেমে এলো তাঁর।

পর পর দু তিন ঢোঁক খেয়ে মজাটা আরো জরিয়ে নিল যেন ভদ্রলোক।

—ওই যে ভ্যাগাবণ্ড-মার্কা লোকটা, স্মার্ট জলি চ্যাটারবকস—কি নাম যেন?

—দীপু সরকার।

—ইয়েস—সে ছাড়া আর কে হতে পারে? কিন্তু ছবি পণ্ড হতে পারে জেনেও হাঙ্গরের খবর সে হায়নার মুখে তুলে দিতে গেল কেন? হোয়াট'স হিজ গেইনস? হাসতে লাগল।—সো দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভন অ্যাণ্ড আর্থ মাই ডিয়ার অথর।

মাথায় নিলে দিনের আলোর মতো স্পষ্টই বটে ব্যাপারটা। মনে পড়ল, বাড়িতে বসে দীপু সরকারকে একদিন তিনি বলেছিলেন, তোমার প্রোডিউসার দুটির ছবির থেকে নায়িকাকে নিয়ে উৎসাহ বেশি। জবাবে অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসায় দীপু সরকার তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেছল। আর তারপর সাগ্রহে ওই প্রোডিউসার দুজনকে এমন কি নূপুর ব্যানার্জীকেও একটু সমঝে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তার মাথায় কি আছে এ তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি! সে-শুধু হাঙ্গরের খবর হায়নার মুখে তুলে দেয় নি, হায়নার খবরও হাঙ্গরের কানে দিয়েছে, এক মেয়ের কাছ থেকে দুজনকেই তফাতে হটানোর চেষ্টা, ঐ মূর্তির প্রোডাকশন ম্যানেজারের এমন দুবলতার কথা কে ভাবতে পারে!

চুপচাপ তাঁর দিকে চেয়ে একটু যেন মজাই দেখছে লোকানন্দ বড়ুয়া। তারপর প্রসঙ্গ বাতিল করে সোজা কথায় চলে এলো সে।—যেতে দিন, আমি কেবল ওই নূপুর ব্যানার্জির কথাই ভাবছি, জবর জ্যান্ত মেয়ে, বাট ডেসটিণ্ড টু সাফার—আই অ্যাম ইন্টারেসটেড ইন হার ওনলি—ওর জন্য কি করা সম্ভব এখনো ভাবতে পারছি না—স্টিল··আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলবেন।

সাত নম্বর গেলাসের প্রতিক্রিয়ায় এই লোকের ভিতরের চিত্রটা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন সোমেন মিত্র। সহজ সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় দেখা করতে বলব, এই বারে?

—এখানে সুবিধে না হলে আমার সুইট-এ বসেও কথা হতে পারে—তিনতলা, সুইট সেভেনটিন—

সোমেন মিত্র গম্ভীর একটু। আপনার বয়েস কত?

—আটচল্লিশ···হোয়াই?

খুব বেশি হলে তেতাল্লিশ হবে ভেবেছিলেন। আটচল্লিশ শুনে বক্র ঝাঁঝালো সুরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল এবার।—এই বয়সে ওই মেয়ের প্রতি এত ইন্টারেসটেড হয়ে লাভ হবে ভাবছেন?

খুব চিন্তা না করেই যেন জবাব দিল, হতে পারে, নইলে শুধু ওই একটা মেয়ের

জন্তে আমি এখানে এভাবে আটকে গেলাম কেন···

—এখানে আটকে গেলেন মানে?

—হ্যাঁ এখানে—বিদিশার এই স্নগটে। ইট'স ওন্‌লি কর হ্যার!

দীপু সরকার আর মোহন চৌধুরীর দলের গোড়া থেকেই এই সন্দেহ—জানেন। সেটা যে এমন নির্লজ্জভাবে নিজেই প্রকাশ করে দেবে ভাবেন নি। হয়তো সুরার মাত্রা বেশি হওয়ার ফল। তপ্ত ব্যঙ্গের সুরেই সোমেন মিত্র বললেন, আপনার জন্তে আমারও বুকের ভেতরটা টনটন করছে।···একটা কথা জেনে রাখুন বড়ুয়া সাহেব. ছবি না হওয়ার হতাশা ওই মেযেকে আপনার ঘরে টেনে আনবে না, আপনার যত টাকাই থাক, ওই নূপুব ব্যানার্জিও বডঘরের লেখাপডা জানা মেয়ে।

এবারে যেন তার দিকে একটু উৎসুক নেত্রে তাকালো লোকটা। শেষ গেলাসের তিন ভাগ খালি দেখে বাকিটুকু খেতে গিয়েও খেল না। গলার স্বরে সামান্ত রস উপচে পডল যেন।—বডঘরের লেখাপডা জানা মেয়ে আপনাকে কে বলল?

—আমি জানি।

—ওর বাডিঘর বা কোথায় কার কাছে থাকে আপনার জানা আছে?

—না জানলেও শুনেছি।

ভারী চোখের তারায় আবার কৌতুকের ছোঁয়া লাগল যেন।—কোথায় শুনেছেন? দীপু সরকারের কাছে?

বিরক্তি চাপতে পারলেন না সোমেন মিত্র।—তা দিয়ে আপনার কি দরকার?

হাসছে অল্প অল্প। আর চোখের পলক না ফেলে তাঁকে দেখছে। টেনে টেনে বলল, আপনি নিজেকে একজন পপুলার লেখক ভাবেন, কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমি ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছি।

গেলাসের যেটুকু বাকি তারও অর্ধেকটুকু উদরস্থ না করে পারা গেল না যেন। আর সামান্তই অবশিষ্ট থাকল। গলার ভারী স্বরেও কৌতুকের আমেজ। আপনি তো এ পর্যন্ত বহু গল্প লিখেছেন স্যার, আজ আপনাকে একটা গল্প শোনাই—

বলার ধরনে এমন কিছু ছিল যে সোমেন মিত্র সত্যিই অবাক একটু।

দু আঙুলে করে টেবিলে গোটা কয়েক টক টক শব্দ করল লোকানন্দ বড়ুয়া। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি টিপটিপ করছে। কোনো একটা দেখা চিত্র ফিরে আবার

দেখে নিচ্ছে যেন।

—মাস আড়াই হবে বোধ হয় বুঝলেন…। তার দিন কয়েক আগে আমি কলকাতায় এসেছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কোথায় খাই কোথায় রাত কাটাই—কিছুই ঠিক নেই তখনো।

—সেদিনটা ছিল ভ্যাপসা গরম। সকাল থেকে বেলা দুটো আড়াইটা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সেই কড়া রোদে আর গরমে গায়ের চামড়া যেন ঝলসে যাচ্ছিল। উত্তর কলকাতার দিক সেটা। ছোট একটা বার-রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকে পড়লাম। সেই দুপুর রোদ্দুরে আমার মতো হতভাগা মার্কা লোক ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই তখন আর।

এক পাশে তিন-চারটে খুপরি কেবিন। তার একটাতে বসলাম। প্রথমে ঢক-ঢক করে এক বোতল ঠাণ্ডা বীয়ার খেয়ে নিলাম। তারপর অল্প কিছু খাবার খেয়ে আবার এক বোতল ঠাণ্ডা বীয়ার নিলাম। রোদের তাত কমার আগে আর বেরুনোর ইচ্ছে নেই।

বাট্ দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ মাই ডিয়ার অথর! সেই মেনি থিংস-এর একটার নাম বোধ হয় যোগাযোগ—স্ট্রেঞ্জ কোয়েনসিডেন্স। দুজন খদ্দের এলো। তাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল কিন্তু দেখা গেল না। কেবিনের পর্দাটা ভালো করে টানা ছিল। আমার সামনের খুপরি কেবিনে তারা গিয়ে বসল। মাঝে পাতলা কাঠের পার্টিশন, ওপরটা ফাঁকা। এ-ধার থেকে কান পাতলে আর ও-ধার থেকে ফিসফিস করে কথা না বললে দুপুরের এই নির্জনে সবটাই শোনা যায়। তাছাড়া এই অসময়ে সামনের কেবিনে আর কেউ আছে তারা ভাবেনি বোধ হয়।

পনের সেকেণ্ডের মধ্যে বোঝা গেল তাদের একটি ছেলে একটি মেয়ে।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, কি খাবে?

মেয়েটি বলল, ফ্রুট আইসক্রিম।

—ব্যস?

—ব্যস।

বয়কে একটা আইসক্রিম আর একটা ঠাণ্ডা বীয়ারের অর্ডার দেওয়া হল।

মেয়েটির গলায় অস্ফুট ঝাঁঝ।—ফের?

ছেলেটির বোঝানোর চেষ্টা, একটা তো বীয়ার শুধু, ও আবার ড্রিংক নাকি—গরমে গলা-বুক কাঠ হয়ে গেছে।

ধরে নেওয়া যেতে পারে অর্ডার নিয়ে বয় সরে গেছে। কারণ কুট কুট করে

ঠেস দিয়ে মেয়েটি বলল, ছবিতে নামার ব্যাপারে তুমি আবার আমাকে অবিশ্বাস করো—নিজে এইসব শুরু করেছ! এর থেকে স্কুল মাস্টারি ঢের ভালো ছিল তোমার।

ছেলেটা হাসল একটু।—আমার যা-কিছু অধঃপতন সব তোমার জন্য। স্কুল-মাস্টারির জন্য তমলুকে ফিরে গেলে তোমার সেই ভগ্নীপতি কি করবে?

খুক-খুক করে একটু হাসল মেয়েটা। বলল, জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

মেয়েটির কথা আর হাসি দুই-ই মিষ্টি। আমি টুঁ-শব্দটি না করে কান পেতে আছি। ওরা চুপ একটু। কারণ বয় ঢুকেছে। প্লেট রাখার শব্দ। বীয়ারের বোতল খোলার শব্দ। তারপর আবার কুটকুট কথা। বয় বিদেয় হয়েছে।

মেয়েটি বলল, তুমি বাপু আর খুঁতখুঁত কোরো না, এভাবে আর কাঁহাতক চলে? বাবার দু চোখের ছানিই পেকে গেল, মায়ের গ্যাসট্রিক আলসার বেড়েই চলেছে, ওই হতচ্ছাড়া ভগ্নীপতি তো সেই থেকেই টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে—বস্তিঘরের মতো দুখানা ঘর, ভাড়া বাকি বলে তারও মালিক কথা শোনায়—ভাই বোন দুটোর তিন মাস করে স্কুলের মাইনে বাকি—এভাবে আর কিছুদিন চললে আমি পাগল হয়ে যাব। নাচের স্কুল থেকে মাইনে পাই মাত্র পঁচাশি টাকা—আমাদের গুষ্টিসুদ্ধু টানতে গিয়ে তোমারও জিভ বেরিয়ে গেল। তোমাকে বলিনি, ওই মুখপোড়া ভগ্নীপতি টাকা পাঠানো বন্ধ করতে মায়ের কাছে বাবা আমাকেই দিনরাত দুষছে—এভাবে আর চলতে পারে না—তুমি আপত্তি করো আর যাই করো এ-ছবিতে নাববই বলে দিলাম। এ হাতছাড়া হলে আর হবে না—

মেয়েটির এত কথা বলার মধ্যে এমন একটা আকুতি ছিল মশাই সে আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। পাছে শব্দ হয় সেজন্য নিজের গেলাসেও বীয়ার ঢালছি না আমি।

একটু চুপচাপ। তারপর ছেলেটার গলা। অন্য গলা যেন।—কিন্তু আমার বড় ভয় করে। গান ছেড়ে তোমার নাচে ঢোকাটাই আমি পছন্দ করিনি। নাচের স্কুলের ওই ছুঁচোটার এরই মধ্যে তোমার দিকে চোখ গেছে। ছবিতে নামার পর তোমাকে ধরে রাখার মতো মুরোদ আমার হবে!

মেয়েটির গলায় অনুযোগের থেকেও অসহিষ্ণুতা বেশি।—ফের অবিশ্বাস? নিজের জীবনের ভয়-ডর ছেড়ে আমাকে কি ভাবে বাঁচিয়েছ সে আমি ভুলে যাব? আমাকে এত ছোট এত নীচ ভাবো তুমি!

জবাবে করুণ গলা করে ছেলেটা বলল, আর একটা বীয়ার খাই?

—আচ্ছা খাও। কিন্তু আমার কথার জবাব দাও, কি ভাবো তুমি আমাকে ?

—ইয়ে···ঠিক তা নয়, ওতে একবার ঢুকে পড়লে নিজের ওপর হাত থাকে না সব সময়। বয়—!

বয় এলো। আর একটা বীয়ারের হুকুম হল। বীয়ার এলো। তার একটু বাদে মেয়েটির জোরালো চাপা গলা।—নিজের ওপর যার হাত থাকে না তার থাকে না। আমার থাকবে। থাকবেই। সেই অসহিষ্ণুতার মধ্যেই হঠাৎ চাপা হাসি একটু।—ঠিক আছে, তোমাকে কথা দিচ্ছি, ছবি করে বেশ কিছু টাকা হাতে পেলে তোমার সেই স্বপ্নের কাব্যই আমি সফল করব।

তারপরেই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ানোর মতো মৃদু শব্দ একটু। আমার ধারণা মেয়েটাই। তিন-চার সেকেণ্ড···।

—যাঃ, বিচ্ছিরি গন্ধ মুখে! অস্ফুট কৌতুক।—এবারে বিশ্বাস হল ?

—এ আর এমন কি, সিনেমাতেও এসব অ্যালাউড আজকাল।···যাক, তোমার গোঁ দেখে প্রোডিউসার শালাদের সঙ্গে একটু অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেই রেখেছি···সাউথ ক্যালকাটার বিদিশা চেনো, মস্ত বার আর রেস্তোরাঁ ?

—ট্রামে আসতে যেতে দেখেছি।—সেখানে কি ?

—ও শালাদের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ও রকম জায়গাতেই হয়। সামনের ন' তারিখে সন্ধ্যা সাতটার পর সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবার কথা। ওই লম্পট ভগ্নীপতির দেওয়া গয়না আর ভাল শাড়ি-টাড়ি যা আছে পরে এসো—ব্যাটারা যেন বুঝতে না পারে।

খুশি গলা।—এতখানি এগিয়ে রেখে আবার খুঁতখুঁতুনি। গোমড়া মুখ করে আছ কেন ? হাসো বলছি!

—বীয়ারেও বুক ঠাণ্ডা হচ্ছে না···আমার সেই স্বপ্নের কাব্যে শেষ পর্যন্ত আমারই জায়গা হবে কিনা কে জানে!

—কি ? ফের সেই এক কথা ? এক সন্দেহ! রাগে হিসহিস করে এরপর মেয়েটা যে কথাগুলো বলে উঠল মিস্টার অধর, আমার কানের পর্দা দুটো যেন ছিঁড়েখুঁড়ে গেল, বুকের ভিতরে দগদগে গরম লোহার ঘা পড়তে লাগল। ঠিক সেই রকম হিসহিস গলা আর সেই রকম কথা আমি আরো একবার শুনেছি! সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, সেই মেয়েরই গলা সেই মেয়েরই কথা।···মেয়েটা বলছে, এই আমার বুকে হাত দিয়ে বলছি সেরকম হলে আমার যেন সব শেষ হয়ে যায়—জীবন থাকতে কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না—কেউ পারবে না—কেউ না!

সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথাটা যেন কি রকম হয়ে গেল মিস্টার অথর। একটানে কেবিনের পর্দা আধখানা সরিয়ে ফেললাম। পাশের কেবিনে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল। একটু বাদে ওরা উঠল। বেরিয়ে এলো। নিজেদের নিয়ে তন্ময় ওরা, এ'দিকে ফিরেও তাকালো না। আমি পাশাপাশি চলে যেতে দেখলাম দুজনকে। বিশেষ করে মেয়েটাকে দেখলাম। না, সেই মেয়ে নয়। সেই মেয়ের ছিল আরো সুন্দর মুখ, আরো যেন ভর-ভরতি, উচ্ছল। কিন্তু আমার মনে হল সেই মেয়েই। মনে হল ভিতরটা সেই রকমই। আমি কাঁপতে লাগলাম।

…বীয়ারের বোতল শেষ না করেই টাকা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ওরা দুজন ট্রাম স্টপের সামনে দাড়িয়ে। মেয়েটা হাসছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওরা আমাকে দেখেও দেখল না। ট্রাম আসতে হাসিমুখে উঠে গেল ওরা। মেয়েটার এই হাসির তরঙ্গও চেনা-চেনা মনে হতে লাগল।

ঘড়িতে ঢং করে শব্দ হল একটা। রাত সাড়ে এগারোটা। লোকানন্দ বড়ুয়া চমকে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালো। আর পর-মুহূর্তে ছিটকে উঠে দাঁড়াল। উদ্‌ভ্রান্ত ক্রুদ্ধ মূর্তি হঠাৎ। এক চুমুকে গেলাসের তলানিটুকু শেষ করে ঠক করে টেবিলে নামালো সেটা। সোমেন মিত্রর ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখের ওপর একটা তপ্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে বিকৃত মুখে বলে উঠল, রাত সাড়ে এগারোটা—ইউ হ্যাভ স্পয়েল্ড মাই হোল নাইট—আজ ইনজেকশন নিয়ে ঘুমোতে হবে—নাও লীভ মি প্লীজ!

ঝুঁকে মোটা ব্যাগটা তুলে নিয়ে অসহিষ্ণু পদক্ষেপে হনহন করে দরজার দিকে চলল সে।

সোমেন মিত্র বিমূঢ়ের মতো বসে।

॥ চার ॥

দীপু সরকার আসবে আশাই করা গেছল, পরদিন সকালেই এসে হাজির সে। সোমেনবাবু সামনে একটা বই খুলে বসেছিলেন। পড়ছিলেন না। গতকালের ব্যাপারটাই ভাবছিলেন তিনি। অন্য দিনের মতো হাঁকডাক করে ঘরে ঢুকল না, বাইরে থেকে মিনমিন করে জিজ্ঞাসা করল, ভিতরে আসব?

—এসো। বই থেকে মুখ তুললেন। মনে মনে তাকে চাইছিলেন, তবু গম্ভীর একটু।—বোসো। কি খবর?

দীপু সরকারের মুখখানা শুকনো। রাতে ভাল ঘুমোয়নি মনে হয়। চেয়ার টেনে বসল।—খবর আর কি বলব দাদা, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, মাঝে পড়ে এই ছাপোষাদের প্রাণান্ত। আমি চোখকান-কাটা মানুষ তবু আপনার কাছে মুখ দেখাব কি করে ভাবছিলাম! আবার মনে হল এই দুঃসময়ে দাদার কাছে যাব না তো কার কাছে যাব।

ছেলেটার ভেতরটা আবার নতুন করে দেখার চেষ্টায় আছেন সোমেন মিত্তির। সুন্দর কি কুৎসিত জানেন না, কিন্তু ভিতরের সেই চেহারা যেন দেখার মতো মনে হচ্ছে কাল থেকে। বললেন, দুঃসময় তো মোহনবাবুর, তোমার আর কি···।

কি যে বলেন দাদা ঠিক নেই। মোহনবাবুর নেই নেই করেও যা আছে তাতে তার খাওয়া পরার ভাবনা নেই।· কিন্তু আমরা? ছবি বন্ধ, কাল থেকেই কি খাব? এই বাজারে একটা কাজ জোটানো কি চাটটিখানি কথা!

—আমরা বলতে একজন তো তুমি।···আর কে?

দীপু সরকার থমকালো একটু।—দুর্দশা আমারই চরম সব থেকে। শুকনো মুখে হাসি টানার চেষ্টা একটু।—আপনার 'হিরোইন' তো কাল লজ্জায় দুঃখে কেঁদেই ফেললে একেবারে। আপনার সামনে আর জীবনেও এসে দাঁড়াতে পারবে না বলছিল। ভদ্রমহিলার জন্য দুঃখ হয়, বেচারার এত উৎসাহ এত আনন্দ সব যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল। প্রথম ছবিতে এই কাণ্ড দেখে একেবারে মুষড়ে পড়েছে।

সোমেন মিত্তির নির্লিপ্ত মুখেই দেখছেন তাকে। খুব যদি ভুল না হয়ে থাকে মুষড়ে যে এই একজন আরো বেশি পড়েছে তাও স্পষ্ট।

—চা খাবে?

—না, থাক, বউদিকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে।··কাল রাতের ব্যাপার উনি শুনেছেন নাকি?

—না।

—যে বিচ্ছিরি ব্যাপার, না শোনাই ভাল। কিন্তু কি হবে দাদা, ছবিটা হবেই না আর?

—মোহনবাবু কি বলেন?

—তিনি আর কি বলবেন, পার্টনারশিপ নাকচ করার কেস ঠুকে ওই লোহার গবেট যতটা সম্ভব তার টাকা তো আদাই করে নেবে—এখন পর্যন্ত খরচা যেটুকু হয়েছে তার টাকা থেকেই হয়েছে। মোহনদা ছবি করার চেষ্টা ছাড়বে না অবশ্য,

কিন্তু এই ধাক্কা সামলে নিয়ে আবার পার্টনার জোটানো তো সহজ নয়।… আপনার সেই ডিস্ট্রিবিউটারকে একবার বলে কয়ে দেখুন না দাদা, আপনাকে তো ভারী ভক্তিশ্রদ্ধা করেন ভদ্রলোক, যদি একটা গতি হয়—

সোমেন মিত্তির চেয়ে আছেন। এই তাগিদের মধ্যেও আন্তরিকতার অভাব নেই এটাই আশ্চর্য। হাল্কা করে জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর ?

—কি তারপর ?

—গতি হলে উপেন হালদার তো আর থাকছে না, বেচাল দেখলে মোহন চৌধুরীকে রোখবার জন্য এবার কাকে দাঁড় করাবে ?

ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখ।—তা-তার মানে !

হাসি পেলেও হাসছেন না সোমেন মিত্তির।—নূপুরকে মোহনবাবুর হীরের দুল আর বেনারসী প্রেজেন্ট করাটা সত্যি ?

—তা-তা সত্যি হলেই বা এরকম প্রেজেনটেশানের ব্যাপার তো এ লাইনে আকছার হয়ে থাকে।

—হয়ে থাকলেও খবরটা উপেন হালদারের কানে তো তুমিই তুলেছ ?

বেচারার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল আরো, তেমনি সচকিত।—মোহনদা ফোনে আপনাকে কিছু বলেছেন ?

—না।

দীপু সরকার তড়বড় করে উঠল এবার।—আপনিও দাদা এইরকম ভেবে বসে আছেন ! ওদিকে নূপুর মানে আপনাদের নূপুর ব্যানার্জীও ঠিক এই ভেবে ক্ষেপে লাল আমার ওপর। কথায় কথায় প্রেজেনটেশনের কথাটা উপেন হালদারকে যদি বলেই থাকি সে এরকম একটা কাণ্ড করে বসতে পারে আমি ভেবেছি !

গম্ভীর মুখে বেশ জোর দিয়েই সোমেন মিত্তির বললেন, ভেতরে বাইরে এতটা দুরকম হলে তোমার সঙ্গেও আমার পোষাবে না। তুমি যা করেছ বেশ বুঝেশুনে ভেবেচিন্তেই করেছ। ঠিক কিনা ?

দীপু সরকারের মাথাটা তার নিজের বুকের ওপর ঝুলে রইল খানিক। মুখ তুলে সোমেনবাবুর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস দেখে যেন আশ্বাস পেল একটু, ব্যগ্র মুখে বলল, সত্যি দাদা, মেয়েটাকে নিয়ে কি যে রেষারেষি ওদের দুজনের মধ্যে যদি দেখতেন ! তার ওপর মোহনদাকে ওই সব প্রেজেণ্ট করতে দেখে হঠাৎ আমার মাথাটাই কেমন বিগড়ে গেল। তা বলে বিশ্বাস করুন লোহার ব্যাটা অতখানি ডাইরেকট অ্যাকশন বাধিয়ে বসবে আমি ভাবিনি। উঃ কেসিয়াস ক্লে-মার্কা একখানা যা ঝেড়েছে মোহনদার ওপরের দুটো দাঁত সাবাড় !

সোমেন মিত্তির হেসেই ফেললেন এবার।—যাক, এবারে দুটো সত্যি কথা বলো দেখি! তোমার বড়ঘরের মেয়ে নূপুর ব্যানার্জী বস্তিঘরের মতো যে দু'খানা ঘর নিয়ে আছে তারও তো তিন মাসের ভাড়া বাকি—সে লেখাপড়া কদ্দুর করেছে ঠিক ঠিক বলো দেখি?

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে দীপু সরকার বলল, এ আপনি জানলেন কি করে?

—জিজ্ঞেস করছি আমি। তুমি জবাব দাও।

সেকেণ্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করেছিল, তারপর আর পড়া হয়ে ওঠেনি।

—তার বাবার দুচোখে ছানি আর মায়ের গ্যাসট্রিক আলসার?

আবারও হাঁ খানিক।—নূপুর আপনাকে সব বলেছে?

—জিজ্ঞেস করে দেখো সে কিছুই বলেনি। ওদের সংসার তুমিই টানছ যা হোক করে?

—হ্যাঁ…। একটা নাচের স্কুল থেকে ও-ও কিছু টাকা পেত, এ ছবির কল্যাণে বরবাদ।

হালকা টিপ্পনীর সুরে সোমেনবাবু বললেন, সে-তো তোমার ক্রেডিট। যাক, তমলুকে তার ভগ্নীপতির ব্যাপারখানা কি খোলাখুলি বলো তো শুনি—

দু'চোখ ঠিকরে বেরুবার দাখিল দীপু সরকারের। যাই হোক, আর রাখা-ঢাকার মধ্যে না গিয়ে ঘটনাটা খোলাখুলিই বলেছে সে। প্রবৃত্তির এই নগ্ন দিকটা জানা আছে সোমেন মিত্তিরের। খুব অবাক হননি কারণ এই গোছেরই কিছু হবে ধরে নিয়েছিলেন। তবু ভিতরে ভিতরে মরীয়া ছেলেটার প্রশংসা না করে পারেননি। না, তার এই হা-ভাতে চেহারাটাই সব নয়। অন্তত ছিল না।

…নূপুরের সেই জ্যাঠতুতো ভগ্নীপতিটি তমলুকে মস্ত অবস্থার মানুষ। অনেক জমি জমা মস্ত ব্যবসা। বয়েস নূপুরের ডবল। ভারী রসিক মানুষ। কলকাতায় এলে মেয়ের বয়সী শালীর সঙ্গে রসিকতা চলে, ফাঁক পেলে গায়ে-পিঠে হাত বুলোয়। নূপুর ফোঁস করে ওঠে, আবার অত বড় লোক ভগ্নীপতি তাদের অবহেলা করে না বলে তাকে পছন্দও করে। অবস্থা যেমনই হোক ছেলেবেলা থেকে নাচগানের ঝোঁক ওর। বেশি ঝোঁক নাচের। সেই নাচ দেখে ভগ্নীপতিটি মুগ্ধ।

সে-সময় নামী ডাইরেক্টরের পুরনো ছবিতে নূপুরের সেই অ্যাকটিং দেখে ওই ভদ্রলোকই সব থেকে বেশি বাহবা দিয়েছে। হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করার পরেই নূপুরের বাবা বেসরকারী কেরাণীগিরি থেকে রিটায়ার করলেন। সামান্য পুঁজি যা পেলেন তা ভেঙে খেলে আর কদিন! চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন

ভদ্রলোক।

সেই সময় দরদী ভগ্নীপতিটি এসে একরকম জোর করেই তমলুকে নিয়ে গেল। তার বাবা-মাকে ভরসা দিল তাদের এই মেয়ের জন্য কোনো ভাবনা নেই, সব ভার সে নিল। তমলুকে কলেজে পড়বে, নাচ শিখবে। তারপর স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে মস্ত একজন হয়ে দাঁড়াবে—তার আগে বিয়ে নয়। তখন কত বর ওর পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাবে সেটা যেন সকলে দেখে নেয়। আর নূপুরের বাবা মায়েরও দুশ্চিন্তা করে কাজ নেই, এখানে তাদের দিন চলার মতো ব্যবস্থা তমলুকে গিয়েই সে করবে।

করেছে। মাসে তিন-চারশ করে টাকা পাঠিয়েছে নূপুরের বাবাকে। কোনো মাসেই হেরফের হয়নি। মানুষের মধ্যে দেবতা দেখেছেন নূপুরের বাবা-মা।

……সেইখানে দীপু সরকারের সঙ্গে নূপুরের প্রথম দেখাসাক্ষাৎ। একেবারে সেই ভগ্নীপতির বাড়িতে। দীপু সরকার সেখানকার এক স্কুলে ইংরেজির মাস্টার। ইংরেজিরই এম-এ ও। মাসে দেড়'শ টাকা মাইনেয় ভগ্নীপতির বাড়িতে টিউশনি করে। তার ছোট দুটো ছেলেকে পড়ায়। সেই ভদ্রলোকেরও মেয়ে বড়। সত্ত সত্ত বিয়ে দিয়ে তাকে শ্বশুরঘর করতে পাঠানো হয়েছে।

ভগ্নীপতির স্ত্রীটির মাথায় ছিট। কঙ্কালসার চেহারা। শুচিবায়ু রোগ তার ওপর। অন্দরমহলে জল ঘাটাঘাঁটি করেই দিন কাটে তার। বছরে ছ'মাস রোগে ভোগে, তখন হোমিওপ্যাথি ছাড়া অ্যালোপ্যাথি ওষুধ চলে না। এমনিতে খিটখিটে মেজাজ। কিন্তু মেয়ের বয়সী খুড়তুতো বোনের অনাদর করল না। তবু ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপারে সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত নূপুর।

ভগ্নীপতির বাড়িতে প্রথম একটা বছর প্রচুর সুখেই কেটেছে বলতে হবে। খাও দাও বেড়াও ফুর্তি করো সিনেমা দেখো আর নেচে গেয়ে বেড়াও। ভগ্নীপতির কত যে দরাজ মন সেটা যেন এখানে এসে আরো বেশি বুঝতে পারল সে। ভগ্নীপতি তাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিল, কিন্তু ছেলেগুলো তাকে জ্বালায় শুনেই দু মাসের মধ্যে কলেজ থেকে তার নাম কাটিয়ে দিল। পড়াশুনা হওয়া নিয়ে কথা, বাড়িতে গোটা দুই প্রোফেসার রেখে দিলেই তো হবে। কিন্তু পরের এক বছরের মধ্যেও সে-প্রোফেসারের মুখ দেখা যায়নি। নূপুরও হাঁপ ফেলে বেঁচেছে। পড়াশুনার নামে তারও গায়ে জ্বর। নাচ আর গান হলেই হল। ভগ্নীপতিও বলে, ও একজন বিরাট শিল্পী হবে। এ ব্যাপারে তার কার্পণ্য নেই। বাড়িতে গানের মাস্টার আসে। আর খড়্গপুর থেকে সপ্তাহে তিনদিন এক নামকরা অবাঙ্গালী নাচের মাস্টারনি আসে। মাস গেলে ভগ্নীপতির মোটা

খরচ এতেও।

ঘুঙুর পায়ে নূপুরের ঝমঝম নাচের আভাস দীপু সরকারের কানে আসে। কারণ এই শিক্ষার আসরও বসে এদিকের মহলেই। বিশাল চকমিলানো দালানের একেবারে ওধারের অন্দরমহলে নূপুরের দিদির কানে এই নাচগানের মহড়া পৌছয় কিনা দীপু সরকার জানে না। তাকে তখন রোগে ধরে গেছে। মন দিয়ে স্কুল করতে পারে না, ছেলে পড়াতে পারে না। কতক্ষণে বিকেল হবে কতক্ষণে টিউশনির নামে এ-বাড়িতে এসে হাজির হবে! রোজ যে নূপুরের চোখের দেখা মেলে তাও নয়। কোনদিন নাচের শব্দ কানে আসে, কোনদিন গানের। অপরিণত বয়সের ছেলেদুটোও কিছু যেন ব্যতিক্রম টের পায়। তারাও বুঝে নিয়েছে মাস্টারমশাইটি নূপুর মাসির নাচগানের ভারী ভক্ত। পড়াতে এসে পড়ানো আর হয়ে ওঠে না, উসখুস করে অন্যমনস্ক হয়। এর দাওয়াইও তাদের কাছে গোপন নেই আর। ওদের বাবা বাড়িতে না থাকলে মাস্টারমশাইকে তারা ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। পাশের ঘরে বসিয়ে মাসির নাচ দেখায়। গান শোনায়। যেদিন সেটা হয় না সেদিন মাস্টারমশায়ের রাগারাগি আর বকাঝকার ফলে দু ভাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। কিন্তু ও বেচারারা, কি করবে! এও ওরা বুঝে নিয়েছে মাসির নাচগানের সময় বাবা বাড়ি থাকলে মাস্টারমশাইকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া চলে না। বাবা ইদানীং অনেকদিনই সন্ধ্যের আগে চলে আসে। তাছাড়া সপ্তাহে নাচ তিন দিন আর গান দু দিন। বাকি দুটো দিন তো বাদ এমনিতেই পড়ে যায়। আর বাবার সঙ্গে গাড়িতে চেপে মাসি এক-একদিন বেড়াতেও বেরিয়ে যায়।

দীপুর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল ক্রমশ। তার একতরফা প্রেম নিরুদ্বিগ্ন হেম নয়। সর্বদা হাড়ে-পাঁজরে যন্ত্রণা একটা। রবিবারেও এ-বাড়ির সামনে এসে ঘুরঘুর করে সে। ছাত্ররা দেখে ফেললে তাদের উপদেশ দিতে আসে। কিন্তু ছাত্রদের ছেড়ে দোতলা থেকে হয়তো আরো কেউ দেখে ফেলে। এক পিঠ খোলা চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মাঝে-সাজে হাতের চিরুনি এক-একবার মাথায় ওঠে। চোখা-চোখি হয়ে গেলে দীপু সরকারের ঘাম হতে থাকে।

এই দেড় বছরের মধ্যে দীপু সরকারের সঙ্গে দশটা মুখের কথাও হয়নি তার। নেহাৎ ছাত্র দুটি একেবারে সামনাসামনি ধরে নিয়ে গেলে একটা দুটো মুখের কথা। নূপুর গল্পের বই পড়তে ভালবাসে, ছাত্রের হাত দিয়ে সপ্তাহে তিন-চারখানা করে বই যোগান দিয়ে আসছে দীপু সরকার। কিন্তু সেসব বইয়ের আলোচনার জন্য বা বিশেষ কোনো বইয়ের তাগিদ দেবার জন্য, এমন কি বই ফেরত দেবার

জন্যেও ওই নির্দয় মেয়ে পড়ানোর সময় একটিবার ঘরে ঢোকে না। যা-কিছু ওই ছেলে দুটোর মারফৎ।

কিন্তু নূপুর ব্যানার্জী তার এই ভক্তের মনের খবর ভালই রাখে। আর ভিতরে ভিতরে মজা পায়। নূপুর পরে এটা নিজের মুখেই স্বীকার করেছে। ওই মূর্তির একটা স্কুলমাস্টার ছেলেকে মন দেবার চিন্তা মনের কোণেও ঠাঁই পায়নি। কিন্তু ভক্ত অপছন্দ হলেও সে যদি মুখ থুবড়ে পড়েই থাকে তাতে এমন কি আপত্তি! সে তো দিব্বি সমাদরে খাচ্ছে-দাচ্ছে নাচ-গান নিয়ে ফুর্তিতে আছে। এমন কি বাড়িতে বাবা-মাকে দেখতে যাবারও তাগিদ বোধ করে না। সেখানকার টানাপোড়েনের দিন এখন ভযাবহ মনে হয় তার।

কিন্তু এই সময় থেকেই ভগ্নীপতি' ভদ্রলোকের অভিলাষের আঁচ খুব একটু একটু করে পেতে শুরু করল সে। তার স্ত্রী অর্থাৎ নূপুরের জ্যাঠতুতো দিদি মাসের মধ্যে বিশ দিন বিছানায় তখন। বিশ গজ দূর থেকে তার হাঁপের টান শোনা যায়। কিন্তু স্ত্রীর জন্য কোন রকম উদ্বেগ ভদ্রলোকের কখনো ছিল না, তখনো নেই। বরং শালীর প্রতি আদরযত্নটা তখন আরো বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে কলকাতার বাড়িতে পাঠানো টাকাব পরিমাণও। এদিকে আজন্ম রুগ্ন ছিটগ্রস্ত স্ত্রীর জন্য দুঃখ করে আর নূপুবের গায়ে-পিঠে হাত বুলিযে সেই দুঃখটা যেন ওর মধ্যে চালান করে দিতে চায়। বেড়াতে বেরুলে নূপুরের হাত নিজের হাতের মুঠো থেকে আর ছাড়তেই চায় না। ভগ্নীপত্তির রসের দাবীতে খামচাখামচিও যেন বেড়েই চলেছে।

এত আনন্দের মধ্যেও একটা দুশ্চিন্তার ছায়া ঘন হয়ে উঠতে লাগল।

এদিকে স্কুল মাস্টার দীপু সরকারের বেপরোয়া দিকটাও প্রকাশ পেয়ে গেল এতদিনে। মদন-শরের যন্ত্রণা আর সহ্য করা যায় না। এসপার কি ওসপার! গল্পের বইয়ের মধ্যে একটা চিঠি পাঠাবার পর তিন-তিনটে দিন ঘেমে নেয়ে অস্থির। লিখেছিল সামান্য দু-চার কথাই। অবধারিত আত্মহত্যার পরিণাম থেকে সে তাকে রক্ষা করতে পারে কিনা। কারণ বিগত দুটো বছর ধরেই তার আহাব নিদ্রা ঘুচে গেছে।

তিন দিন বাদে নূপুর সেই প্রথম পড়ার ঘরে এলো। চিঠি পেয়ে তার ভেতরটা আরো তিরিক্ষি মেরে গেছে। একে ভগ্নীপত্তির উৎপাত তার ওপর এই প্যাচামুখোর চিঠি। ছেলে দুটোর একটাকে বলল, বাইরে কে যেন ডাকছে দেখে আয় তো! আর একজনকে হুকুম করল আমার বিছানার ওপর গল্পের বইটা পড়ে আছে—নিয়ে আয়।

দুজনে ঘর ছেড়ে বেরুতে ঘাম-ঝরা আধমরা দীপু সরকারকে দৃষ্টিবাণে বদ্ধ করে নিল কয়েক পলক। বলল, চিঠি পেলাম। জামাইবাবুকে দেখাবার জন্য রেখেছি। ব্যাপারটা আত্মহত্যা হবে কি হত্যা হবে ঠিক বলতে পারছি না।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।—ছোট ছোট বই ছেড়ে দুই একখানা মোটা বই আনতে চেষ্টা করবেন।

দীপু সরকার নির্বোধ নয়। এই থেকেই বুঝে নিল চিঠি ভগ্নীপতির হাতে যাবে না। আর সেই সঙ্গে এও স্পষ্ট যে তার কোনো আশা নেই।

এরপর কলকাতা থেকে মায়ের একখানা চিঠি পেল নূপুর। সাধারণ দু-পাঁচ কথার পর মা লিখেছেন, তোমার বাবার শরীরটা ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। শুমনি বাবার জন্য ভয়ানক উতলা হয়ে পড়ল। বাবাকে একবার দেখে না এলেই নয়। ভগ্নীপতি বাধা দিয়ে ছিল, তোমার নাচ গানের ক্ষতি হবে, বাবার খবর আমি এনে দিচ্ছি।

কিন্তু নূপুর বেঁকে বসল। দু-বছরের মধ্যে বাবা মাকে দেখে নি, একবার যেতেই হবে তাকে। এখান থেকে এখানে, ক-দিনের মধ্যেই চলে আসবে, নাচ-গানের এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

অগত্যা ভগ্নীপতি কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে গেল তাকে। নূপুরের মাকে বলল, ওকে ছেড়ে তার রুগ্ন স্ত্রী চোখে অন্ধকার দেখবে—তাছাড়া অল ইণ্ডিয়া নাচের কমপিটিশনও এসে গেল বলে, এসময়ে নাচের কামাই মানে নিজের ক্ষতি।

কিন্তু টানা দু-মাসের মধ্যেও নূপুর আর বাড়ি থেকে নড়ার নাম করে না। শেষে মা-বাবা পর্যন্ত যাবার তাগিদ দিতে শুরু করলেন। এই মেয়ের ভবিষ্যতের দিকেই চেয়ে আছেন তাঁরা।

আর শেষে ভালো সত্যি নিজেরও লাগছিল না। অত প্রাচুর্যের মধ্য থেকে এখানে এসে দু-মাসের মধ্যেই হাঁপ ধরে গেছে। তাছাড়া নাচে কামাই হয়ে যাচ্ছে সে জন্যেও দুশ্চিন্তা। এও মনে হল ভগ্নীপতি এই দু মাসও টাকা পাঠানো বন্ধ করেনি, কিন্তু তার কোপে পড়লে এটা বন্ধ হতে পারে। এই দো-টানার সময় বাড়িতে ভগ্নীপতির চিঠি এলো বাবার কাছে। তার স্ত্রীর সংকটাপন্ন অবস্থা, সে আশা করছে এ-সময় কাছে থাকাটা যদি কর্তব্য বিবেচনা করেন, তাহলে নূপুরকে যেন পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

চিঠি পেয়ে বাবা-মা এক রকম ঠেলেই পাঠালেন তাকে। চলনদার জোটানো গেল না। নূপুর একাই রওনা হয়ে গেল। ভয়টাই বা কি, একুশ বছর বয়েস, বাচ্চা তো আর নয়, দিনে রওনা হয়ে দিনে পৌঁছুবে, ভয়টা কিসের!

সাইকেল রিক্‌শয় ভগ্নীপতির বাড়ি যাবার পথে দীপু সরকারের সঙ্গে দেখা। স্থানকাল ভুলে সে রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে গেল। অতএব রিক্‌শ থামিয়ে একটু করুণা বর্ষণের লোভ হল নূপুরের। হেসে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন?

দীপু সরকার বলল, আছি আর কোথায়!

—ছেলে দুটোর পড়াশুনা হচ্ছে তো ভালো?

—ইয়ে, হচ্ছে···তবে মাঝে মাঝে কামাই হয়ে যাচ্ছিল।

প্যাঁচা মূর্তির আরো একটু মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার বাসনা নূপুরের। হেসে বলল, বেশী কামাই করা ভালো না, আর আমার জন্য মোটা-মোটা বই বেছে আনবেন।

দীপু সরকার জানালো আনবে। কামাই আর হবে না।

জ্যাঠতুতো বোন অর্থাৎ ভগ্নীপতির স্ত্রীর অসুখটা সত্যিই বেশি। এখন শয্যা ছেড়ে নামেও না বড়। ভগ্নীপতি আপ্যায়ন জানালো, শালীর নির্দয়তার অনুযোগ করল। নাচ-গানের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছে খবর চলে গেল আবার। রুগ্না স্ত্রী নিজের ঘরে পড়ে থাকল, বাড়ির বাতাসে খুশির ঢেউ উঠল আবার।

তিন সপ্তাহের মধ্যে অবস্থা আরো খারাপের দিকে গড়ালো ভগ্নীপতির স্ত্রীর। দুদিন যাবৎ সঙ্কট চলেছে। রাতের দিকে ভগ্ন হৃদয় ভদ্রলোক সান্ত্বনার তাগিদে নিজের ঘরে ডেকে নিল নূপুরকে। তার হৃতভম্ব চোখের ওপরেই ঘরের দরজা বন্ধ করল। তারপর আকুল হয়ে ওকে বুকে টেনে নিল। বলল, এখন তুমি ছাড়া আর আমার কে থাকল—।

নূপুর কাঠ হয়ে তার বুকের সঙ্গে লেপটে থাকল খানকক্ষণ। শেষে লোকটার হাত আর মুখ বেশি অবাধ্য হয়ে উঠতে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। প্রাণপণে ছাড়াতে চেষ্টা করল নিজেকে। কিন্তু ছাড়া পাবার জন্য ঘরের দরজা বন্ধ করা হয়নি। ঠাণ্ডা বরফের মতো গলা করে ভগ্নীপতি বলল, আপত্তি করলে আমার অন্য উপায় জানা আছে, সেটা তোমার পক্ষে লজ্জার ব্যাপার হবে, কষ্টেরও। চুপ করে থাকো, আজ মন-মেজাজ সত্যি ভালো নেই আমার।

সে তাকে ধাক্কা দিয়ে নিজের শয্যায় এনে ফেলল। আর নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল। নূপুর ভয়ে সিঁটিয়ে গেল আবার। এতদিনের মধ্যে ভগ্নীপতির এমন নির্মম কঠিন পশুমূর্তি আর দেখেনি। এখন শুধু মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে যাবার অপেক্ষা।

কিন্তু ওপরওলা সদয়। ঠিক তক্ষুনি দরজায় ঘন ঘন আঘাত। বাইরে ছোট ছেলের ব্যস্ত গলা।—বাবা তুমি ঘরে কি করছ—দিদিভাই আর জামাইবাবু এসে গেছে, দিদি তোমার খোঁজ করছে—শিগ্‌গীর এসো।

প্রবৃত্তির মূলে যেন কুড়ুলের ঘা পড়ে গেল। ওকে ছেড়ে দিয়ে ভগ্নীপতি শয্যা থেকে নামল। প্রথমে ঘরের আলো নিভিয়ে, তারপর দরজা খুলল। না, বাইরে কেউ নেই। খবরটা দিয়েই ছেলে চলে গেছে।

নূপুরকে বলল, চুপচাপ নিজের ঘরে চলে যাও। এই প্রথম দিনটাই মাটি। কিছু ভেবো না, আবার দিন আসবে।

মুক্তি মেলার পর আত্মরক্ষার তাগিদে পাগল হবার উপক্রম নূপুর ব্যানার্জীর। পরদিনই পালাবার জন্য বোকার মতো সুটকেশ গোছাতে বসল সে। কিন্তু তার ওপর যে বাড়ির আধবয়সী পুরানো ঝি-টার শ্যেনদৃষ্টি আছে জানত না। সে-ই শুধু জামাকাপড় গোছাতে দেখেছে। দশ মিনিটের মধ্যে ভগ্নীপতি ঘরে এসে বলল, কোনো রকম অবাধ্যতা দেখলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এ বাড়ির চৌহদ্দি থেকে আপাতত বেরুনোর চেষ্টাটাও বাতুলতা হবে। আর স্ত্রী বা মেয়ে যদি ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে পারে, তাহলে ওকে তার দূরের এক বাগান-বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

সেই দিনই গোপনে একটা চিঠি পাঠাতে চেষ্টা করল কলকাতার বাড়িতে। কিন্তু তাও পারা গেল না। সেই আধবয়সী পরিচারিকার হাতে ধরা পড়ল। সে উপদেশ দিল, ঠাণ্ডা হয়ে থাক গো মেয়ে—তোমার ভাগ্যি তো ভালই।

ভয়ে ত্রাসে আর হতাশায় নূপুর ব্যানার্জী পাগল হয়ে যাবে বুঝি। মরণকালে লোকে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, দীপু সরকার তো জলজ্যান্ত মানুষ একটা। গল্পের বইয়ের আমদানি আর ফেরত দেওয়াটা অনেক দিন ধরেই দেখছে ঝি-চাকরেরা। এ-ব্যাপারে তাদের কড়াচোখ থাকার কথা নয়। ছিলও না। তাছাড়া বাবুর ছেলেদের হাত দিয়ে বইয়ের আদান-প্রদান। কতগুলো বইয়ের লিস্ট দেবার জন্য কাগজ পেনসিল চেয়ে দীপু সরকারকেই বিপদের বার্তা জানালো নূপুর। তারপর ছেলেকে সঙ্গে করে নিজে মাস্টারের ঘরে গিয়ে বলল, খুব দরকারী কটা বইয়ের লিস্ট আছে এতে, পড়ে দেখবেন।

চলে এলো। ওদিকে লিস্ট পড়ে তো দীপু সরকারের চক্ষু ছানাবড়া। শুধু বিপদের বার্তাই নয়, উদ্ধারের আকুল আকুতি।

বইয়ের মধ্যেই চিঠির আদান-প্রদান চলল ক'দিন। বইয়ের বাহক কর্তাবাবুর ছেলে। সন্দেহের কারণ নেই। দীপু সরকার বার বার লিখছে নিজের জীবন দিয়েও এই বিপদের ফয়সলা করবে। কিন্তু ফয়সলার রাস্তাটাই ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে মুখোশ খুলে ফেলতে সেই আধবয়সী পরিচারিকাটি গল্পের ছেলে নূপুরকে শুনিয়ে রেখেছে, কর্তাবাবু এমনিতেই ঠাণ্ডা মানুষ কিন্তু রাগলে

বাঘ। তার অবাধ্য হবার ফলে সেই কত বছর আগে একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে খুন হয়ে গেছে। পুরুষটা ছিল মেয়েটার দাদা, সে বোনকে রক্ষা করতে এসে এই ফ্যাসাদ। পুলিস কোনো কিনারাই করতে পারল না। নূপুরকে বলেছে, খবর পেয়ে তোমার মা-বাবা দৌড়ে এলেও সুবিধে হবে না বাপু, মাঝখান থেকে তাদের বিপদ ঘনাবে।

নূপুর ভেবেছিল দীপু সরকারের মারফৎ কলকাতায় বাবা-মায়ের কাছে বিপদের খবর পাঠাবে। এ-কথা শোনার পর বুকের ভিতরটা হিম একেবারে।

সাত-আট দিনের মধ্যে ভগ্নীপতির স্ত্রী অর্থাৎ নূপুরের জ্যাঠতুতো বোন মারা গেল। তার তিন দিনের মধ্যে ভগ্নীপতি তাকে বলল সব তো চুকেই গেল, তারপর এখানকার যা-কিছু সবই তোমার।

দীপু সরকারের পরামর্শ মতো নূপুর তখনো হাসতে পেরেছে। আর কটাক্ষবাণে বিদ্ধও করতে পেরেছে একটু। অর্থাৎ আমি হাল ছেড়েছি বাপু।

ভালমানুষ ভগ্নীপতি তাইতে বিগলিত।

দীপু বইয়ের ভাঁজে লিখেছে শ্রাদ্ধের দিন সকাল থেকে সর্বদা এক বস্ত্রে বেরিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত থেকো।

সেই সকাল থেকেই নূপুরের বুক ঢিপ ঢিপ।

সকলে ব্যস্ত সেদিন। বিরাট আয়োজন, দানসাগরের অনুষ্ঠান চলেছে। কাজ ভগ্নীপতিই করছে। অতএব সেও ব্যস্ত। বাইরে সামিয়ানা টাঙিয়ে উদাত্ত কণ্ঠের মাথুর পালা জমে উঠেছে। সকলে আহা-আহা করছে। ফটকের দারোয়ান দুটোও এক কোণে জায়গা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে।

ভগ্নীপতির ছোট ছেলে এসে খবর দিল, আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের বাড়ি থেকে গাড়ি করে মেয়েরা এসেছে, মাস্টার মশাই সেই গাড়িতে বসে আছে, তোমাকে 'ঘোমটা' বইটা নিয়ে এক্ষুনি একবার যেতে বলেছে।

নূপুরের বুকের তলায় ঠক-ঠক কাঁপুনি। কিন্তু প্রাণের দায়ে মাথা সাফ। বুঝল তক্ষুনি। ঘোমটা নামে কোনো বই তার কাছে নেই। বলল, আচ্ছা যা, কোথায় যে রাখলাম, খুঁজে নিয়ে যাচ্ছি।

ও সরতেই থমকে ভাবল দুই-এক সেকেণ্ড। একটানে বড় স্যুটকেশটা খুলে ঝকমকে একটা শাড়ি বার করল। ভগ্নীপতির দেওয়া এই জবরজং শাড়িটা আগে আর পরেনি। এক মিনিটের মধ্যে সেটা পরে নিল। স্যুটকেশের বটুয়ায় গয়নাগুলো শুধু রেডি করা ছিল, যদি নেবার ফুরসৎ মেলে। সেটাও তুলে নিল। তারপর তরতর করে নিচে নেমে আসতে আসতে মাথায় একটু

বড় করে ঘোমটা টেনে দিল।

হ্যাঁ, সকলের চোখের ওপর দিয়েই মণ্ডপ পেরিয়ে ফটকের এধারে এলো। কেউ কেউ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, মাস্টারমশায় যে গাড়িতে করে মেয়েছেলেদের নিয়ে এসেছে সেই গাড়িতেই ঘোমটাপরা একটি বউ উঠে চলে গেল।

গাড়ি সোজা বাজারের কাছে এসে থামল। সেখানে কয়েকটা প্রাইভেট ট্যাকসি দাঁড়িয়ে। নেমে গাড়িটাকে বিদায় করা হল।

তিনবার ট্যাকসি বদল করে কলকাতায়। অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল দীপু সরকারের। চাকরিটিও খোয়াতে হল সেই সঙ্গে। কারণ আবার তমলুকে ফেরা মানেই প্রাণটি দেওয়া।

চারদিন বাদে উদার ভগ্নীপতি একজন অচেনা লোক মারফৎ নূপুরের প্রকাণ্ড স্যুটকেশটা কলকাতার বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে তার বাবার কাছে চিঠি—স্ত্রীর কাজের দিন তার মেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। আশা করা যায়, সে কলকাতার বাড়িতেই গেছে। ওর মতো মেয়ের দায়িত্ব সে-ও আর নিয়ে উঠতে পারছিল না। ভালই হয়েছে নিজে থেকে চলে গেছে। ওর জামাকাপড়ের বাক্সটা পাঠিয়ে দেওয়া হল।

চিঠি পেয়ে বাবা রেগে আগুন। দেবতুল্য জামাই এ কথা লেখে কেন? কিন্তু মা-কে নূপুর মোটামুটি বলে রেখেছে। বাবাকে সেই ভদ্রমহিলা ধমকে থামিয়েছে। কিন্তু খরচ বন্ধ হল বুঝে মাথায় আকাশও ভেঙেছে।

সোমেন মিত্তির হাসলেন।—সেই থেকে বেশি টাকা রোজগারের আশায় সিনেমা লাইনে ঘোরাঘুরি আর কৃচ্ছ্রসাধন?

—হ্যাঁ। আর সেই থেকে নূপুরের মনে মনে আশা ছবির নায়িকা হবে। কলকাতার এক বন্ধু আমাকে মোহন চৌধুরীর সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছিল।

সোমেন মিত্তির মনে মনে চিন্তা করে নিলেন কি। জিজ্ঞাসা করলেন, নূপুরকে নিয়ে একবার লোকানন্দ বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করবে?

—লোকানন্দ! ও, বিদিশার সেই বড়ুয়া সাহেব! তার নাম লোকানন্দ?

সোমেনবাবু মাথা নাড়লেন।

—তার সঙ্গে দেখা করে কি হবে?

—ঠিক বুঝছি না। কাল অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হল। বিলেতফেরত সার্জন, গোয়ায় প্র্যাকটিস করত···মনে হয় বেশ টাকাকড়ি হাতে আছে। সে-ই দেখা করতে বলেছে।

—আমাকে?

সোমেনবাবুর হাসি পেয়ে গেল। না, নূপুরকে। তা তুমি সঙ্গে থাকলে খুব অসন্তুষ্ট হবে না বোধ হয়।

—আমাদের অবস্থা জেনেও আপনি হাসছেন দাদা! দীপু সরকার ক্ষুব্ধ একটু। বিলেতফেরত সার্জন হোক আর যাই হোক, ও-ব্যাটার চোখ কোন দিকে আমি গোড়া থেকেই জানি। ও আরো ডেঞ্জারাস মানুষ, আমরা এতগুলো লোক দেখেও বলে কিনা আমাকে জানলা গলিয়ে নিচে ফেলে দেবে। এখন আবার কেন দেখা করতে বলেছে সেও আপনার ভালই জানা আছে। তপতপে কড়া থেকে এখন আবার গনগনে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাই আর কি!

দীপু সরকার যা বলল, বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসলে তা মিথ্যে মনে হয় না। কিন্তু ভিতর থেকে ঠিক সায় মিলছে না। অনেকটা নিজের মনেই বললেন, তা না-ও হতে পারে হে······কাল রাতে লোকটার সঙ্গে অতক্ষণ কাটিয়ে সাধারণ পাঁচজনের মতো মনে হয়নি তাকে···অদ্ভুতই লেগেছে। ভদ্রলোকের জীবনে বড়রকমের ঘটনা আছে কিছু। গা-ঝাড়া দিয়ে আত্মস্থ হলেন যেন। ঠিক আছে, এখন যেতে হবে না, আমি ভেবে দেখি একটু। কাল-পরশুর মধ্যে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে হয়তো, তুমি দিন পাঁচ-সাত পরে এসো।

॥ পাঁচ ॥

মাঝে দুটো দিন গেল। সন্ধ্যা পার হলেই সোমেন মিত্তিরের ভিতরটা বিদিশার দিকে ছোটাছুটি শুরু করে। তৃতীয় সন্ধ্যায় ঘরে আর থাকাই গেল না। তবু আটটায় অর্থাৎ একটু দেরি করেই বেরিয়ে পড়লেন। বিদিশায় পৌঁছুতে সাড়ে আটটা হবে। লোকানন্দ বড়ুয়ার আসতে একটু দেরি হয় এক-একদিন। সেখানে গিয়ে বোকার মতো একলা বসে থাকার মানে হয় না। ও-সময় নির্দিষ্ট টেবিলে তাকে পাবেন আশা করছেন।

পেলেন।

দূর থেকে দেখেই দরাজ হাসির অভ্যর্থনা জানালো। শেষ দেখা রাত সাড়ে এগারোটার সেই হঠাৎ অসহিষ্ণু উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ যেন আর কেউ। কাছে যেতে প্রসন্ন আহ্বান। আসুন, এত দেরি?

মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসে সোমেন মিত্তির হাসি মুখেই ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যেন জানতেন আমি আসব?

অল্প অল্প মাথা নেড়ে একটু একটু হাসতে লাগল। এই হাসি আর এই চাউনি

শুধু সুন্দর নয়, বুদ্ধিদীপ্তও।—ইয়েস স্যার, বিইং অ্যান অথর, ৩৬ আর লাইফ্‌লাং টু রান আফটার র-মেটিরিয়ালস্।

অদ্ভুত লাগল জবাবটা। এ যেন অতি সহজে সোমেন মিত্তিরের ভিতরের অভিলাষটা টেনে বার করে তাঁকেই দেখিয়ে দিল। নিজের গরজে হেসে প্রায় সায়ই দিলেন সোমেনবাবু। আপনি তাহলে নিজেকে র-মেটিরিয়াল ভাবেন?

—এতদিন ভাবিনি, সেদিন রাতে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পর থেকে ভাবছি। উৎফুল্ল ভ্রূকুটি একটু, এতকাল আমার কাছে আপনাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না মশাই, থাকলে একটা রোগ সারানো যেত বোধ হয়· ·অ্যাণ্ড কুড হ্যাভ সেভ্‌ড এ লট অফ ট্রাবলস।

না বোঝার ভান করলেন সোমেন মিত্তির।—এফ, আর, সি-এস, সার্জনের রোগ?

—ইয়েস স্যার। এ সার্জন ক্যান নট অপারেট হিমসেলফ অ্যাণ্ড টোয়াইস আই ফেইলড টু গেট সেফ হ্যাণ্ডস—আই ডেয়ারড নট ট্রাই প্রাইস। তার পরেই হেসে সোমেনবাবুর কৌতূহলে জল ঢেলে দিল যেন। বাট ওয়েট সার, দি নাইট ইজ স্টিল ইয়ং। কি দেবে আপনাকে, বীয়ার?

টেবিলে আজ একটাই গেলাস। আগে এলে একসঙ্গে বেশি নেবার দরকার হয় না। এটা কত নম্বর গেলাস জানেন না। মুখ আর চোখ দেখে দুই কি বড জোর তিন নম্বরের বেশি মনে হয় না। সোমেনবাবু বললেন, আপত্তি নেই, কিন্তু আজ আমি স্ট্যাণ্ড করলে কেমন হয়?

—আমার ড্রিংক-এর খরচ দেবেন! অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনল যেন। এ দেশের লেখকদের অনেক টাকা নাকি? ভালো স্কচ ছাড়া আমার চলে না, গেল সপ্তাহে শুধু ড্রিংক-এর বিল পেমেণ্ট করেছি সতেরশ টাকা।

শুনে চক্ষুস্থির সোমেনবাবুর। এত খান কেন?

—খাই কোথায়, আই জাস্ট ড্রাউন মাইসেলফ। বাট বিলিভ মি, আই হেট ড্রিংকস। যেতে দিন, আমার অঢেল আছে, আপনার চক্ষুলজ্জার কারণ নেই। বয়কে ডাকতে গিয়েও কি মনে পড়তে তাঁর দিকেই ফিরল আবার।—হোয়াই নট ইন মাই রুম? আপনার খুশি হবার মতো কিছু দেখাতে পারি। এ গুড আইডিয়া, আসুন—

জবাবেরর অপেক্ষা না রেখে গেলাসের সবটুকু এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়াল। মোটা ব্যাগটা হাতে তুলে নিল।

সোমেনবাবু সানন্দেই সঙ্গ নিলেন।

বড় বড় পা ফেলে ম্যানেজারের কাছে এসে হুকুম করল, এক বোতল স্কচ, দু বোতল বীয়ার, কিছু সোডা অ্যাণ্ড প্লেন্টি অফ আইস—ইন মাই রুম প্লীজ।

বেরিয়ে এসে সোমেনবাবুকে সঙ্গে করে করিডোর পেরিয়ে তিন-তলায় উঠে গেল। আবার একটা ছোট করিডোরের শেষ মাথায় তার স্যুইট। সতের নম্বর ঘর। খুব ছোটও নয় আবার খুব বড়ও নয়। মেঝেতে পুরু গালচে বিছানো, আসবাবপত্র সাজানো গোছানো। দেয়ালঘেঁষা গদির শয্যা, অ্যাটাচ্ড বাথ। এদিকে মুখোমুখি বসার দুটো ফোমের চেয়ার, মাঝে বড় সড় শৌখিন সেণ্টার টেবিল। তার ওপর টেলিফোন।

ঘর বন্ধ থাকলেও টিউব-লাইট জ্বালাই ছিল। ভিতরে ঢুকে আগে একটা চড়া টিউব লাইট জ্বালল লোকানন্দ বড়ুয়া। দিনের মতো শাদা হয়ে গেল ঘরটা। পাখা নিষ্প্রয়োজন কারণ সমস্ত তিন-তলাটাই এয়ার-কণ্ডিশণ্ড।

—বসুন।

হাতের মোটা ব্যাগটা শয্যার পাশে রাখল। গায়ের ঢোলা শাদা কোর্তাটা খুলে বিছানার ওপরেই ছুঁড়ে দিল। দামী টেরিকট টেরিলিনের ট্রাউজার আর জামায় ভদ্রলোকের বয়েস এখন আরো কম দেখাচ্ছে।

সামনের চেয়ারে এসে বসল। সহজ নির্বিকার উক্তি, বলল, এখানেই জমিয়ে বসা যেতে পারে, মেয়েটাই আর আসছে না···বার-এ বসে কি হবে!···এরপর এখানেই বা আর কতদিন থাকতে ইচ্ছে করবে জানি না।

মেয়েটা বলতে নূপুর ব্যানার্জী। সোমেন মিত্তির ভালো করে লক্ষ্য করছেন। কিন্তু কেন যেন একথা শোনার পরেও প্রবৃত্তির কদর্য দিকটা চোখে পড়ছে না।

লোকানন্দ বড়ুয়া ফোন তুলে নিল। অপারেটরের কাছে নম্বর চাইল একটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সাড়া পেল।—ডক্‌টর বড়ুয়া দিস সাইড···গুড ইভনিং মিসেস সমাজদার, লাকি আই গট ইউ! লিসন, আজ রাতে আসার কথা ছিল তো?···বাট প্লীজ নট টু-নাইট, আমি আজ একজন নামী সাহিত্যিকের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় বসে গেছি···ও ইয়েস, এ গ্র্যাণ্ড ডাইভারশন···আই উইল সী ইউ টুমরো অর ডে আফটার···ও ডোণ্ট ওয়ারি, দ্যাটস অলরাইট·· থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ, ইউ আর সো স্যুইট ম্যাডাম—গুড নাইট।

রিসিভার নামালো।

রাত্রিতে এখানে একটি-দুটি মহিলার আগমনের কথাটা দীপু সরকার বলেছিল মনে পড়ল সোমেনবাবুর। ভিতরের প্রবৃত্তির দিকটা এবার যেন উদ্ঘাটনের মুখে। আবার এও ভাবছেন সেটা তেমন বড় হলে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট বাতিল না করে

াকেই বিদায় দেওয়ার কথা।

সহজভাবেই বললেন, কারো আসার কথা ছিল···আপনার অসুবিধে করলাম দেখছি।

জবাবে ওই উক্তিই করল, অসুবিধে হলে কারো আসা বন্ধ করে আপনাকে রে রাখব কেন? অ্যাট প্রেজেন্ট আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড ইন ইউ সার, আই ান্ট নো হোয়াই··রাদার স্ট্রেঞ্জ।

—কি দেখাবেন বলছিলেন?

—ও ইয়েস, দেখে আপনি খুশি হবেন।

সোফা ছেড়ে উঠতে গিয়ে বাধা পড়ল। জানান দিয়ে দুটো বেয়ারা ঘরে ঢুকলো। তাদের হাতে স্কচ, বীয়ার, সোডার বোতল, বরফ বোঝাই পাত্র, ঢের ভশে বাদাম শশা টোমাটো পোটাটা চীপস। বড়ুয়া সাহেবের নির্দেশে ট্রে আর গ্লাস সেণ্টার টেবিলে রাখা হল, বোতলগুলো মাটিতে। টেলিফোনটা তুলে নজেই বিছানার ওপর রেখে টেবিলের জায়গা বাড়ালো। জিজ্ঞাসা করল, খাবার তো কিছু বললাম না, আই ডোণ্ট রিকয়ার, আপনাকে কি দেবে?

—কিছু না। বাড়িতে বলে আসিনি··

চোখের ইশারায় বেয়ারা দুটো চলে গেল। তার দিকে ফিরে লোকানন্দ বড়ুয়া হাসল এবার। ইউ হ্যাভ এ সুইট হোম দেন··ইজ্‌ন্ট ছাট? স্ত্রী আছেন নিশ্চয়?

—আছেন।

ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করল, দেখতে ভালো?

সোমেনবাবু হেসে ফেললেন, বললেন, বয়েস হয়েছে, এখন আমি ছাড়া আর কেউ তেমন ভালো দেখে না। আসুন না একদিন—

হাসিতে মুখ ভরাট লোকটারও। এই হাসি সুন্দর তো বটেই, সরলও। বলল, নিশ্চয় যাব—গেলে নিজের হাতে রেঁধে আমাকে খেতে দেবেন?

—দেবেন। পানের সরঞ্জাম দেখিয়ে হাসলেন।—কিন্তু এসব দেবেন না।

—আই হেট দিজ। তেমনি উৎসুক। আর কে আছে—ছেলে মেয়ে?

—দুই-ই আছে।

—দে লাভ ইউ ডিয়ারলি?

সোমেন মিত্তিরের মনে হল, এটুকু কৌতূহলের মধ্যেও যেন প্রাণের আবেগের স্পর্শ আছে। জবাব দিলেন, মনে তো হয়··।

হাসছে অল্প অল্প। একটা বীয়ারের বোতল খুলে নিজেই গেলাসে ঢেলে

গেলাস আর বোতল তাঁর সামনে রাখল। হুইস্কির বোতল খুলে নিজের গেলাসে বেশ খানিকটা ঢেলে নিল। গেলাসে সোডা মেশাতে মেশাতে বলল, আপনার লেখা থেকেই মনে হয়েছে, ইউ আর এ হ্যাপি ম্যান অ্যাণ্ড ইউ ওয়াণ্ট টু সি আদারস হ্যাপি ট্যু। স্যুয়েট আই হ্যাভ এগেন ফরগটন—

উঠে শিয়রের কাছের বুক-সেলফ্ থেকে পাঁচ-পাঁচটা বই টেনে বার করল। বুক-সেলফ্টা আগেই চোখে পড়েছিল সোমেনবাবুর, সবগুলোই মোটা মোটা ডাক্তারি বই-এ ঠাসা ভেবেছিলেন। কিন্তু হাসি মুখে লোকানন্দ বড়ুয়া বইগুলো তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিতে তিনি সত্যিই অবাক। পাঁচটাই তাঁর লেখা উপন্যাস। তার মধ্যে শুধু একখানা ছাড়া কোনোটাই খুব নামী উপন্যাস নয়।

—কিনলেন নাকি এগুলো?

সোফায় বসে গেলাস হাতে তুলে নিয়ে মাথা ঝাঁকালো!—ওই রাতে অতক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প করার পর হঠাৎ একটু সাহিত্য চর্চার ঝোঁক চাপল। সকালে বেরিয়ে হাতের কাছে আপনার যে কখানা বই পেলাম কিনে ফেললাম। তারপর এ দু'দিন ভ্যাগাবন্ডাইজিং ছেড়ে এর মধ্যে চারখানা বই পড়েও ফেলেছি—আর একখানাও ধরেছি।

সোমেনবাবুকে অবাক করতে পেরেই যেন 'চীয়ার্স' বলে গেলাসে লম্বা চুমুক লাগালো একটা। তারপর স্পষ্ট মন্তব্য করল, বাংলা নভেল এর আগে কখনো পড়েছি বলে মনে পড়ে না, মেণ্টাল মেক-আপ-এর অভাব।...আর বাইরে বাইরে কাটানোর ফলে সময়ও হয়নি সুযোগও হয়নি।.. দেশের স্কুলে পড়তে বাংলা আমার খুব প্রিয় সাবজেক্ট ছিল, অলওযেজ গট হাই মার্কস, নইলে এতদিনে এই ল্যাংগুয়েজই আমার ভুলে যাবার কথা। কিন্তু দিব্বি পড়ে গেলাম।...মন্দ লাগল না, কিন্তু ওই যে বললাম, পড়ে মনে হল আপনি সুখী মানুষ, জটিল যুগের খুব বেশি খবর রাখেন না।

সোমেন মিত্র ভিতরে ভিতরে একটু আহতই হলেন। নাম হওয়ার পর থেকে বিপরীত মন্তব্য শুনেই অভ্যস্ত। তবু হেসেই বললেন, কম সময়ে আমাদের লেখাও অনেক লিখতে হয়, আমার বরাতে আপনার সিলেকশন খুব ভালো হয়নি.. এগুলোকে আমি নিজেই তেমন উঁচুদরের লেখা বলে মনে করি না। যে বইটার কিছু নাম আছে সেটা তুলে দেখালেন।—এটা পড়েছেন?

ঝুঁকে দেখে নিল।—হ্যাঁ, অন্যগুলোর তুলনায় ওটা মোটামুটি ভালই। স্টিল আই এক্সপেকটেড মোর রাইট।...এভরিথিং ইজ সো রিয়েল, আই ফাইণ্ড নাথিং আনকমন।

—আনকমন বলতে···কি চান? অবাস্তব কোনো চরিত্র বা ঘটনা?

দু-চারটে বাদাম তুলে নিয়ে চিবুতে লাগল। নিজের লালচে চুলের ঝাঁকে হাত চালালো একবার।—অবাস্তব ইজ নট দি এগজাক্ট ওয়ার্ড।·· হোয়াট আই মীন ইজ পারহ্যাপস এ সর্ট অফ অ্যাবসার্ড লাইফ-স্টোরি—রিয়েল বাট অ্যাবসার্ড!

শোনার সঙ্গে সঙ্গে সোমেন মিত্তির ভিতরে ভিতরে সজাগ একটু। অভ্যস্ত ষষ্ঠ অনুভূতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আপাত পরিত্যক্ত ছবির গল্প সম্পর্কে আগ্রহ থাকলে কেবল সেটাই অর্থাৎ 'পসরা' বইখানাই কেনা এবং পড়া হ'ত। হঠাৎ এতগুলো বই কিনে পড়ে ফেলার উদ্দেশ্য আর যাই হোক ছবির গল্পের মান যাচাই নয়। তাহলে?

···তাহলে যে আগ্রহ নিয়ে সোমেনবাবুর এই লোকের ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে আসার চেষ্টা, এরও তাঁর প্রতি তেমনি কোনো আকর্ষণের অজ্ঞাত কারণ ঘটেছে। আজও বার-এ দেখা হতে বলেছে, তিনি আসবেন জানাই ছিল, কারণ লেখকরা ব মেটিরিয়ালের পিছনে ছুটেই থাকে আর বলেছে, এতকাল তার কাছে লেখকদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, থাকলে একটা রোগ সারানো যেত—কুড হ্যাভ সেভ্‌ড এ লট অফ ট্রাবলস। আরো কিছু বলেছে যা তখন দুর্বোধ্য মনে হয়েছে সোমেনবাবুর। এখনো স্পষ্ট নয় কিছুই, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যে তাঁকে নিয়ে এই লোকের মাথার মধ্যে কিছু একটা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। সেই কারণেই হঠাৎ এতগুলো বই কিনে ফেলা আর দু-দুটো দিন ঘর ছেড়ে না বেরিয়ে ধৈর্য ধরে পড়ে ফেলা।

বীয়ারের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সোমেনবাবু তাকে শুনিয়ে তার কথা-গুলোরই পুনরুক্তি করে নিলেন একবার, অ্যাবসার্ড লাইফ স্টোরি···রিয়েল বাট অ্যাবসার্ড! হেসে নিজের দুর্বলতা স্বীকারই করে নিলেন যেন।—দেখুন, লোক-চরিত্র সম্পর্কে আমার জ্ঞান-গম্যির গণ্ডীটা সত্যিই খুব বড় না—সেরকম দেখিওনি শুনিওনি—অথচ আপনি যা বললেন খুব ভালো লাগছে।·· দুই-একটা নজির যদি মনে আসে বলুন না শুনি?

ভিতর থেকে একটা অসহিষ্ণু অভিব্যক্তি যেন ঠেলে উঠল হঠাৎ। সেটা ফিরে আবার তল করার জন্যেই যেন গেলাস হাতে উঠল। সবটুকু জঠরস্থ করে গেলাস নামালো। শরীরটাকে একবার ঝাঁকিয়ে চাঙ্গা করে নিতে চাইল বোধ হয়। হুইস্কির বোতল তুলে নিল আবার। গেলাসের মুখে উপুড় করল। এবারের মাপটা আরো একটু বড় ছাড়া ছোট নয়। বার-এ সোমেনবাবু তাকে সাত পেগ পর্যন্ত খেতে দেখেছেন। আজ তিনি আসা পর্যন্ত সেখানে তিন পেগ যদি হয়ে

থাকে তবে এখানে দুবারের মাত্রাতেই বাকি চার পেগ হয়ে গেল বলে অনুমান, ···আইস কনটেনার থেকে গেলাসে কয়েক টুকরো বরফ ফেলা হল। সোডা ঢালা হল।

সোমেনবাবু চুপচাপ দেখছেন।

—আপনার সেই হিরোইন, আই মীন নূপুর ব্যানার্জির খবর কি?

প্রসঙ্গ বদলে সাহিত্য-প্রসঙ্গে ছেদ টানা হল বুঝতে পারলেন।—ছবি বন্ধ হওয়ায় খুব মুষড়ে পড়েছে শুনলাম। কান্নাকাটিও করেছে নাকি···।

—সিলি! তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন—কি হল?

—তার সঙ্গে দেখা হয়নি। দীপু সরকারকে বলে দিয়েছি।

—নিয়ে আসবে?

সোমেন মিত্তির মাথা নাড়লেন।—বোধ হয় না।

—কেন?

বিব্রত মুখ করে সত্যি জবাবটাই দিয়ে বসলেন।—যা পোড়খাওয়া ছেলে·· হুট্ করে আপনাকেই বা বিশ্বাস করে কি করে বলুন!···বলছিল তপ্ত কড়া ছেড়ে এখন গনগনে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাই আর কি!

প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন সোমেন মিত্তির। সুরার প্রতিক্রিয়ায় মুখ লালচে দেখাচ্ছে এখন একটু। চোখের পাতাও ভারী হয়ে আসছে। একথা শোনার পর আবার একটা অসহিষ্ণুতা ঠেলে উঠতে চাইল যেন।—ইনট্রিগিং র‍্যাসকেল! সী উইল বি এগেন ইন দি হাওস অফ ওয়ান অফ দোজ শার্কস আই টেল ইউ—হি কাণ্ট প্রোটেকট হার।

সমস্ত মুখ বিরক্তিতে ছাওয়া। গেলাস তুলে আবার একটু চুমুক দিল। দু'টুকরো শশা চিবুলো। তারপর কয়েকটা বাদাম। মাথাটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে রইল খানিক। মিনিটখানেক বাদে মাথা তুলে সোজা হল আবার। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মুখ। সোমেনবাবুর মুখের দিকে তাকালো। দুই ভুরুর মাঝে কুঞ্চনরেখা পড়ল একটা দুটো।—আচ্ছা মিস্টার অথর, আমার সম্পর্কে আপনার নিজের ধারণাটা কি রকম?

মানুষটাকে অনাবৃত করে দেখার এ-ই যেন বড় সুযোগ। কোনো প্যাঁচ-ঘোঁচের ধার ধারেন না এমনি মুখখানা করে তিনিও চেয়ে রইলেন খানিক। বললেন, আমি এখনো অ্যাবসার্ড লাইফ স্টোরির কিছু নজির শোনার অপেক্ষায় বসে আছি··রিয়েল বাট অ্যাবসার্ড···সেটা না শোনা পর্যন্ত ঠিক ঠিক বলতে পারছি না।

চাউনিটা মুখের ওপর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। অভিজ্ঞ সার্জন রোগীর কোনো গোপন উপসর্গের মূল খুঁজছে যেন। দেখা হল। বিমনা একটু। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে বড় জানালাটার কাছে গেল। চুপচাপ নিচের দিকে চেয়ে রইল খানিক। ফিরল। সেখান থেকেই সোজা তাকালো আবার। ক্ষোভ বা বিরক্তি নেই, কিন্তু দৃষ্টি গভীর। নিজের সোফার পিছনে এসে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে বলল, ইউ আর ক্লেভার সার।...ইয়েস আই ওয়ানটেড টু টেল ইউ সামথিং ··অ্যাণ্ড ছাট'স মাই ডিভিজ।

দেয়ালের সুইচ-বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। সুইচ টিপে পর পর ঘরের দুটো বড আলোই নিবিয়ে দিল। অন্ধকারের ধাক্কাটা ভালো করে লাগার আগেই নীল আলো জ্বলে উঠল একটা। খুব ফিকে মিষ্টি নীল। মুহূর্তের মধ্যে ঘরের বাতাসও বদলে গেল যেন। রহস্যছোঁয়া নীলাভ প্রশান্তি একটা।

লোকানন্দ বড়ুয়া নিজের সোফায় এসে বসল।

॥ ছয় ॥

এই পৃথিবীতে উনিশশ উনতিরিশ সালের এক অদ্ভুত আগন্তুক আমি লোকানন্দ বড়ুয়া। শুনেছি সেটা অপয়া বছর। দেশজোড়া ইকনমিক ডিপ্রেশন, ট্রেড ডিপ্রেশন আর শিক্ষিত বেকার ছেলেদের হাহাকারের বছর সেটা। অপয়া যে তার সব থেকে জ্যান্ত নজির আমি—শ্বাস-ওঠা মায়ের পেট চিরে আমাকে ভূমিষ্ঠ করানো হয়েছে। আমার জন্মের আগে থেকে মায়ের জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান আর হয়ও নি। পৃথিবীর মুখ দেখতে হলে শুধু মা নয় বাবাও একজন দরকার। শুনেছি আমারও বাবা ছিল একজন। আমি আসার পনের দিন আগে ঝড়ে নৌকোডুবি হয়ে কর্ণফুলীর জলে তার দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবু আমি নির্বিঘ্নে আসতে পেরেছি, এই পৃথিবীর আলোবাতাসের মুখ দেখেছি। আমার জানতে ইচ্ছে করে সেই বছরে সেই মাসে সেই দিনে আর সেই মুহূর্তে আরো কত লোক জন্মেছে আর তাদের কি হয়েছে! জানার উপায় নেই।

সেই চাটগাঁয়েই কাকা-কাকিমার কাছে মানুষ আমি। কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে হত মানুষের খোলসের মধ্যে আমি অদ্ভুত জীব একটা। কাকা আমাকে ভালবাসত খুব। কিন্তু তার ওপর আজও রাগ আমার। কারণ অনেক ভেবেচিন্তে অনেক মাথা ঘামিয়ে লোকানন্দ নামটা নাকি সে-ই রেখেছিল।

আচার আচরণে কাকা খাঁটি বৌদ্ধ। সেখানকার কলেজের পালি প্রোফেসার সে। অনেক জায়গাজমির মালিক। সে-মালিকানার ভাগ আমারও ছিল কিনা সে প্রশ্ন কখনো ওঠেনি। তার দুই ছেলে আর দুই মেয়ে সকলেই আমার থেকে ছোট। সকলে আমাকে বাড়ির বড় ছেলে ভাবে। ফাঁক পেলে কাকা আমাকেই ডেকে ভালো ভালো উপদেশ দেয়। তথাগতের দুঃখনিবৃত্তির অষ্টাঙ্গ-বাণী কানে দেয়। সৎ চিন্তা, সম্যক দৃষ্টি, সৎ সঙ্কল্প, প্রিয়ভাষণ, সদাচরণ; সর্বজীবে অহিংসা, সংযম আর আত্মিক সাধনের মহিমা ব্যাখ্যা করে। নিয়মিত উপাসনায় বসা হয়, প্রচুর ধুপধুনো জ্বলে, গুমগুম চমরির ঢোল বাজে, ঢিমেতালে ঝাঁঝর বাজে। পাঁচ বছর বয়েস থেকে উপাসনার সময় কাকার পাশে আমাকেও গিয়ে বসতে হয়। মন দিতে পারলে ভিতরটা বেশ ভরাট লাগত।

কিন্তু কাকার থেকে ঢের বেশি ভালো লাগত আমার চাটুজ্জে জেঠুর কথা শুনতে। কাকার প্রাণের বন্ধু কিন্তু কাকার থেকে অনেক বড বয়সে। বাবাকেও নাকি খুব ভালবাসত চাটুজ্জে জেঠু। অনুভব করতে পারতাম সেই ভালবাসা আমাকে ঘিরে আছে। কাকার থেকেও চাটুজ্জে জেঠুকে বেশি পছন্দ করতাম। দেশে-বিদেশে মশলা চালানের মস্ত কারবার তার। টাকাপয়সার ছডাছড়ি, কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই যে বাইরে থেকে বোঝা যাবে। সেই ভদ্রলোকের অন্যরকম কথা। পাপ আছেই, থাকবেও। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে পাপ। সোজা রাস্তা হল সেটা কবুল করে ফেলা। নিজেকে শুনিয়ে নিজের কাছে কবুল করা, বিশ্বস্ত আপনার জনের কাছে কবুল করা, যার ধ্যান করিস তার কাছে কবুল করা। দোষ পুষে রাখলি তো মরলি। বলে ফেলবি স্বীকার করে ফেলবি, দেখবি ভেতর-বার ঝকঝকে পরিষ্কার।

অন্যায় করলে এই কবুল করা, বা স্বীকার করার নেশা আমার অস্থিমজ্জায়। কবুল করে ফেলার পর শান্তি স্বস্তি। আর সেটা না পারা পর্যন্ত ভিতরে একটা বাতাসের অক্টোপাস যেন টুঁটি চেপে ধরে থাকে। পরে কোথায় পডেছিলাম কনফেশন অফ সীন কামস্ ফ্রম দি অফার অফ মারসি। আমার কাছে মারসি বলতে শান্তি। ভিতরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। ওই কথাগুলোর মধ্যেও যেন সেই শান্তি আর মুক্তির সন্ধান।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকে আমার যা চরিত্র, কত কনফেস করব, কত কবুল করব? আর সেটা করার মতো বিশ্বস্ত জনই বা সর্বদা পাব কোথায়? আমার মধ্যে দুই বিপরীত সত্তা। একটা স্বাভাবিক বুদ্ধি স্বাভাবিক মায়া-মমতায় জডানো। অন্যটা একেবারে উল্টো। অন্ধ নিষ্ঠুর সর্বধ্বংসী—কোন যুক্তির ধার

ধারে না।…একটা পাখির বাচ্চা গাছ থেকে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে, আমি সেটা হাতে তুলে নিয়েছি। আমার বয়েস তখন এগারো-বারো। কি নরম আর কি সুন্দর পাখির বাচ্চাটা, ওটার বুকের ধুকপুকুনি আমার আঙুলের ডগায় তিরতির করে লাগছে। ভিতরটা দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল, শেয়াল কুকুরের মুখ থেকে বাঁচিয়ে কোথায় রাখব এটাকে! হঠাৎ ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, দে আছাড় মেরে শেষ করে। ভিতরের আর এক সত্তা আর্তনাদ করে উঠল, না না না না!

…কিন্তু যা হবার ততক্ষণে হয়ে গেছে। পাখির বাচ্চাটা চৌচির হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সাইকেলে চাপা পড়া একটা কুকুর বাচ্চাকেও শুশ্রূষা করতে করতে হঠাৎ ওইভাবে শেষ করে দিয়েছিলাম। পরে যন্ত্রণায় দমবন্ধ হয়ে আসতে এসব স্বীকার করার তবু লোক মিলেছে। আমার কান্না দেখে আর কষ্ট দেখে চাটুজ্জে জেঠু হেসেছে। বলেছে, এই বয়সে এরকম দুর্মতি অনেকেরই হয়, তুই কষ্ট পেলি কবুল করলি—তোর মন পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু ওই বয়েস থেকে আমার মধ্যে আরো যেসব দুর্মতি দানা বেঁধে উঠছে সেসব কবুল করার লোক পাব কোথায়? সেই গোপনতা ফাঁস হলে আমার অস্তিত্বই বা থাকবে কেমন করে? মেয়েছেলে আমার কাছে তখন থেকেই একটা রহস্যের মতো। লোকে জন্মায় কেন, কি করে জন্মায়। কে যে বলে দিত, এর উত্তর আছে মেয়েছেলের দেহে! সুযোগ সুবিধে পেলে ছোট ছোট মেয়েগুলোকে ধরে আমি যেন চিরে চিরে বিশ্লেষণ করতে চাইতাম। নিজের খুড়তুতো বোন দুটোও এজন্যে ভয় পেত আমাকে। ছোটদের ছেড়ে স্বাভাবিক-ভাবেই বড় মেয়েদের দিকে চোখ গেছে তারপর। ওদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেখার নিষ্ঠুরতা আমাকে পেয়ে বসছে। অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে দেখলে পেট ফালা-ফালা করে দেখতে ইচ্ছে করে কি আছে! কিন্তু এ সবের ফলে নিজের ভিতরের বিপরীত যন্ত্রণাটাও কম নয়। এর থেকে মুক্তি পাব কেমন করে? কার কাছে কবুল করব সব? যখন অসহ্য লাগত ছুটে কর্ণফুলীর ধারে চলে যেতাম। একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে নদীর জলের দিকে চেয়ে প্রায় চেঁচিয়েই ভিতরের পাপ উজাড় করে দিতাম—আমি এই-এই করেছি—এই-এই ভেবেছি।

হ্যাঁ, তাতেই যেন অনেক শান্তি, অনেক স্বস্তি।

আশ্চর্য, সব সত্ত্বেও এই আমি লোকানন্দ ষোল বছর বয়সে স্কলারশিপ পেয়ে ম্যাট্রিক পাস করলাম। আমার চারপাশের সকলে আমার মধ্যে একটা ভারী ভালো ছেলেকে আবিষ্কার করে ফেলল। আর চাটুজ্জে জেঠুর বিধবা স্ত্রী বাইশ

বছরের শুভাদি তো আনন্দের চোটে আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে দু' গালে দুটো চুমোই খেয়ে বসল। শুভাদির গায়ের রং কালো কিন্তু বেশ মিষ্টি মুখখানা। জ্ঞান বয়েস থেকেই শুভাদিকে আর তার মা-কে চাটুজ্জেবাড়িতে দেখছি। ষোল বছর বয়সে শুভাদির বিয়ে হতে দেখেছি। দু' বছর আগে বিধবা হবার পর মামার কাছেই পাকাপাকি আশ্রয় নিয়েছে। শুভাদির মা তার আগেই চোখ বুজেছে। শুভাদির মতো এত টান আর বোধ হয় কারো ওপর ছিল না আমার। শুভাদি বলত তুই আমার ভক্ত হনুমান। আবার বকাবকিও করত প্রায়ই, তুই আমার দিকে অমন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকিস কেন? কি দেখিস?

আমার তখন ভেতর চাপা। বলতাম, তোমাকে দেখতে আমার ভালো লাগে।

শুভাদি বলত, বড় হলে তুই একটা অপদার্থ হ্যাংলা হয়ে যাবি।

সেই আমি ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছি, শুভাদির আনন্দ হবারই কথা। কিন্তু ও-ভাবে আদর করে কি সর্বনাশ যে করে বসল শুভাদি তার ধারণাই নেই। আমি কর্ণফুলির দিকে দৌড়ে পালালাম।

দু'বছর বাদে আই. এস-সি. পরীক্ষা দিলাম। প্রথম দুই-একজনের মধ্যে হব জানা কথা। কিন্তু এ দু-বছরে আমার ভিতরের পুরুষ ছেলেটাকে চেনা-জানা অনেক মেয়েই চিনতে শুরু করেছে। একটা অমোঘ আকর্ষণ আমাকে তাদের কাছে টেনে নিয়ে যেত। তারা হাসাহাসি করত। নিজেদের মধ্যে চোখ-টেপাটিপি করত। আমাদের বাড়ির বা চাটুজ্জে জেঠুর বাড়ির অল্পবয়সী পরিচারিকারাও আমার চোখের ভাষার আঁচ পেত। মুচকি হেসে প্রশ্রয়ও দিত কেউ কেউ। বিপরীত সত্তার চাবুক খেয়ে ছুটে যেতাম কর্ণফুলীতে। নিজের ওপর আক্রোশে বালিতে মুখ ঘষে ছাল তুলে ফেলতে চাইতাম।

ঠিক-ঠিক বুঝতো না কেবল শুভাদি। তার কাছেই আমার সব থেকে বেশি গোপনতা বলেই সব থেকে বেশি সহজতর অভিনয়। বই আর জাম-জামরুল নিয়ে কাড়াকাড়ির ছল খুঁজতাম। ছ-বছরের বড় শুভাদি রাগ দেখাতে গিয়ে হাসত।—তুই একটা পাগল! মেয়েছেলের গায়ে এ-ভাবে হাত দেয়!

সাতচল্লিশের গোড়ার দিক সেটা। দেশ জুড়ে মারামারি কাটাকাটির হিড়িক পড়ে গেছে। পূব বাংলায়, পশ্চিম বাংলায়, বাইরেও অনেক জায়গায়। সেই মারামারি কাটাকাটি দেখে আমার গায়ে জ্বর আসত, আর কে যেন বলত, সব ধ্বংস হয়ে যাক, তুই চেয়ে-চেয়ে দেখ। চাটগাঁ ছেড়েও হিন্দুরা পালাচ্ছে। শুভাদিরা সুযোগ পেলেই কলকাতা চলে যাবে। আই. এস-সি. পরীক্ষায় আমি

প্রথম হয়েছি। কাকা আর চাটুজ্জে জেঠু ঠিক করে ফেলেছে আমি বম্বে যাব ডাক্তারি পড়তে। কাকার এক শালা সেখানকার মেডিক্যাল কলেজের নামকরা প্রোফেসার। চিঠি লেখালিখি করে তার সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলা হয়েছে। আমার ডাক্তারি পড়ার সমস্ত খরচাও খোকে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি গেলে আমার নামে সে টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়বে। আগামী পরশু আমার রওনা হবার ব্যবস্থা পাকা।

দুপুরে শুভাদির ঘরে শুভাদির সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। আমি কিছুই করছিলাম না, আমি কেবল শুভাদিকে দেখছিলাম। আমার মধ্যে শাসনের চাবুক পড়ছিল আবার যন্ত্রণার মতো একটা লোভের দাপাদাপি চলছিল। শুভাদি একটানা দুঃখ করে যাচ্ছিল, আর কোনদিন দেখা হবে কিনা এত দুর্যোগে, কে কোথায় ভেসে যাবে কে জানে!

সকাল দুপুর বিকেল রাত্রি চারবার চান করা অভ্যাস শুভাদির নইলে মাথা গরম হয়। এক সময় বলল, তুই বোস আমি চান করে আসি, মাথা ঝিমঝিম করছে।

চলে গেল। মাথার মধ্যে হঠাৎ কি রকম হয়ে গেল আমার। উথালপাথাল কাণ্ড যেন। উঠে পড়লাম। ভিতরের বারান্দার কোণে বাথরুম। দরজা বন্ধ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। দরজায় কান পাতলাম। ঝরঝর জলের শব্দ। রেলিংএ ভর দিয়ে বাথরুমের পিছন দিকটা দেখলাম। কাঁচের শার্সির খানিকটা ভাঙা। এদিকটা বাগান আর গাছগাছড়া বোঝাই বলেই ওটা সারাবার তাগিদ বোধ করেনি কেউ।

নিজের ওপর আর কোনো দখল নেই। নির্জন দুপুরে শয়তান ভর করেছে মাথায়। রেলিং টপকালাম। আলসে ধরে ধরে শার্সির দিকে এগোলাম। পড়লে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর পরোয়া তখন কে করে?

পৌঁছেছি। তারপর স্থান-কাল ভুলে গেছি।

ধরা পড়ে গেলাম। শার্সির দিকে চোখ পড়তে বিষম আঁতকে উঠে শুভাদি ভিজা গামছায় বুক চাপা দিল।

আমি কাঁপতে কাঁপতে রেলিং টপকে ঘরে চলে এলাম। কিন্তু কি যে হল তারপর! পালাতে পারলাম না। নড়তে-চড়তে পারলাম না। কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে শুভাদি এলো। পরনে শুকনো শাড়ি-ব্লাউস, ভেজা চুল ভেজা মুখ। সোজা কাছে এসে ঠাস ঠাস করে দু-গালে দুই চড় বসিয়ে দিল।—

কেন? কেন? আমি কত বড না তোর থেকে! ভিতরে ভিতরে তুই এই!

সব শেষ হয়ে গেছে বুঝেও কেউ বাঁচার আশা করে না। করে না বলেই বলতে পারলাম। বলে উঠলাম, আমি এর থেকেও ঢের খারাপ—তোমাকে একেবারে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে আমার—অনেক দিন থেকে করে। আমি বইএ পড়েছি, মায়ের হাত না পডলে, মায়ের ছোঁয়া না পেলে, মায়ের বুকের দুধ না খেলে অনেক ছেলের এ-রকম রোগ হয়। ধরা পড়েছি ভালো হয়েছে, এ রোগ নিয়ে আমার আর বাঁচার দরকার নেই—আমি আর বাঁচতে চাই না, চাই না—তোমার ঘেন্নার ফল তুমি কালকের মধ্যে দেখতে পাবে।

চলে যাবার জন্য ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়িয়েছি। শুভাদি শক্ত হাতে আমার হাত ধরে ফেলল। টেনে বসিয়ে দিল আবার। বিমূঢ় চাউনিটা বদলাতে লাগল। নতুন করে দেখছে যেন আমাকে। দেখছেই। দেখছেই। তার কালো মুখ লাল হয়ে উঠছে। ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। সেই নিঃশ্বাস আমার চোখে-মুখে লাগছে।

হাত ছেড়ে দিল।—বোস। আসছি।

দ্রুত চলে গেল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই ঘুরে এলো আবার। মুখ আরো লাল। একটুও শব্দ না করে দরজা বন্ধ করল। খিল এঁটে দিল।

...আধ ঘণ্টা বাদে সেই দরজা আমি খুলেছি। বজ্রাহতের মতো বেরিয়ে এসেছি। সোজা কর্ণফুলির ধারে। আশ্চর্য, দুপুরের ওই আকাশ এখনো আমার মাথার ওপর ভেঙে পড়ছে না। নদীতে ঝাঁপ দিলাম। সাঁতরে অনেক দূর চলে গেলাম। কিন্তু অত জলের গভীরেও আঠারো বছরের একটা ছেলের জায়গা হল না। কর্ণফুলী আমাকে যেন ঠেলে ঠেলে তীরে নিয়ে এলো।

...বম্বেতে পাঁচ বছরের মেডিকেল কোর্স পাঁচ বছরেই শেষ হয়েছে। প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হইনি কখনো। ভিতরের চরিত্র বদলায়নি। কিন্তু সে-চরিত্র নিজেই অনেকটা বিশ্লেষণ করতে পারি। ভিতরের ওই অবুঝ আবেগটার নাম ইড। আমি তার শিকার। সে অন্ধ, আত্মধ্বংসী, সর্বধ্বংসী। কম-বেশি সকলেরই থাকে সেটা। ইগোর নিচে চাপা পড়ে থাকে। ইডকে আমি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিই না। তার ওপর দিয়ে ইগোকে সবল-প্রবল করে তোলার চেষ্টায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাই।

ছুরি হাতে নিলে সব শেষ করে দেবার উল্লাসে মেতে উঠতে চায় ভিতরের কেউ। সেটা জানা আছে বলেই ভিতরের আর একজন ঢের বেশি সাবধান ঢের বেশি সংযত। এই সাবধানতা আর সংযম উল্টে আর পাঁচজনের চোখে প্রতিভা

আর বিচক্ষণতার লক্ষণ।

বম্বেতে যে মানুষটিকে আমি সব থেকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম তিনি আমাদের মেডিসিনের প্রোফেসার ডক্টর দিবাকর চ্যাটার্জি। বাঙ্গালী হলেও বরাবর এদিকের মানুষ। কথাবার্তায়ও অবাঙ্গালীর টান এসে গেছে। তিন বছরের মতো খুব কাছে পেয়েছিলাম তাঁকে। ছাত্র হিসেবে আমাকে একটি রত্ন ভাবতেন তিনি। বাড়ি গেলে আদর করে খাওয়াতেন। নামজাদা ডাক্তার ভালো পসার। চতুর্থ বছরের শুরুতে প্রিন্সিপালের সঙ্গে কি নিয়ে খটাখটি লাগল জানি না। চাকরি ছেড়ে সপরিবারে গোয়া চলে গেলেন। সেখানে বড একটা নার্সিং হোম ফেঁদে বসার ইচ্ছে। বড ডাক্তার যখন, সেখানে জম-জমাট পসার হতেও সময় লাগবে না। বড বড মক্কেলের তাগিদে আগেও তিনি বহুবার বম্বে থেকে গোয়ায় পাড়ি দিয়েছেন। আর পকেট বোঝাই করে টাকা এনেছেন।

বম্বেতে থাকাকালীন আমি ঘন ঘন ডক্টর চ্যাটার্জির বাড়ি যেতাম থার্ড ইয়ারের শেষের মাথায় পৌঁছে। একটা বই আনার ব্যাপারে হঠাৎ গেছলাম একদিন। তারপর মাঝে মাঝে যাওয়া শুরু করলাম। তারপর প্রায়ই।

আমার সেই জ্ঞানার্জনের আডালে লক্ষ্য একটি মেয়ে। ডক্টর চ্যাটার্জির একমাত্র মেয়ে সুমিত্রা চ্যাটার্জি। আমার বয়েস তখন একুশ, সুমিত্রার সতের। ফ্রক পরে, সালোয়ার কামিজ পরে মেয়ে-পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হৈ করে বেডায়। টেনিস খেলে। সাঁতার কাটে। ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসে। চোখের কোণ দিয়ে আমাকে দেখে আর তুচ্ছ করে। ওর বাবার ভালো ছাত্র বলে পরিচয় দেওয়াটাই যেন অবজ্ঞার কারণ। আমার দুই সত্তার একটা ভদ্রতার মুখোশ এঁটে বসে থাকে, অন্যটা সমস্ত নখদন্ত মেলে ওকে গ্রাস করতে চায়। দ্বিতীয় অভিলাষটা দিনে দিনে বাডতে থাকল।

মেয়েটা বেশ লম্বা, সুশ্রী। মাথার চুল কাঁধের নীচে নামতে দেয় না। তার চোখের তারায় আমন্ত্রণ। চোখের তারায় প্রত্যাখ্যান। আমি প্রত্যাখিতের দলে। আমার ঘন-ঘন যাতায়াতের কারণটা তার খুব অগোচর নয়, সোজা মুখের দিকে চেয়ে সতের বছরের সুমিত্রা চ্যাটার্জি তাও বুঝিয়ে দেয়। আর আচরণে বুঝিয়ে দেয় ভালো ছাত্রদের সে এমন কিছু ভালো চোখে দেখে না।

ডক্টর চ্যাটার্জি গোয়ায় চলে যেতে আমারই মেজাজটা সব থেকে খারাপ হয়ে গেল, কেন সেটা আমি ছাডা আর কেউ জানে না। তাদের বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত উপস্থিত ছিলাম আমি। তখনো এক অন্ধ আক্রোশে ওই মেয়ের দেহ আমি ফালা ফালা করে ফেলতে চেয়েছি। সুমিত্রার অবজ্ঞা-ভরা দুই চোখে

তখনো মজা উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। তার যেন জানতে বুঝতে কিছু বাকি নেই।

ফাইন্যাল ইয়ারে উঠে গোয়ায় গেছি গুরুদর্শনে। ডক্টর চ্যাটার্জি সত্যিকারের খুশি আমাকে দেখে। নিজের বাড়িতেই ছাত্রকে ধরে রাখলেন ক-টা দিন। মিসেস চ্যাটার্জি আনুষ্ঠানিক আদর যত্ন করলেন। মিস চ্যাটার্জি প্রথমে না চিনতেই চেষ্টা করল। চেনার পর আরো বেশি তুচ্ছ করল। পর্তুগীজ আমলের ফ্রি-পোর্ট গোয়া, ঢালা ফুর্তির জায়গা। বাতাসে অঢেল ফুর্তির রসদ সেখানে। তার সময় কোথায় বাড়ির অতিথির কাছে দু-দণ্ড এসে বসার বা কথা বলার! বাবার অর্থাৎ ডক্টর চ্যাটার্জির মেজাজ-পত্র উগ্র একটু। শুধু তার সামনেই মেয়ে নরম যা একটু, দুনিয়ার আর কাউকে কেয়ারই করে না।

শুরু থেকেই পসার জাঁকিয়ে বসেছেন ডক্টর চ্যাটার্জি। নার্সিং হোমও স্টার্ট হয়ে গেছে। আসার সময় মেয়ের সামনেই বলে দিলেন, ভালো পাস করে এখানেই চলে এসো। ভালো প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা আমিই করে দিতে পারব। নার্সিং হোম থেকেও অনেক সুবিধে পাবে।

আমি ভালো ছেলের মতো মাথা নাড়লাম। আমার ধারণা সুমিত্রা মনে মনে আমাকে মুখ ভেংচালো। আমিও যে ভালো ছুরি চালাতে শিখেছি ও সেটা তখনো জানে না।

পরের বছর পাস করলাম। সেই প্রথমই হলাম। ডক্টর চ্যাটার্জিকে চিঠি লিখে জানাতে তিনি গরম আশীর্বাদ পাঠালেন—ছ মাসের ট্রেনিং ডিউটির পর রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে সোজা এখানে চলে এসো।

ইতিমধ্যে বম্বেতে আর একটা মেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আবার। নাম সুনন্দা কারলেকার। মস্ত বড়লোকের মেয়ে। বাপের কাপড়ের মিল। সখের ডাক্তার হওয়া তার। আগাগোড়া ফার্স্ট হওয়া ছাত্রের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে অনেক দিন ধরেই একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। পড়া বোঝার তাগিদে প্রায়ই বাড়িতে ধরে নিয়ে যেত। আর আমার প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হত। আশ্চর্য, সুমিত্রাকে দেখলে যেমন একটা পশু ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইত, এর বেলায় তেমন হত না। ভালো লাগত। আমার ভিতরের দুই সত্তার একজন সুনন্দা কারলেকারকে আঁকড়ে ধরতে চায়, আর একজন সুমিত্রাকে গ্রাস করতে চায়। আমার বয়েস তখন চব্বিশ চলছে। সুনন্দার বাইশ হবে। এক সন্ধ্যায় একসঙ্গে দু'জনে পড়ার বইয়ের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে আমি আচমকা এক কাণ্ড করে বসলাম। ওর মুখটা ঘুরিয়ে ধরে সোজা একটা চুমু খেয়ে বসলাম।

এই অসীম সাহস দেখে সুনন্দার দুই চক্ষু কপালে। রাগের চোটে আমার

চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকালো, গালাগাল করল। কিন্তু আমি দু'দিন ডুব মারতে আবার নিজেই এলো আমার কাছে। তখনো ভয়ে কাছে ঘেঁষত না, পড়ার সময় দু'হাত ফারাকে বসত। তবু ভিতরে ভিতরে কাছাকাছিই আসছিলাম আমরা। ওর সান্নিধ্যে আমার ভিতরের স্নিগ্ধ দিকটাই পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। সুমিত্রা চ্যাটার্জি বেঁচেই গেল বোধ হয়। আমি বিলেত যাওয়ার কথা বললে সুনন্দা চোখ পাকাতো।—খবরদার। একসঙ্গে যাব দুজনে।

কিন্তু তা হবার নয় বলেই যা হবার হঠাৎই হয়ে গেল। এক একটা মেয়ে দেখলে আমার ভিতরটা চনমন করে উঠত সেটা ও লক্ষ্য করে থাকবে। সমুদ্রের ধারে মুখোমুখি বসে গল্প করছিলাম দুজনে। কম করে তিন হাত তফাতে বসেছে ও। বলেছে, তুমি যে রকম শয়তান, বিশ্বাস নেই। সেদিন ও বলল, কটা মেয়ের মাথা খেয়েছ আজ পর্যন্ত সত্যি করে বলো তো ?

এই পলকা কথাবার্তার ফাঁক দিয়েই কি যে হয়ে গেল আমার জানি না। একটা যন্ত্রণা বুকের তলায় পুষতে পুষতে সেটা পুরনো হয়ে গেছে বটে, কিন্তু একটুও মিলিয়ে যায়নি। বুকের তলায় হঠাৎ শব্দশূন্য কান্না যেন গুমরে গুমরে ওঠে।

বললাম ওকে। যার নাম কনফেশন। নিজের মুক্তির তাগিদে বললাম শুভাদির সমস্ত কথা। এক বর্ণও গোপন করলাম না।

শোনার পর সুনন্দার মুখ থমথমে। উঠে দাঁড়াল। অস্ফুট স্বরে বলল, আঠারো বছর বয়েস থেকে এ-রকম লম্পট তুমি।

হনহন করে চলে গেল। কিন্তু অনেক কাল বাদে আমি যেন একটা বড় মুক্তির স্বাদ পেলাম। পরদিন সুনন্দার বাড়ি গেলাম। কবুল করা হয়ে গেলে মনের জোর বাড়েই। আমার সেই জোর।

দরোয়ান ফটক আগলালো। ভিতরে ঢোকা চলবে না। বললাম, মিসি বাবাকে ডাকো তাহলে। দরোয়ান জবাব দিল, মিসি বাবা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে বলেছে।

স্নেহ বা ক্ষমা পেলে উল্টো হত। মনে মনে সেদিন সুনন্দা কারলেকারকেও অন্ধ রোষে বিদীর্ণ করতে করতে চলে এলাম।

ছ' মাসের মাথায় আমার রেজিস্ট্রেশন হতে সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে বিদেশে যাবার স্কলারশিপও পেয়ে গেলাম। এফ. আর. সি-এস. করতে যাব। রওনা হবার আগে গোয়ায় এলাম গুরুদর্শনে। কেন যে এলাম সে শুধু আমিই জানি।

ডক্টর চ্যাটার্জি ভারী খুশি। বার বার বললেন, আমি একটা ছেলে বটে।

শাসিয়ে বললেন, এফ. আর. সি-এস. করে এই গোয়াতেই ফিরে আসা চাই—গোয়া ইজ ইওর প্লেস। তাঁর নার্সিং হোম আর পসার দু-ই তখন আরো জমজমাট।

আমার তখন চব্বিশ, অতএব সুমিত্রার কুড়ি। দেখতে এখন আরো ভালো হয়েছে, সর্বাঙ্গ যেন আরো তীক্ষ্ণ আরো ইঙ্গিতসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তার কাছ থেকে এতটুকু সাড়া পেলে আমি সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতাম হয়তো। বাইরে যাওয়া হত না। কিন্তু তার চারদিকে তখন অনেক স্তাবক। সে আমাকে পাত্তা দেবে কেন? বিশেষ করে সেই সতের বছর থেকে যখন জানে আমার গুরুভক্তির পিছনে আসল টানটা কোথায়।

চোখকান বুজে এবার ডক্টর চ্যাটার্জির কাছে মনের বাসনা ব্যক্ত করে ফেললাম। রাগী মানুষ আরো রেগে উঠবেন হয়তো, কিন্তু এসপার-ওসপার একটা না করে ফেললেই নয়।

রাগের বদলে অবাক হয়ে মুখের দিকে খানিক চেয়ে রইলেন তিনি। তার পর বললেন, আই থিঙ্ক সী হ্যাজণ্ট গট দ্যাট মাচ লাক। ওর মা বলছিল, একটা ছেলেকে ও পছন্দ করছে—দ্যাট ডি'কস্টা বয়। আই নেভার ইনটারফিয়ার। আই লাইক ইউ—হলে আমি খুশি হব। বাট ইট'স অল হ্ওর লাক। ইংল্যাণ্ডে কতদিন থাকবে?

—বছরখানেকের মধ্যে হয়ে যাবে আশা করছি।

—এক বছর আর ক'টা দিন! মন দিয়ে কাজ শেষ করে এসো। তারপর যদি সুযোগ থাকে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব।

সেই সর্বগ্রাসী অন্ধ আক্রোশ নিয়ে ফিরে এলাম। মনে মনে ওই অদেখা ডি'কস্টা বয়ের বুকে ছুরি বসাতে থাকলাম। সুমিত্রার অ্যালবাম থেকে এবারে তার একটা ফোটো সরাতে পেরেছিলাম। সেটা বার করে বাসনার জ্বলন্ত আগুনে তাকে আহুতি দিতে লাগলাম।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরতে এক বছরের জায়গায় দেড় বছর গড়িয়ে গেল। সেখানকার বড় হাসপাতালে ছ' মাস হাত পাকিয়ে তারপর ফিরলাম।

আমার কৃতিত্ব দেখে ডক্টর চ্যাটার্জি জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। রগচটা মানুষটার এত আনন্দ তাঁর স্ত্রী বা মেয়ে কমই দেখেছে।

কিন্তু আমি অবাক। এই এক বছরে ডক্টর চ্যাটার্জির মাথার সব চুল পেকে সাদা।

তিনি বললেন, পরে জানবে সব। বিরাট দুর্যোগ গেল মাথার ওপর দিয়ে। এখানকার মানুষদের ভালবাসা আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।

দুর্যোগই বটে। এমন হতে পারে কখনো কল্পনা করিনি। এই প্রৌঢ় বয়সে ডক্টর দিবাকর চ্যাটার্জি প্রায় একটা বছর জেলে আটকে ছিলেন। আমি বিলেত চলে যাবার মাস তিনেক বাদে পর্তুগীজ পুলিস দপ্তর হঠাৎ এই মানুষটির সম্পর্কে তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত ক'বছর ধরে ভারতের দিক থেকে গোয়া লিবারেশন মুভমেণ্ট-এর যে হাওয়া উঠেছে, তিনি নাকি তার পৃষ্ঠপোষকদের একজন। তলায় তলায় বহু টাকা দিচ্ছেন, নার্সিং হোমের নিরাপদ আওতায় রেখে 'অবাঞ্ছিত' লোকদের আশ্রয় দিচ্ছেন। পর্তুগীজ পুলিস এ-সবের অকাট্য প্রমাণ নাকি কিছু কিছু পেয়েছে।

ফ্রি-পোর্ট পর্তুগীজ গোয়া একদিকে স্মাগলারদের স্বর্গরাজ্য, অন্য দিকে অঢেল ফুর্তির সাগরদ্বীপ। ফলে এখানকার হোমরা-চোমরাদের একটা বড় অংশ মুক্তি-ফুক্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নয়। আর পর্তুগীজ শাসন বা কুশাসন তো এখানে অনড় হয়েই থাকতে চায়। তবু তলায় তলায় মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ জোরদার হয়ে উঠেছিল ঠিকই।

আর নিঃশব্দে টাকাকড়ি এবং আশ্রয় দিয়ে আন্দোলনের মানুষদের ডক্টর চ্যাটার্জি যে সাহায্য করছিলেন তাও ঠিক। এই গোপন ব্যাপারটা মিসেস চ্যাটার্জি বা সুমিত্রা চ্যাটার্জিরও জানা ছিল না। সেই কারণেই ডক্টর চ্যাটার্জির বিস্ময় কম নয়। পর্তুগীজ পুলিসের কানে এ খবর তুলে দিয়ে এমন বিশ্বাস-ঘাতকতা কে করতে পারে তিনি ভেবে পেলেন না। যাই হোক, তাঁর মতো এতবড় ডাক্তার গোয়া বা দামন দিউতে নেই। আর হাতে-নাতে ধরার মতো এমন কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণও পর্তুগীজ সরকারের হাতে ছিল না। টাকার জোরে আর এখানকার জনসাধারণের দাবির চাপে মাস চারেক আগে ছাড়া পেয়েছেন।

এত দিন নার্সিং হোম চালিয়েছে তাঁর অধীনের অন্য ডাক্তাররা। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখেছে নাকি মিসেস চ্যাটার্জি আর তার মেয়ে সুমিত্রা চ্যাটার্জি।

ডক্টর চ্যাটার্জির এত বড় অঘটনের খবর শুনে আমি কি একটুও দুঃখিত হয়েছিলাম? না। কারণ গোয়াতে যেদিন পা দিলাম সেদিনই ডক্টর চ্যাটার্জি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মেয়ে অলমোস্ট এনগেজড—প্রভাকর ডি'কস্টার সঙ্গে বিয়ে হয়তো এতদিনে হয়েই যেত—হঠাৎ একটা বছর এই পুলিসের গণ্ড-গোলের মধ্যে পড়ে যেতে আটকে গেছে।

বিয়ে আটকানোর জন্য পর্তুগীজ পুলিসকে আমি মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে-ছিলাম কিনা জানি না। সুমিত্রার বয়েস এখন বাইশ। শরীরটা এখন আগের

মতো অত ধারালো বা ছিপছিপে নয়। খুব সামান্য মোটার দিকে ঘেঁষেছে। সব মিলিয়ে আমার চোখে ও এখন আরো সুন্দর আরো পেলব। তাকে দেখা মাত্র আমার সেই অন্ধ অবুঝ সত্তা সর্বাঙ্গে ছোবল মারার জন্য সাপের মতো হিসহিস করে উঠেছে। কে প্রভাকর ডি'কস্টা আমি জানি না। এখনো তাকে চোখে দেখিনি। কিন্তু পাকে-চক্রে বিয়েটা যখন আটকে গেছে আর ও বিয়ে হবে না। হতে পারে না। কেন হবে না, কেমন করে হবে না সেটা পরের মাথা ঘামানোর ব্যাপার। কিন্তু হবে না, হতে পারে না।

আমি আসার এক-ঘণ্টার মধ্যে আমাকে বিশ্রাম করতে বলে ডক্টর চ্যাটার্জি নার্সিং হোমে গেছেন। তাঁর শরীর এখনো সুস্থ নয় খুব, তাই মিসেস চ্যাটার্জি একলা ছাড়েন না তাঁকে। আমার প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করে তিনিও সঙ্গে গেছেন।

চাকর-বাকর আয়া ছাড়া বাংলোয় এখন আমি আর সুমিত্রা। তার ঘর জানি। কিন্তু না জানার মতো করে হঠাৎই তার ঘরে ঢুকলাম। ও-দিক ফিরে সুমিত্রা টেলিফোনের নম্বর ডায়েল করছিল। আয়নায় আমাকে দেখে মাঝ-পথেই আঙুল থেমে গেলে। রিসিভার নামিয়ে বেগে ঘুরে দাঁড়াল।

—ও···আই অ্যাম সরি।

বললাম বটে কিন্তু চলে এলাম না। চোখে চোখ রেখে কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে নিজের ভিতরটা দেখিয়ে দিতে চাইলাম তাকে। ও কতটুকু দেখল জানি না। সহজ অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ ?

এতদিনের মধ্যে কেউ আমরা আপনি-তুমির মধ্যে যাইনি। বাক্যালাপ তো ছিলই না বলতে গেলে। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি ঝুলিয়ে মুখের দিকে চেয়ে একটু মজা দেখল যেন সুমিত্রা। বলল, ভালো। বিলেত ঘুরে এসে তুমি একটু মানুষ হয়ে গেছ দেখছি··· ।

হেসে মাথা ঝাঁকালাম।—এর মধ্যে তুমি আর কতটুকু দেখলে! আসার সময় সেখানকার কত মেয়ে কেঁদে-কেটে সারা।

বেপরোয়া উক্তি শুনে সুমিত্রা আরো মজা পেল যেন। হেসে ফেলল।—এখানে কারো সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধা নেই, এলে কেন ?

—এলাম তোমার বাবা মানে আমার গুরুদেবকে কথা দিয়েছিলাম, তাই।

সুমিত্রার চোখে সংশয়ের একটু ছায়া নামল যেন। শুধু ওই রাশভারী বাবাটিকে ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকে পরোয়া করে না সে। তা ছাড়া লিব-মুভমেণ্টএ নাম জড়ানো আর চুপচাপ একটা বছর জেলে কাটিয়ে আসার ফলে

এই বাবাটিকে এখন আরো একটু ভয়ের চোখে দেখে সে। শংকার ছায়া দূর হতেও সময় লাগল না অবশ্য। বাবার কাছে গোপন কিছু নেই, আর কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বাবা এই লোককে প্রশ্রয় দিতে পারে না! হেসেই বলল, তোমার গুরুভক্তি সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো।

ডক্টর চ্যাটার্জি তাঁর বাংলোর কাছেই আমার জন্যে বাড়ি ঠিক করলেন একটা। নিজে তদারক করে নিচের তলায় চেম্বার করে দিলেন। আর নার্সিং হোমে মোটা মাইনের হেড সার্জন করে বসালেন আমাকে। মাইনে ছাড়াও অপারেশন পিছু বাড়তি প্রাপ্য। এ-ব্যাপারে কার্পণ্যের হেতু নেই, কারণ সার্জন হিসাবে আমার নামও এখন ঘোষণার যোগ্য।

দিন-কয়েকের মধ্যেই প্রভাকর ডি'কস্টার সমস্ত বিবরণ আমার জানা হয়ে গেল। তার আগে প্রোফেসারের বাংলোতে সুমিত্রার সঙ্গে একাধিক দিন দেখেছি তাকে। ঝকঝকে মস্ত বিদেশী গাড়ি হাঁকিয়ে সুমিত্রাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেও দেখেছি। সেই ফাঁকেই আমার দিকে চেয়ে সুমিত্রা মুখ টিপে হেসেছে। যেন বলতে চায়, গুরুভক্তি সিকেয় তুলে বিলেতে যারা কান্নাকাটি করছে তাদের কাছেই ফিরে যাও—এখানে কোনো আশা নেই।

প্রভাকরের সঙ্গে ডক্টর চ্যাটার্জিই প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। আমারই বয়সী, আমার থেকেও সুপুরুষ সন্দেহ নেই। শিক্ষিত, মার্জিত। তার বাবা জন ডি'কস্টা এখানকারই মানুষ। মা মহারাষ্ট্রের মেয়ে। প্রভাকর মহারাষ্ট্রীয় নাম, তার সঙ্গে ডি'কস্টা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। জন ডি'কস্টা নামকরা এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট মার্চেণ্ট। অঢেল পয়সা। তিন মাস হল হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেছে ভদ্রলোক। তার তিন ছেলে এখন ব্যবসার মালিক। তারা ব্যবসা দেখছে। কিন্তু আসলে দেখছে বড় দুই ছেলে। প্রভাকর ডি'কস্টা স্পেশ্যাল ওয়ার্ক আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মস্ত পাণ্ডা। দু' হাতে টাকা ওড়ায় আর হৈ-চৈ করে বেড়ায়, তাই বহুজনের প্রিয়। হুট করে বাবা মারা না গেলে হয়তো এই ক'মাসের মধ্যেই সুমিত্রার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যেত।

আমার শিরায় শিরায় রক্ত ফুটেছে আবার। ও-বিয়ে হবার নয় বলেই ডক্টর চ্যাটার্জিকে জেলে যেতে হয়েছে। ও-বিয়ে হবার নয় বলেই জন ডি'কস্টা স্ট্রোক হয়ে মারা গেছে।

প্রভাকর ডি'কস্টাকেও সরে যেতে হবে। হবেই। কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব হবে ভেবে পাই না বলেই মাথার মধ্যে আগুন জলে সর্বদা। দুবেলাই ডক্টর চ্যাটার্জির বাংলোয় আসি আমি। ফাঁক পেলে অসময়েও আসি।

সুমিত্রার কাছে প্রভাকরের পঞ্চমুখে প্রশংসা করি। প্রশংসা ডক্টর চ্যাটার্জির কাছেও করি। আমার উদারতা দেখে তিনি খুশি হন।

কিন্তু সুমিত্রা বিশ্বাস করে না। আমার যখন-তখন ওদের বাংলোয় আসাটা সে সরল চোখে দেখে না। আমার ভিতরের অভিলাষ ও বুঝতে পারে। আমার এই দুটো চোখের হিংস্র তন্ময়তাও একাধিক দিন ওর চোখে ধরা পড়েছে। রাগে মুখ লাল হতে দেখেছি তখন। সেদিন চুপচাপ ওকে বাগানে বসে থাকতে দেখে নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বেশ কাছে। দু-হাতের থাবা নিশপিশ করছিল। ও টের পেয়ে চমকে উঠেছিল। তারপর ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল।—কি ব্যাপার? এখানে?

আমি হেসে হেসে রসিয়ে বলেছিলাম, তোমার বাবা ঘুমুচ্ছেন দেখলাম। ফিরে আসতে গিয়ে দেখি এই নির্জনে তুমি এখানে। মনে হল, দৃশ্যটা একজন পুরুষ ছাড়া পূর্ণ হয় না। প্রভাকরকে হাতের কাছে পেলে তাকেই ঠেলে পাঠাতাম।

অসহিষ্ণু ঝাঁঝে ও বলে উঠল, বাবার কাছে খুব ভালো ছেলে সেজে আছ তাই থাকো গে যাও—আমার সঙ্গে বেশি রসিকতা করতে এসো না!

ওদের এই বিশাল বাংলোর যত্রতত্র আনাগোনা আমার। কখন কে এলো গেল সব সময় তার হদিসও মেলে না। দুদিন বাদে ওর বাবার কাছে বসেছিলাম। লক্ষ্য করলাম, একটু দূর থেকে সুমিত্রা খরদৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। দেখছে না, দু'-চোখে আমার মুখটা যেন কালাকালা করছে। তার কারণ অনুমান করতে পারি। ওর ঘরের ড্রেসিং টেবিলের ওপর মাঝে মাঝে যে দুটো মোটা শৌখিন ফোটো অ্যালবাম পড়ে থাকে, তার একটার থেকে তিনখানা ছবি খোয়া গেছে। সেই তিনখানা ছবিতেই রমণীর তনু-মাধুর্য অনাবৃত অনেকখানি। সুমিত্রার এ-রকম ছবি কোনো স্টুডিওর তোলা হতে পারে না। হয়তো প্রভাকর তুলেছে। সেই ফোটো তিনটে খোয়া গেছে দেখে ও হয়তো প্রভাকরকেই চেপে ধরেছিল প্রথম। সে অস্বীকার করার ফলেই হয়তো এই শ্যেন-পর্যবেক্ষণ।

ঈশ্বরের থেকে শয়তান সহজে দোসর হয়। আমি শয়তানকে ডেকেছি। ডাকছি। ডক্টর চ্যাটার্জির কল্যাণে সার্জন হিসেবে এই দুমাসের মধ্যে আমারও নাম-ডাক কম নয়। সার্জন লোকানন্দ বড়ুয়ার হাতে ছুরি নাকি ছবির মতো চলে। কঠিন অপারেশনের ওপর মরণবাঁচন নির্ভর এমন একজন রোগী এলো নার্সিং হোমে। লোকটি প্রায় বৃদ্ধ। পর্তুগীজ পুলিস বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তাদের একজন। প্রাণের দায় বড় দায়। ভর্তি হয়েই বাজে লোকের বাজে কথায় পড়ে ডক্টর চ্যাটার্জিকে জেলে আটকে রেখে এক বছর ধরে হয়রান করা হয়েছিল

বলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল। আর তাই শোনামাত্র শয়তান পথ দেখিয়ে দিল আমাকে।

গুজব শুনেছিলাম, এখানকার জনাকতক বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোকই চুপিসাড়ে ডকৃটর চ্যাটার্জির প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। গোয়া স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের স্বার্থের হানি। অপারেশন করব আমি। তাই আমার প্রতি এই পদস্থ অফিসারটির আরো বেশি আনুগত্য। শয়তানের ইশারা পেয়ে তার সঙ্গে ভাব জমালাম আমি। তারপর ডকৃটর চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে প্ররোচনা-চক্রে কারা ছিল তাদের নাম জানতে চাইলাম। আসলে আমি একটা নামই শুনতে চাই। না পেলেও ওই নাম আমি নিশ্চয় জুড়ে দিতাম। কিন্তু শয়তান সহায়, না পাব কেন? জীবন-মরণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে ভেবে অফিসারটি যে ক'টি শাঁসালো নাম ব্যক্ত করল, তাদের একজন এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট মার্চেন্ট জন ডি'কস্টা।

প্রভাকর ডি'কস্টার বাবা জন ডি'কস্টা।

ডক্টর চ্যাটার্জির অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল জন ডি'কস্টা।

প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ড-এর বাড়াবাড়ি অবস্থার রোগী ওই অফিসার। বাঁচার থেকে মরার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু আমি তাকে বাঁচার অবধারিত আশ্বাস দিয়েছি। আর বলেছি সুস্থ হবার পর আমার একটা আরজি তাকে রাখতে হবে—ডকৃটর চ্যাটার্জি আমার গুরু, তাঁর মঙ্গলের জন্যেই এই অনুরোধ।

শয়তান সহায়। আমি জানি এ রোগী বাঁচবেই।

জীবনে এত যত্ন করে আর কটা অপারেশন করেছি আমি জানি না। বাঁচল। ক্রমে সুস্থ হল। তার কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা নেই। সেই কৃতজ্ঞতার দায়ে যাবার আগে ডকৃটর চ্যাটার্জিকে জানিয়ে দিয়ে গেল, ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তা করার গোপন অভিযোগে যারা তাঁকে জেলে পাঠিয়েছিল, বিগত এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট মার্চেন্ট জন ডি'কস্টা তাদের বিশেষ একজন। আর তার যে ছোট ছেলেটার সঙ্গে চ্যাটার্জি সাহেবের মেয়ের ঘনিষ্ঠতা—সেই প্রভাকর ডি'কস্টার সম্পর্কেও পুলিসের খবর ভালো নয়।

শেষেরটুকু আমার কথায় বিশ্বাস করে বলেছে।

প্রথমটুকু শুনেই ডক্টর চ্যাটার্জির কানের পর্দায় যেন বোমা ফেটেছে। ছিটকে বাড়ি চলে এসেছেন তিনি। তারপর ক'টা দিন সত্যিকারের এক পুরুষের দুর্জয় রাগ আর ক্ষোভ দেখেছি আমি। মুখ কালো করে সুমিত্রা তবু প্রতিবাদের চেষ্টা করেছিল একটু। বলেছিল, বাপের অন্যায়টা তুমি ছেলের ঘাড়ে চাপাতে

চাইছ কেন ?

বাইরে গোবেচারা মুখ করে বসে আমি।

ভিতরে দ্বিগুণ গর্জন।—শাট্ আপ! হি ইজ এ ট্রেটর'স সন, ছাট'স এনাফ! আর কিছু জানার আমার দরকার নেই। তবু তার সম্পর্কেও ভালো কিছু শুনিনি আমি। এরপর তুমি একটি কথা বললে আমি জানব আমার মেয়ে নেই—সী ইজ ডেড! ডেড!

বলার আর দরকার হল না। সর্বত্র কেমন করে যেন রটে গেল, কে ট্রেটব, কোন ছেলের বিশ্বাসঘাতক বাপ ডক্টর চ্যাটার্জির মতো দেবতুল্য মানুষকে জেলে পাঠিয়ে দেশের অমঙ্গল করতে চেয়েছে। সোস্যাল ওয়ার্কার আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাণ্ডা প্রভাকর ডি'কস্টাকে নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। তিন দিনেব মধ্যে সে গোয়া থেকেই নিপাত্তা।

হঠাৎ এ-ভাবে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কি করে সুমিত্রা চ্যাটার্জি ভেবে পায় না। তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে আমাকে। ভিতর দেখে নিতে চেষ্টা করে। এত বড় খবরটা তার বাবা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে তা শুনেছে নিশ্চয়। তবু আমাকে অবিশ্বাস। আমার প্রতি অকরুণ।

তার এই মেজাজের ওপর দিয়ে মেজাজ চড়ালেন ডক্টর চ্যাটার্জি। মেয়েকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। বললেন, এবারে যে বিয়ে দিতে পারছেন সেটা শুধু তার ভাগ্যি নয় তার বাবারও ভাগ্যি!

বিয়ে হয়ে গেল। সুমিত্রা চ্যাটার্জি সুমিত্রা বড়ুয়া হল।

এখন আমার শুধু নিরীহ স্বামীর ভূমিকা। কিন্তু সুমিত্রা আমাকে নিরীহ ভাবল না। তার বদ্ধ বিশ্বাস এই সব কিছুর পিছনে আমার বড় রকমের কিছু ষড়যন্ত্র আছে। বিয়েতে আপত্তি করল না বটে, ভিতরটা তার তীক্ষ্ণ সন্ধিৎসু হয়ে থাকল।

আমার ঘরের প্রথম রাতেও সে কঠিনই থাকতে চেয়েছে। হয়তো বা এতকালের প্রতীক্ষার পর আমার দখল নেবার ব্যাপারটা নগ্ন স্থূল কলাকৌশল বর্জিত লাগছিল তার। আর তাইতেই হয়তো কিছু মনে পড়ে গেছল। স্নায়ুতে ধাক্কা দেবার মতো করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার ঘরের এ্যালবাম থেকে ফোটো চুরি করেছিল কে ?

তার দিক থেকে সমর্পণের অন্তরায় যেন এটুকুই। তাকে ছেড়ে দিয়ে শয্যা থেকে নেমে এলাম। স্যুটকেস খুলে ছবি তিনটে বার করে সামনে ধরলাম।—এগুলোর কথা বলছ ?

রাগে দু-চোখ ধক-ধক করতে লাগল তার। আবার গায়ে হাত দিতে ছিটকে সরে যেতে চাইল। তারপর কিছুটা ভয়ে কিছুটা বা হতাশায় আমার ভিতরের ঠাণ্ডা প্রায়-নিষ্ঠুর মানুষটার হদিস পেল বোধ হয় সে। হাল ছাড়ল। বিস্মৃতির রসাতলে ডুবে যাবার আগেও দু-চোখ টান করে আমাকে দেখে নিতে লাগল।

না, তার দিক থেকে বিয়েটা সুখের হয়নি। আমার প্রতি সন্দিগ্ধ। অবিশ্বাস। ক্ষোভ। এখনো তার ধারণা যা ঘটেছে তার বাইরে আরো কিছু আছে যা সে জানে না। বললে যদি ওর মন পেতাম বলে দিতাম। গোপনতা আমারও ভালো লাগে না। এখানে কর্ণফুলি না থাক, চারিদিকে সমুদ্র। তার কোনো নির্জনে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলার মতো অকপটে কিছু স্বীকার করে ভিতরটা হালকা করে নেবার তাড়না বোধ করি। কিন্তু সুমিত্রা কর্ণফুলীও নয়, সমুদ্রও নয়!

তার বাবা সে-রকম শক্ত মানুষ না হলে এ বিয়ে ভেঙে যেত। বিয়ের পর তার বাবা যে আমার প্রতি আরো স্নেহপ্রবণ আরো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন তাও সুমিত্রার অগোচর নয়। ফলে বুদ্ধিমতীর মতো কিছুটা আপোসের রাস্তাই ধরল সে। এইখানেই জিৎ তার। আমি স্নেহ মায়া মমতার কাঙ্গাল। ভোগের কাঙ্গাল। তাছাড়া তার ভোগের দোসর হিসেবেও আমাকে তুচ্ছ করতে পারেনি সে। অনেক রাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে, স্বেচ্ছায় বিস্মৃতির অতলে ডুবতে চেয়েছে।

একটু একটু করে দুজনের মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠছে মনে হয়। আমি আনন্দে আত্মহারা। বিয়ের এগারো মাসের মধ্যে সুমিত্রার সন্তানসম্ভাবনার সময় এগিয়ে এলো। ভারী মাস। অনাগত শিশুকে ঘিরে আমাদের প্রীতির বন্ধন যেন আরো শক্তপোক্ত হয়েছে। আমি বাতাসে ডানা মেলে সাঁতার কাটছি।

ট্রাজেডিব নায়ক নিজের কবর নিজে খোঁড়ে নাকি। সেই অমোঘ অদৃষ্ট আমারও।

সন্ধ্যার পর সুমিত্রার কাছে বসেছিলাম। ফোনে নার্সিং হোম থেকে অ্যাকসিডেন্ট কেস আসার খবর পেলাম একটা। সংকটাপন্ন অবস্থা। অ্যাকসিডেন্ট যার তার নাম প্রভাকর ডিক'স্টা—

টেলিফোনেই আঁৎকে উঠলাম আমি।—প্রভাকর ডি'কস্টা!

আঁতকে উঠল সুমিত্রাও। চেঁচিয়ে উঠল, কি হয়েছে? কি হয়েছে তার?

কোন কথা না বলে তৈরি হয়ে নিলাম। সুমিত্রা ছুটে এসে গাড়িতে উঠল, সেও যাবে। বাধা দিলাম না।

সত্যিই সাংঘাতিক ব্যাপার। একটা ট্রাক-এর সঙ্গে হেড-অন কলিশন। যারা স্বচক্ষে দেখেছে তাদের রিপোর্ট প্রচণ্ড স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল প্রভাকর ডি'কস্টা। মাথা ফেটে চৌচির। বুকের আঘাতও মারাত্মক। জ্ঞানের লেশমাত্র নেই।

দু'হাতে মুখ ফাঁক করে ঝুঁকে পড়লাম। কেন অ্যাকসিডেণ্ট বোঝা গেল না। মদে চুর হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমার করার কিছু ছিল না। ভোররাতের মধ্যে শেষ। পরদিন পোস্টমর্টেম রিপোর্টে-ও অতিরিক্ত মদ্যপানের খবর বেরিয়েছে।

সুমিত্রা অঝোরে কাঁদছিল। আমি নিঃশব্দে তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম।

হঠাৎ কান্না থামিয়ে ও বলে উঠল, কিন্তু প্রভাকর তো মদ কখনো ছুঁতো না আগে? কখনো খেত না!

আমি জানি। এর আর কি জবাব আছে! আমি নিরুত্তর। আমার দু হাত জড়িয়ে ধরে সুমিত্রা আকুল হয়ে বলে উঠল, তোমার যে সন্তান আসছে তার দিব্বি, আজ তুমি সত্যি কথা বলো। বলো যে কলঙ্ক মাথায় করে প্রভাকর চলে গেছল তা সত্যি কি না? আমার বাবাকে তার বাবাই জেলে পাঠিয়েছিল কিনা?

—সত্যি পাঠিয়েছিল।

—বাবা সেটা জানল কি করে?

আমার অন্তরাত্মায় কে যেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল, স্বীকার করো কবুল করো—সমস্ত গোপনতা উজাড় করে মুক্তির বাতাস নাও। যে স্ত্রীকে তুমি ভালবাসো তার কাছেও যদি স্বীকার করার এই মুহূর্তটি নষ্ট করো তাহলে গোপনতার ওই কাঁচঘর আর কোনদিন ভাঙা যাবে না, আর কোনদিন ভাঙতে পারবে না।

অকপটে বললাম সব। গোপনতার কাঁচঘর ভেঙে দিলাম। ফুসফুস ভরাট করে মুক্তির নিঃশ্বাস নিলাম।

—অ্যাণ্ড রেজাল্ট? এ ডিজাস্টার। এই মুক্তির এত দাম জানতাম না।

ঘরের বাতাসও থেমে আছে বুঝি। স্তব্ধ থমথমে মুহূর্ত গোটাকতক।

হঠাৎ সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল লোকানন্দ বড়ুয়া। উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। সেই আগের রাতের মতোই চেঁচিয়ে উঠল, সাড়ে এগারোটা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি! ইউ মাস্ট লীভ মি নাও—ইউ মাস্ট! আই হেট ছাট আওয়ার অফ দি নাইট! তার আগে আমাকে ঘুমোতে হবে, না ঘুমোতে পারলে

ইনজেকশন নিতে হবে। আপনি যান। এক্ষুনি চলে যান!

সোমেন মিত্র আজও একটা বড রকমের ধাক্কা খেয়েই বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

॥ সাত ॥

পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে কাটানোর পর আর ধৈর্য থাকল না। সোমেন মিত্র বিদিশার বার-এ টেলিফোন করে ডকটর বড়ুয়ার খোঁজ করলেন। শুনলেন তিনি আসেননি এখনো। তাঁর ঘরেও নেই।

এ-সময় ঘরে থাকবে না জানা কথাই। কি ভেবে সোমেনবাবু নিজের নাম আর ফোন নম্বর দিয়ে অনুরোধ করলেন বার-এ আসার সঙ্গে সঙ্গে ডকটর বড়ুয়াকে যেন এই নম্বরে একটা টেলিফোন করতে বলা হয়।

এতকালের লেখক সোমেন মিত্র সত্যিই যেন একটা অ্যাবসার্ড লাইফ-স্টোরির তিন রাস্তার সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে গেছেন। এত কৌতূহল এখন যে রাতে ভালো ঘুম হয়নি। এমন বিচিত্র মানুষও আর দেখেছেন কিনা জানেন না। কালও রাত সাড়ে এগারোটার আগে হঠাৎ যে উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি দেখেছেন তার মেজাজ না বুঝে আবার গিয়ে হাজির হতে পারছেন না।

টেলিফোনের জবাব এলো রাত সাড়ে দশটায়। বিদিশার ম্যানেজার জানাচ্ছে, ডকটর বড়ুয়া এইমাত্র তাঁর ঘরে ফিরেছেন। তিনি খবর দিতে বললেন, সামনের তিন-চারদিন ব্যস্ত থাকবেন তিনি—পরে তিনিই মিস্টার মিত্রকে টেলিফোন করবেন।

এই বার্তাও আশা করেননি সোমেন মিত্র। নিজের ওপরেই বিরক্ত একটু, টেলিফোন না করলেই ভালো হত। ওখান থেকে টেলিফোন না পেলে হুট করে তাঁর গিয়ে হাজির হওয়াও মুশকিল এখন।

পরের চার দিনের মধ্যে টেলিফোন এলো না। কিন্তু বিকেলে অপ্রত্যাশিত-ভাবে দীপু সরকার আর নূপুর ব্যানার্জি এসে হাজির। আর তাদের মুখ দেখেই সোমেনবাবুর মনে হল খবর আছে।

নূপুরের আজকের বেশবাস বা প্রসাধনে বাড়তি জলুস নেই। সাদাসিধে পরিচ্ছন্ন। এতেই যেন মেয়েটাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। নত হয়ে পায়ের ধুলো নিতে সোমেনবাবু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, ছবি বন্ধ হল বলে বেজায় মন খারাপ শুনলাম।

নূপুর কিছু বলল না। জবাবটা দিল দীপু সরকার।—মন খারাপ বলে মন খারাপ! এখন আবার একটু আশার ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। কাল মোহনদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি জানালেন, আর একজন ফিনানসিয়ারেব সঙ্গে কথাবার্তা অনেকটা এগিয়েছে। ম্যাচিওর করলে সামনের মাসেই কাজ শুরু করে দেবেন বললেন।·· কিন্তু আমরা যে দাদা এদিকে অথৈজলে পড়ে গেলাম একেবারে। আপনাব ওই বিদিশার লোকানন্দ বড়ুয়া পাগল কি আর কিছু—কিছুই বুঝতে পারছি না। আজ সন্ধ্যায় আমাদের আপনাকে সঙ্গে করে তার ওখানে যাবার কথা, যাব কি যাব না সেই পবামর্শ করতেই আপনার কাছে আসা। নূপুরেব দিকে ফিরল, দাদাকে বলো না সব—কিচ্ছু লজ্জা করতে হবে না, দাদা আমাদের ব্যাপাব-স্যাপার সবঁ জানেন।

মেয়েটা বিব্রত বোধ করতে লাগল। সোমেনবাবুব ভিতরটা উন্মুখ হয়ে উঠেছে আবার। দীপুকেই তাগিদ দিলেন, তুমিই বলো না শুনি—তাঁর সঙ্গে কোথায় দেখা হল ?

দীপু জবাব দিল গত চাব দিন ধরেই ঘণ্টার পব ঘণ্টা দেখা হচ্ছে—প্রথম দেখা হয়েছিল রাস্তায়, উনি রাস্তায় রোগী দেখছিলেন—তারপর থেকে দেখাব আর কামাই নেহ। নূপুরের বাবা-মায়ের কাছে সে এখন দেবদূতের মতো কেউ।

যেভাবে বলল—নূপুরেব মুখে লালের আভাস আরো, বিরক্তিকরও।—তুমি তো ভালো কাউকেই দেখো না।···না দাদা, ভদ্রলোক খুব অদ্ভুত বটে কিন্তু খারাপ মনে হয় না আমার।

দীপু মন্তব্য কবল, ভালো হলেই ভালো।

সোমেন মিত্র তাগিদ দিলেন, ব্যাপারখানা কি খুলে বলবে ?

দীপু সরকার বলে গেল। সোমেনবাবু কান পেতে শুনলেন।

··তিন দিন আগে সকাল নটা-দশটার সময় উত্তর কলকাতার একটা রাস্তার ফুটপাথ ধরে ওরা দুজন যাচ্ছিল। দীপু আর নূপুর। মনমেজাজ কারোরই ভালো ছিল না। ফুটপাথে জনাকতক লোকের ভিড দেখে পাশ কাটাতে গিয়ে দুজনেই দাঁড়িয়ে গেল। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের একটি কঙ্কালসার মেয়েছেলে বসে আছে। তার পাশে একটা দশ-এগারো বছরের মেয়ে শুয়ে। খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে মেয়েটা, ছটফট করছে। পাশে তার কঙ্কালসার মা কাঁদছে। পেটমোটা ব্যাগ খুলে মেয়েটার চিকিৎসায় বসে গেছে আমাদের লোকানন্দ বড়ুয়া। তার গায়ে সেই ঢোলা শাদা কোর্তা। তাই দেখতে ভিড জমে গেছে রাস্তায়। সকলে

পাদ্রী ডাক্তার গোছের কেউ ভাবছে তাকে।

চিকিৎসা কতক্ষণ আগে থেকে শুরু হয়েছে দীপুরা জানে না। বড়ুয়া সাহেব একটা ইনজেকশন দিল মেয়েটাকে। মেয়েটা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠতেই ডাক্তারের এক ধমক খেয়ে চুপ। তারপর তেমনি ধমক খেয়েই মেয়েটার মা কাঁদতে কাঁদতে জানালো, গাঁয়ের খুব গেরস্তঘরের বউ সে, স্বামী তাদের খেতে দিতে না পেরে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। পেটের জ্বালায় দুদিন আগে ভিক্ষে করে খাবে বলে মেয়ের হাত ধরে শহরে এসেছে। আজ হঠাৎ মেয়েটার এরকম অবস্থা।

ডক্টর বড়ুয়া রাগত মুখে ভিড়ের দিকে তাকিয়েই দীপু আর নূপুরকে দেখতে পেল। ভিড় করা লোকদের ধমকে ভরানো আর হল না। ওদের দেখে বেজায় খুশি। দীপুর ধারণা নূপুরকে দেখে খুশি। বলল—দেখা যখন হয়ে গেল তোমাদের কপালে আজ দুঃখ আছে, রোসো। দীপুকে হুকুম করল একটা ট্যাকসি ধরতে।

আধ মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্‌সি মিলল। ময়লা জামা পরা ছোট মেয়েটাকে পাঁজাকোলে করে উঠে দাঁড়াল বড়ুয়া সাহেব। তার মাকে ডাকল, এসো।

মেয়েছেলেটা হকচকিয়ে যেতে আবার ধমকে উঠল, ফুটপাথে মরে লাভ কি, নিজেও গেছ মেয়েটাকেও আধমরা করেছ—এসো তাড়াতাড়ি।

দীপু আর নূপুরকে বলল—এসো তোমরা। আমার ব্যাগটা আনো।

মেয়েটাকে পাঁজাকোলে করেই ট্যাকসির পিছনের সিটে বসল সে। জড়সড় মেয়েছেলেটা তার পাশে বসল। সামনে ড্রাইভারের পাশে পেটমোটা ব্যাগ হাতে দীপু, তার পাশে নূপুর। এই লোকের পাল্লায় পড়ে ওদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলে কিছু নেই যেন।

বড়ুয়া সাহেবের নির্দেশে উত্তর কলকাতা ছাড়িয়ে বারাসতের দিকে চলল ট্যাকসি। বহুক্ষণ চলার পর কাঁটা তার আর জংলাগাছের বেড়া দেওয়া বেশ বড়সড় একটা এলাকার মধ্যে ঢুকে গেল ট্যাকসিটা। ভিতরে অনেকগুলো ছনের ঘর, আবার ছোট একটা পাকা দালানও আছে। ভিতরে সবজির বাগান আর পুকুরও দেখা গেল।

একটু বাদেই বোঝা গেল এটা অনাথ ভবন একটা। মিসেস সমাজদার নামে এক প্রৌঢ়া মহিলা চালাচ্ছেন এটা।

নামটা শোনা মাত্র সোমেন মিত্রর মনে পড়েছে বিদিশায় সেই রাতে মিসেস সমাজদার নামেই এক মহিলার সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল বড়ুয়া সাহেবের—তাঁকে

সেই রাতে আসতে নিষেধ করা হয়েছিল !

রোগী কোলে বড়ুয়াকে ট্যাকসি থেকে নামতে দেখে মিসেস সমাজদার আর আরো দু-তিনটি মহিলা ছুটে এলেন। বড়ুয়া সাহেব একটা খুপরি ঘরে মেয়েটাকে শুইয়ে দিল, তার মাকেও সেখানে বসতে বলল।

তারপর আপিস ঘরে এসে একটা লম্বা প্রেসক্রিপশন লিখে মিসেস সমাজদারের হাতে দিল। বললে—এই অনুযায়ী ওষুধ আর পথ্য যেন পড়ে। মেয়েটার অবস্থা ভালো না। সে আবার সন্ধ্যার পরে এসে দেখে যাবে। আর মেয়েটার মায়েরও একটু ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলল।

তারপর যে কাণ্ড কবল দেখে দীপুর আর নূপুরের চক্ষুস্থির। উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের লম্বা আলখাল্লা সরিয়ে দু পকেট থেকে তিন পাঁজা নোট বার করল। সব ব্যাঙ্ক থেকে তোলা আনকোরা একশ টাকাব বাণ্ডিল। বড বাণ্ডিল দুটোয় বিশ হাজার—ছোটটায়ও কম করে হাজার তিনেক হবে।

দশ দশ হাজারের বাণ্ডিল দুটো বড়ুয়া সাহেব মিসেস সমাজদারের হাতে এমনভাবে দিল যেন দশ টাকার নোট দুটো। ছোট বাণ্ডিলটা আবার ট্রাউজারের পকেটে রাখতে রাখতে বলল—আপনি ব্যস্ত হয়েছিলেন জানি, কিন্তু গোয়ার ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাটারা এখানকার ব্যাঙ্কে অ্যাডভাইস পাঠাতে দেরি করল। যাক, এরপর একেবারে যা দেবার দিয়ে যাব—হউ নিডণ্ট বদার।

দীপু আর নূপুরকে ডেকে নিয়ে আবার সেই ট্যাকসিতেই ফেরা হল। এবার তিনজনেই পিছনে বসল, ইচ্ছে করেই দীপু সামনে গেল না। অতগুলো করকরে টাকা দিতে দেখে দীপুর মাথা ঝিম-ঝিম করছে বটে, তবু সামনে বসলে পিছনে বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখাটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। তারা দু পাশে দুজনে, মাঝে নূপুর। লোকানন্দ বড়ুয়া নূপুরের দিকে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রইল। শেষে বিচ্ছিরি করে জিজ্ঞাসা করল, এই রোদে প্রোডিউসার খুঁজতে বেরিয়েছিলে ?

নূপুর জবাব দিল না। তারও বোধ হয় বিশ হাজার টাকা ওভাবে দিয়ে আসতে দেখে মাথা ঝিমঝিম করছিল। একটু বাদে বড়ুয়া সাহেব আবার কড়া করে বলল—তোমাকে দেখা করতে বলেছিলাম, এলে না কেন ?

নূপুর হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে। তখন দীপু বলল—সোমেনবাবু বলেছিলেন, কিন্তু সে-ই নূপুরকে কিছু জানায়নি।

বড়ুয়া সাহেব তখন দীপুকেই খেঁকিয়ে উঠল, কেন ?

দীপু বলল—সে বিবেচনা করছিল।

বড়ুয়া সাহেব বলল—ইউ আর অ্যান অ্যাস।

শুনে দীপুর ইচ্ছে করছিল গাড়ি থামিয়ে নূপুরকে নিয়ে নেমে যায়। কিন্তু তখনো কলকাতা ঢের দূর আর লোকটার ট্রাউজারের পকেটে অনেক টাকা—তাই পারা গেল না। অন্তত শ'খানেক টাকা আজ তার ভয়ানক দরকার—নূপুরদের জন্যেই দরকার। পাকে-প্রকারে সেটা জানানো যায় কিনা ভাবছিল।

এরপর বড়ুয়া সাহেব আর একটাও কথা বলল না। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে নূপুরকে দেখতে লাগল। দেখে যেন রাগও হচ্ছে মজাও পাচ্ছে। দীপু যে পাশে বসে আছে তাও ভুলে গেল, এক-একবার ওর মুখ থেকে পা পর্যন্ত বেয়ে বেয়ে নামতে লাগল তার চোখ দুটো।

এ জায়গায় নূপুর চাপা বিরক্তিতে বলল—বাজে অসভ্যতা কোরো না।

দীপু জবাব দিল, আমি যেমন যেমন দেখেছি আর শুনেছি বলে যাচ্ছি।

গাড়ি উত্তর কলকাতায় আসতে বড়ুয়া সাহেব নূপুরকে হুকুম করল, ড্রাইভারকে তোমার বাড়ির রাস্তা বলে দিও। নূপুর ভ্যাবাচাকা খেয়ে দীপুর দিকে তাকালো। আর ঠিক সেই সময়েই দীপুর মাথায় মোক্ষম বুদ্ধিটি এলো। বলল—ঠিক আছে, ভালই হয়েছে—আমরা তো ডাক্তারের খোঁজেই বেরিয়েছিলাম, উনি গেলে উনিই মাসিমাকে একবারটি দেখে যেতে পারবেন।

ওদের দুজনকে অবাক করে বড়ুয়া সাহেব নূপুরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মায়ের তো গ্যাসট্রিক আলসার?

যা-ই হোক নূপুর মাথা নাড়ল, তাই।

বড়ুয়া সাহেব ফস করে তক্ষুনি আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবার চোখের ছানির অবস্থা কি?

দু'জনেরই ওদের মাথা ঘুরে যাবার দাখিল। তারপর দীপু ভাবলো সোমেন বাবুর মুখ থেকে শুনে থাকবে। সে-ই জবাব দিল, এখন আর একেবারেই দেখতে পান না।

—ইউ শাট আপ! বড়ুয়া সাহেব খামোকা ধমকে উঠল তাকে। তারপর আধখানা ঘুরে বসল। মাথাটা নূপুরের মুখের দিকে ঝুঁকল একটু। দীপু ঘাবড়ে গেল, দিনেদুপুরেই কিছু একটা কাণ্ড না করে ফেলে!

এ-জায়গায় চোখমুখ লাল করে নূপুর দীপুকে নীরবে শাসালো।

আরো ঝুঁকে চোখ ঘোরালো করে বড়ুয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করল, দ্যাট স্কাউণ্ড্রেল স্টিল রানিং আফটার ইউ?

উপেন হালদারের কথা বলল কি মোহন চৌধুরীর কথা দুজনের কেউ বুঝল না। নূপুর সভয়ে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল।

একগাদা বিল ওঠা সত্ত্বেও ট্যাকসিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বড়ুয়া সাহেব নূপুরদের ভেঙে-পড়া দু-ঘরের একটাতে ঢুকল। নূপুরের মা সত্যিই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না এখন। দশ মিনিট অন্তর অন্তর কিছু মুখে না দিলে অসহ্য যন্ত্রণা। অন্য সময়েও যন্ত্রণা। তিনি এক চৌকিতে শুয়ে। অন্য চৌকিতে নূপুরের বাবা। উনি ড্যাব ড্যাব করে তাকান, কিন্তু কিছুই দেখেন না।

…হ্যাঁ, ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে অনেক যত্ন করে নূপুরের মা-কে দেখেছে সেটা দীপু অস্বীকার করতে পারে না। আর রোগের সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অজস্র কথাও জিজ্ঞাসা করল। আর ক্রমে মুখখানা থমথমে হয়ে উঠতে লাগল তার। এক রাগী দেখা শেষ করে উঠে নূপুরের বাবারও দু-চোখ টেনে দেখল, তারপর টর্চ ফেলে দেখে মুখখানাকে ভেংচি কাটার মতো করল।

পাশের ঘরে এনে একটা ভাঙা চেয়ারে বসতে দেওয়া হল তাকে। সেই চেয়ারে একটা পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝালো গলায় নূপুরকে ধমকে উঠল, মা-বাবার এই অবস্থা আর তুমি ছবিতে নামবে বলে প্রোডিউসার খুঁজে বেড়াচ্ছ ?

এবারে নূপুরও জবাব দিল, তা না হলে চিকিৎসা করব কি দিয়ে ?

চেয়ার থেকে পা নামিয়ে ওটাতে বসে পড়ল। রাগে গরগর করছে তখনো। ব্যাগ থেকে প্যাড বার করে একগাদা লিখে যেতে লাগল। এক দুই করে এক পাতা লেখা শেষ করে নূপুরের হাতে দিল, এই ওষুধ আর এই ডায়েট চলবে—শুধু আজকের জন্যে। কাল সকালের মধ্যে পেটের এক্স-রে করতে হবে—গ্যাসট্রিক নয়, পেপটিক আলসার মনে হয়। আমি আজকের মধ্যেই কোথাও অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে কাল সকালে আসব। বাঁচাতে হলে অপারেশন করতে হবেই মনে হচ্ছে—আর সে অ্যারেঞ্জমেণ্টও দু-তিন দিনের মধ্যেই করতে হবে।—তোমার বাবাকে কোনো চোখের ডাক্তার দেখানো হয়েছে ?

নূপুর বলল, শীগগির হয়নি।

—ওয়ার্থলেস! রাগ করে উঠে চলে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে গিয়ে কোর্তা সরিয়ে ট্রাউজারের পকেটে হাত দিল। একশ টাকার ছোট বাণ্ডিলটা বেরিয়ে এলো। না গুনে আন্দাজে মাঝামাঝি জায়গায় ধরে দু' হাতে টেনে দু ভাগ করে ফেলল নোটগুলো। তারপর আলগাগুলো নিজের পকেটে রেখে পিন-আঁটা ভাগটা নূপুরের হাতে গুঁজে দিল। বলল, কাল সকাল আটটার মধ্যে আসব, মা-কে নিয়ে রেডি থেকো।

লম্বা পা ফেলে চলে গেল। দীপু গুনে দেখল উনিশখানা একশ টাকার নোট।

…পরদিন ঠিক সকাল আটটাতেই ট্যাকসি নিয়ে এলো। নিজেই নূপুরের

মাকে প্রায় আলতো করে তুলে নিয়ে ট্যাকসিতে বসালো। তাঁর দুদিকে বড়ুয়া সাহেব আর নূপুর। সামনে দীপু।

কোনো বড় রেডিওলজিস্টের চেম্বার হবে। বার বার বেরিয়াম পীল খাইয়ে একগাদা একস-রে নিতে নিতে বেলা আড়াইটা গড়িয়ে গেল। বড়ুয়া সাহেব রেডিওলজিস্ট-এর হাতে চারখানা একশ টাকার নোট দিয়ে বলল, কাল সকালের মধ্যে চাই—ইটস ভেরি আরজেণ্ট।

ট্যাক্সিতে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

পরদিন মানে পরশু বিকেল চারটেয় এসে হাজির। সেখান থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে নূপুরের মা-কে তুলে নিয়ে মাঝ-কলকাতার এক নার্সিং হোমের কেবিনে।

দীপু সরকার খবর নিয়েছে কেবিন আর নার্স ধরে দিনে একশ পনের টাকা চার্জ। পনের দিনের টাকা আগাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ওপর ওষুধ আর অপারেশনের মোটা ফী লাগবে।

এখানেই শেষ নয়। কালও বিকেলে লোকানন্দ বড়ুয়ার ট্যাকসি নূপুরের বাড়ির দরজায় হাজির। এবারে ওর বাবার পালা। সে ভদ্রলোককেও একজন বড় চোখের ডাক্তারের কাছে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কথাবার্তা আগেই বলা ছিল মনে হয়, চোখের বড় ডাক্তারকে কত গুনে দিতে হয়েছে দীপুরা জানে না।

পনের মিনিটের মধ্যে চোখের বড় ডাক্তার তার পরীক্ষা শেষ করে হাসপাতালে অ্যাডমিশনের অ্যাডভাইস লিখে দিয়েছে। বড় হাসপাতালের চোখের বিভাগের বড় কর্তা সেই ডাক্তার ভদ্রলোক।

আজ সকালে নূপুরের বাবাকে সেই হাসপাতালের কেবিনে চালান করা হয়েছে। তখনো বড়ুয়া সাহেব সঙ্গে ছিল। দশ দিনের কেবিনের ভাড়া আর আনুষঙ্গিক খরচা আগাম গুনে দিয়েছে।

তারপর ট্যাকসি চেপে নূপুর আর দীপুকে নিয়ে আবার নূপুরদের বাড়ি। ভাঙা চেয়ারে বসে একগাল হেসে বড়ুয়া সাহেব নূপুরকে বলেছে, নাও ম্যাডাম, ইউ হ্যাভ ডান ইওর লিটল জব—এখন তুমি তোমার ছবির কথা ভাবতে পারো।

এ-জায়গায় মন্তব্যের সুরে দীপু বলল, ও কথার জবাবে নূপুর বুদ্ধিমতীর মতো একটা কাজ করল। কেঁদে ফেলল।

তার ভ্রূকুটি এড়িয়ে দীপু সরকার বলল, যাবার আগে বড়ুয়া সাহেব হুকুম করে গেল, আজ সন্ধ্যার পর আপনাকে নিয়ে আমরা যেন তাঁর ওখানে অর্থাৎ বিদিশায় যাই—আর বলল, ছবির আলোচনা যদি হয় সেখানেই হবে। আমি তো হত-

বুদ্ধি দাদা, নূপুর বায়াস্‌ড—এখন আপনি বলুন কি করব। মানুষ এত সহজে এত টাকা কি করে খরচা করতে পারে তাও ভেবে পাই না। লোকটার কত টাকা!

লোকানন্দ বড়ুয়া সাদর অভ্যর্থনা জানালো সকলকে। দীপু দোতলার বার-এ একবার উঁকি দিয়েছিল। সেখানে তাকে না দেখে তিনতলার সুইটএ আসা হয়েছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, একমুখ হেসে মাথা ঝাঁকালো।

সুপুষ্ট হাত বাড়িয়ে অনায়াসে ওর একখানা হাত ধরে ভিতরে নিয়ে এলো। পিছন থেকে দীপু সরকার ঘাড় বেঁকিয়ে সোমেনবাবুর দিকে তাকালো।

নূপুরকে পরিপাটী শয্যার ওপর বসিয়ে দিল।—বি কমফরটেবল। সোফা দুটো দেখিয়ে বাকি দুজনকে বলল, সীট ডাউন জেণ্টলমেন। জানলার পুরু পর্দা দুটো হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে দিয়ে হাওয়া চলাচলের পথ সুগম করল। পাখার স্পীডও আর একটু বাড়িয়ে নূপুরের পাশেই বসল। দীপু সরকারের মুখ আবার গম্ভীর একটু।

নূপুরের দিকেই একটু বেঁকে বসেছে ডক্টর বড়ুয়া, ফলে বসাটা আরো ঘনিষ্ঠ লাগছে।—বাবা-মা-কে দেখতে গেছলে?

—মায়ের কাছে দুপুরে গেছলাম, বিকেলের দিকে বাবাকে দেখে ওঁর কাছে এসেছি।

ওঁর কাছে অর্থাৎ লেখকের কাছে। পলকা ধমকের স্বরে বড়ুয়া সাহেব বলল, ফিরবে তো টালা ছাড়িয়ে কোন ধ্যাড়ধেড়ে জায়গায়, আসতেই আটটা বাজালে!

উঠে টেলিফোনে রুম সার্ভিস ডেকে ফিরে আবার বসতে গিয়ে দীপু সরকারের দিকে চোখ গেল। পলকা ভ্রূকুটি আবার একটু। সোমেনবাবুর দিকে চেয়ে বলল, দীপুর কাঁধে এখন ভয়ানক দায়িত্ব—

সোমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল!

মুখখানা দেখছেন না। নূপুরের বাবা-মা হাসপাতালে, পাহারা দেবার জন্য রাতে ওকে এখন নূপুরদের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে—ঝামেলা না!

নূপুরের মুখ লাল। দীপু সরকারও না হেসে পারল না।

বেয়ারা আসতে বড়ুয়া সাহেব হুকুম করল, বিশ মিনিটের মধ্যে এই ঘরে ডিনার চাই, ম্যানেজারকে বলা আছে, কুইক! আর একটা ছোট সেণ্টার টেবিল আনবে—চেয়ার দরকার নেই।

বেয়ারা চলে যেতে হৃষ্ট মুখে বলল, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিনই রাত্তিরে খাওয়া হয় না—আজ চারটি জুটবে।

বিদিশায় এলেও এই ঘরে বসে ডিনার সারা হবে দীপু সরকার আশা করেনি। বলেই ফেলল, আবার এখানে টানা-হেঁচড়া না করে আমরা নিচে গেলেই তো হয়।

বড়ুয়া সাহেব চটপট জবাব দিল, হয় কিন্তু সেখানেও জলীয় বলতে জল ছাড়া আর কিছু পাবে না—এগ্রিড ?

মুখ দেখেই বোঝা গেল অনেক দিন বাদে একটু ভালো তরল রসদের আশায় ছিল বেচারা। হাসতে চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি ড্রিংক ছেড়ে দিলেন নাকি !

ঈষৎ রুক্ষ জবাব।—আমি ছাড়ব কেন। ইউ স্টুড।

প্রকারান্তরে বলে দেওয়া, তোমার অবস্থায় মদ খাওয়া সাজে না। দীপুর মুখ দেখে সোমেনবাবুর মনে হল সে না উঠে যেতে চায় এরপর ! নূপুরকে দেখে কিন্তু একটুও অখুশি মনে হল না তাঁর। বড়ুয়ার দিকে চেয়ে সেই মুহূর্তে অন্য কৌতূহল সোমেনবাবুর। আজকের রাত সাড়ে এগারোটায়ও এই লোকের মূর্তি বদলাবে কি ?

তিনজন বেয়ারার তৎপরতায় সরঞ্জাম সহ পনের মিনিটের মধ্যেই ডিনার এসে গেল। এ ব্যবস্থায় কার্পণ্য নেই। চিকেন স্যুপ, ফুল চিকেন রোস্ট অ্যাণ্ড ব্রেড, ভেজিটেবল স্যালাড আর পুডিং।

বেয়ারাদের বিদায় করে খুশি মুখে বড়ুয়া নূপুরকে বলল, এসো, আমরাই অতিথি সেবা করি।

স্যুপ শেষ হতে দুটো সেণ্টার টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসা হল। বড়ুয়ার দিকে চেয়ে সত্যিকারের খুশির খাওয়া দেখছেন সোমেন মিত্তির। খেতে খেতে সেই খুশিতে টান ধরালো দীপু সরকার। সোমেনবাবুর দিকে চেয়ে বলল, ছবির আলোচনাটা এবারে একটু সেরে নিলে হত দাদা···

জবাবে সোমেন মিত্তির তাকালেন বড়ুয়ার দিকে। নূপুরের প্রত্যাশা-মাখা দু'চোখও তার দিকেই। কিন্তু ওই লোকের মুখে বিরক্তির ছায়া। নূপুরকে বলল, খাসা রোস্ট করেছে, বাজে কথায় কান না দিয়ে পেট ভরে খেয়ে নাও। নইলে চৌদ্দ মাইল যেতে যেতে আবার খিদে পেয়ে যাবে।

চাপা অসহিষ্ণুতার দরুনই যেন নূপুরের বাড়ির দশ মাইল পথটাকে চৌদ্দ মাইল করে দিল। হঠাৎ এই মেজাজ কেউ আশা করেনি। প্রায় নিঃশব্দেই

খাওয়া চলল এরপর। শেষ কোর্স পুডিং-এ হাত পড়েছে সকলের। কোন্ দেশের খাওয়া কি-রকম লোকানন্দ বড়ুয়া সে-প্রসঙ্গে টুকটাক দুই-একটা কথা বলেছে। শেষে ডিশ নামিয়ে দীপু সরকারের দিকেই তাকালো।—ছবির কি আলোচনা ?

একটু আমতা-আমতা করে দীপু সরকার বলল, মোহনদা অন্য এক ফিনান-সিয়ারের সঙ্গে কথাবার্তায় কিছুটা এগিয়েছেন, কিন্তু আপনি ইনটারেসটেড হলে···

বাধা পড়ল।—কিসে ইনটারেসটেড হব ? ওই হাঙ্গরের পেটে টাকা ঢালব ?

বেজার মুখ করে দীপু সরকার বলল, কিন্তু গল্প তো তাঁর কেনা, তাঁকে একেবারে বাদ দিয়ে এ ছবি হবে কি করে ?

—হবে না। সাদাসাপটা জবাব। সে-সব গল্পও আমার পছন্দ নয়।

নৃপুর নির্বাক, বিমর্ষ। লেখককে একবার দেখে নিয়ে দুচোখ কপালে তুলল দীপু সরকার।—পসরার মতো গল্প আপনার পছন্দ নয় !

—নো-নো। গলার স্বর আরো যেন অসহিষ্ণু।—সী হ্যাজ সীন্ এনাফ অফ ভিশাস সার্কল।

ড্যাব-ড্যাব করে দীপু সরকার লেখকের দিকে তাকালো প্রথম। গল্পের নিন্দে শুনেও ভদ্রলোক চুপ করেই আছেন। নৃপুরের শুকনো মুখখানা দেখে নিয়ে বড়ুয়া সাহেবের দিকেই ফিরল আবার। তারও সহিষ্ণুতায় চিড় খেয়েছে। নিরীহ মুখ করেই বলল, কলকাতার শহরে ভিশাস সার্কল-এর আর অভাব কি, নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব যার যার নিজের। যাক আপনি তাহলে আমাদের ডেকেছিলেন কেন ?

—ওন্‌লি টু টেল ইউ দ্যাট ইউ আর অ্যান্ অ্যাস ! তপ্ত মুখে উঠে এসে জোরে কলিং বেল-এর বোতাম টিপে ধরল। যদি দরকার পড়ে সেজন্য একটা বেয়ারা বাইরেই অপেক্ষা করছিল। সে ঘরে ঢুকতে আঙুলের ইশারায় টেবিল পরিষ্কার করতে বলল। নৃপুরের কাছে এগিয়ে এলো আবার।—অনেক দূর যেতে হবে আর রাত কোরো না, ট্যাক্সিতে যাবে—টাকা আছে সঙ্গে ?

উঠে দাঁড়িয়ে নৃপুর তাড়াতাড়ি ঘাড় কাত করল। আছে।

অপমানে মুখ কালো করে দীপু সরকারও উঠে দাঁড়িয়েছে। সোমেনবাবুর দিকে তাকাতে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন, তিনি এখন যাচ্ছেন না।

নৃপুর পা বাড়াতে লোকানন্দ বড়ুয়ার দু'হাত তার দুই কাঁধে। মুখ গম্ভীর, চাউনি গভীর।—ডোণ্ট ওয়ারি টু মাচ, তোমার ভাবনা আমি ভাবছি—আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ?

বুঝুক না-বুঝুক নূপুর তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। কাঁধ থেকে হাত নেমে আসতেই দরজার দিকে পা বাড়ালো। দীপু সরকারের মুখ আরো কালো গম্ভীর।

তারা যাবার তিন-চার মিনিটের মধ্যে বেয়ারারা সরঞ্জামগুলো সরিয়ে ঘর পরিষ্কার করে চলে গেল। লোকানন্দ বড়ুয়া তখন রাস্তার দিকের একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। ওদের দেখার জন্য হতে পারে, এমনিও হতে পারে।

ফিরল।

সহজ ভাবেই সোমেন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, আজ ড্রিংক বাদ পড়ল, আপনার ঘুমের অসুবিধে হবে না?

—না। দরকার হলে অন্য ব্যবস্থা আছে। মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। —আর ইউ হার্ট?

সোমেনবাবু বিস্মিত যেন।—কেন?

—আই ডোণ্ট লাইক ছাট সী উইল বি দেয়াব এগেন···সী ইজ অ্যামবিশাস অ্যাণ্ড হি ক্যাণ্ট প্রোটেকট হার। আপনার গল্পের নিন্দে করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

চেয়ে আছেন সোমেন মিত্তিরও। বললেন, গল্পের গর্ব আমি করছি না।··· এখনো আমি অ্যাবসার্ড লাইফ-স্টোরির কোনো জায়গায় বসে আছি।

অপলক দুটো চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির একটু। চাউনি গভীর, কিন্তু অন্তর্মুখী যেন। সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। সাদা আলো দুটো নিভে গেল। ঘোর-লাগা হালকা নীল আলো জ্বলল।

॥ আট ॥

কেবল রাগ আর ঘৃণা, রাগ আর ঘৃণা গলগল করে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল সুমিত্রার ভিতর থেকে। যেটুকু মন-বোঝাবুঝি হয়েছিল দুজনের সে যে এত মিথ্যে ভাবা যায়নি। প্রভাকরের সঙ্গে তার বিয়ে নাকচের জন্য আমি দায়ী, মদ ছুঁতো না প্রভাকর ডি'কস্টা—এখন তার বেহুঁশ মাতাল হয়ে গাড়ি চালানোর জন্য আমি দায়ী। প্রকারান্তরে আত্মহত্যাই করেছে সে—সেই আত্মহত্যার জন্য শুধু আমিই দায়ী।

তখনকার মতো আর নিজের বাড়িতেও ধরে রাখা গেল না সুমিত্রাকে। বাপের বাংলোয় চলে গেল। ডক্টর চ্যাটার্জি ভাবলেন ছেলেপুলে হবার আগে মায়ের কাছে এসে থাকতে চায়। সে তার বাবাকে কিছু বলেনি, কিন্তু মায়ের

সহানুভূতি যে পেয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই। মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে জামাইয়ের প্রতিও সে-ভদ্রমহিলার আচরণ বদলেছে। স্বামীর ওপর জোর থাকলে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতেন। কিন্তু ভদ্রলোক সরল পুরুষ, বুদ্ধিমান। জামাইয়ের ওপর তাঁর স্নেহ আর নিভরতা বেড়েই চলেছে। আমি তাঁর ডান হাত। হার্টের সামান্য গোলযোগে ভুগে ওঠার পর এত বড় নার্সিং হোমের সব দায়দায়িত্ব নিশ্চিন্ত মনে আমার ওপর ছেড়ে দিতে পেরেছেন। সার্জন হিসেবেও জামাইয়ের প্রতিভা তাঁর গর্বের কারণ।

আমি বাংলোয় যাই। কিন্তু সুমিত্রা কাছে আসতে চায় না। তার দু'চোখে ঘৃণা ঠিকরোয়। আগুন ঠিকরোয়। আমারও নরম মন কঠিন হয়ে আসছে। ও সেটা বুঝতে পারে। রমণী-দেহের প্রতি আমার ক্ষুধা আর লোলুপতার দিকটা ভালই জানে। কিন্তু নিজেও যে ভোগ আর পরিতৃপ্তির দোসর হয়েছিল—সেটাই অসহ্য রাগের ব্যাপার এখন। একদিন আমাকে বলল, একটা কথা আমি সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, এরপর আমি আর ছেলেপুলে চাই না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আমাকে কি করতে বলো?

ও রেগে গিয়ে জবাব দিল, তুমি যা খুশি করো—তুমি জাহান্নমে যাও!

আমি বললাম, যা-খুশি আমি করেই থাকি। আর আমার মতো লোক জাহান্নমেও একলা যায় না সে তো তুমি জানোই।

জানে। আবার আমার কবলে পড়লে মুক্তি নেই ভাবছে। বড় ডাক্তারের মেয়ে। আপাত-উপায় একটা নিজের মাথাতেই এলো। সরোষে জানান দিল, যেটা আসছে এসে গেলে আর যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করবে—সে-সময় অপারেশন করিয়ে নেওয়া সহজ।

সেই ভুলটাই করলাম। সন্তানবাৎসল্য কাকে বলে জানি না। তখনো ভোগ জানি শুধু।

মেয়ে হল। ভারী সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। মায়ের থেকেও সুন্দর। নিজের লোকানন্দ নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখলাম অলকানন্দা। মেয়ের দাদু বললে, খাসা নাম। সুমিত্রা নাক কুঁচকে বললে, রাবিশ!

ছ'মাস চলে যায় সুমিত্রা বাপের বাংলো ছেড়ে আসে না। শেষে স্ত্রী আর মেয়ের আচরণ দেখে ডক্টর চ্যাটার্জি হয়তো আঁচ করলেন কিছু। জামাইয়ের মেজাজও তিরিক্ষি দেখলেন তিনি। একদিন ডেকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

অকপটে বললাম সব।

শুনে তিনি মেয়ের ওপরেই রেগে আগুন। বেহুঁশ মাতাল হয়ে গাড়ি চালানোর ফলে প্রভাকর ডি'কস্টার অ্যাকসিডেণ্ট—এ খবর তো জানেনই। বললেন, তোমার দ্বারা প্রকাশ হোক আর যার দ্বারাই হোক, বিশ্বাসঘাতকের ওই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতাম আমি! তুমিই সত্যটা বার করতে পেরেছ বলে তোমার প্রতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ আমি। ডোণ্ট ওয়ারি মাই সান, এভরিথিং উইল বি অলরাইট।

পরদিনই মেয়ে আর নাতনীকে নিজে আমার হেপাজতে দিয়ে গেলেন।

সুমিত্রার ঘৃণা বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ বাড়তেই থাকল। আমি ডাইনে গেলে সে বাঁয়ে চলে। ভালো বললে মন্দ ভাবে। সব কিছুতে আমার কপটতা দেখে। আমার ঘরের শান্তি তছনছ করে দিতে পারলে আর কিছু চায় না।

আমি সহ্য করি। অসহ্য হলে দুই-একটা ঝাঁকুনি-টাকুনি দিয়ে ব'স। তখন চুপ। তখন ভয়। রাতের শয্যা সে আলাদা করে নিয়েছে। পৃথক ঘরে শোয়। মেয়ে থাকে আয়ার জিম্মায় আর এক ঘরে।

কিন্তু ঘর পৃথক করে আমাকে তফাতে রাখা যাবে না সুমিত্রা জানতই। তবু প্রথম রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল। কিন্তু পায়ের আঘাতে সে-দরজা কেঁপে উঠতে নিজেই খুলে দিয়েছে। ও যত বিমুখ, আমার দাবির মত্ততাও ততো বেশি। ও সেটা অত্যাচার ভাবে। লাম্পট্য ভাবে। দু'চোখে গলগল করে ঘৃণা ঠিকরোয়! আমার উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনা ততো বাড়ে।

সুমিত্রা আমার দুর্বলতার সন্ধান পেল মেয়েটা একটু বড় হয়ে উঠতে। ডক্টর চ্যাটার্জির শরীর ভাঙছে, তাই আমার দায়িত্ব বাড়ছে, খাটুনি বাড়ছে। সার্জন হিসেবেও আমার এত নাম-ডাক যে ফুরসত মেলা ভার। তার মধ্যেই মেয়েটাকে একটু দেখার জন্য, তার সঙ্গে একটু খেলা করার জন্য ছুটে ছুটে ঘরে চলে আসি।

এ-সব লক্ষ্য করেই হাতে একটা নতুন অস্ত্র পেল যেন সুমিত্রা। মেয়ের ভালো-মন্দের দিকে বেশি রকম মনোযোগ দেখা গেল তার। তার সেই ভালো-মন্দের বিবেচনাটা আমার বিবেচনার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার আসার সময় হলেই মেয়েকে সে আয়ার সঙ্গে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। সকালে আদর করতে দেখলে সে ওকে পড়ানো বা খাওয়ানোর জন্যে টেনে নিয়ে যায়। আমি যা নিষেধ করব ও তাতেই প্রশ্রয় দেবে।

পাঁচ সাত বছর বয়েস থেকেই মেয়েটা তার বাবা-মায়ের বিরোধ অনুভব করতে শিখল। আট-ন'বছর বয়সে তো বেশ ভালই টের পেল। আমি প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত, নার্সিং হোম নিয়ে ব্যস্ত—আমাকে আর কতটুকু সময় পায় মেয়েটা?

মায়ের মন্ত্রণায় কান-মন পেকে উঠছে তার।

সুমিত্রার বাবার শরীর খারাপ যাচ্ছিল, কিন্তু হুট করে আগেই মা মারা গেল তার। আমি তখন একটা বড় কেস্ নিয়ে দামনে চলে গেছি। শাশুড়ীর পেটে টিউমারের খবর আমার জানার কথা নয়। হঠাৎ বাড়াবাড়ি যন্ত্রণা হতে তাঁকে নার্সিং হোমে আনা হয়। আমাকে টেলিফোনে না পেয়ে টেলিগ্রাম করা হয়। কিন্তু সে-টেলিগ্রামও সময়ে হাতে পড়েনি আমার। ফলে আসতে একদিন দেরি। অন্য সার্জনের হাতে অপারেশন হল শেষ পর্যন্ত। সময়ে অপারেশন হলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু আমার প্রতি ডক্টর চ্যাটার্জির অত্যধিক দুর্বলতার কারণেই সেটা হল না।

আমি এসে দেখলাম সব শেষ। ডক্টর চ্যাটার্জি ভেঙে পড়ে বললেন, তুমি থাকলে হয়তো বাঁচানো যেত।

কিন্তু সুমিত্রা ফুঁসে উঠল। তার যত রাগ গিয়ে পড়ল আমার ওপর। মেয়ের সামনেই চিৎকার করে বলতে লাগল, আমার জন্যেই তার মা মরেছে—টেলিগ্রাম না পাওয়া-টাওয়া সব ভাঁওতা। আর কেস হাতে নিয়ে সেখানে কোথাও ফুর্তিতে মেতেছিলাম বলেই টেলিফোনে সন্ধান মেলেনি।

দশ বছরের অলকানন্দাও জানল বাবার জন্য তার দিদা চলে গেল।

কাজে ডুবে আছি। বাড়ি দুঃসহ লাগে সময় সময়। টান কেবল অলকানন্দা। যত দিন যাচ্ছে মেয়েটা ততো সুন্দর হচ্ছে। মায়ের প্ররোচনায় অনেক সময় সন্দিগ্ধ চোখে দেখে আমাকে। খুব সহজ সরল লোক ভাবে না আমাকে।

ডক্টর চ্যাটার্জির সীরিয়াস স্ট্রোক হল দু বছর বাদে। অনেক যোঝাযুঝির পর সে-যাত্রা সামলে উঠেছিলেন। চোখ বুজলেন তিন মাস পরের হার্ট-অ্যাটাকে। কিন্তু প্রথম বারের বিপদ সামলে উঠেই তিনিই বিষয়আশয় লেখাপড়া করে দেবার ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছিলেন।···আর সেই সুযোগে আমি একটা বড় রকমের ছুরি চালিয়েছিলাম। স্পষ্ট করে তাঁকে বলেছিলাম, তাঁর অবর্তমানে এ নার্সিং হোমের হাল কি হবে আমি জানি না। সব কিছু হাতে পাবার পর সুমিত্রা ডিভোর্সের রাস্তা নেবে বলেই আমার বদ্ধ ধারণা। তিনি আছেন বলেই এখনো সে সেটা পারছে না। তখন আমি প্র্যাকটিস কোথায় করব জানি না, কিন্তু তার মালিকানায় নার্সিং হোমে যে থাকব না সেটা ঠিক।

মেয়ের সঙ্গে আমার বনিবনা হলই না ডক্টর চ্যাটার্জি খুব ভালো করেই জানতেন সেটা। সেই কারণে আমার প্রতি আরো বেশি সহানুভূতি তাঁর। ওই মেয়ের কারণে অলকানন্দাও যে বাপের প্রতি বিরূপ তাও বুঝতেন ভদ্রলোক।

কিন্তু তা বলে এ-রকম চরম বিচ্ছেদের আশঙ্কা তিনি করেননি।

তারপরেই উকিল আর সাক্ষীসাবুদ ডেকে পাকা লেখাপড়া করে ফেললেন। নার্সিং হোম তাঁর প্রাণের জিনিস। তাঁর অবর্তমানে এর আট আনার মালিক আমি লোকানন্দ বড়ুয়া, চার আনার মালিক নাতনী অলকানন্দা বড়ুয়া, আর বাকি চার আনার মালিক এখানকার বিশ্বস্ত কর্মীরা—এই নার্সিং হোম এত বড় করে তুলতে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁরা। মেয়ে সুমিত্রা বড়ুয়া শুধু বাপের বাংলো আর নগদ টাকার মালিক হবে। নার্সিং হোমের সঙ্গে তার কোনো সংস্রব থাকবে না। আর মেয়ের অবর্তমানে সেই বাংলো আর নগদ টাকাও শুধু অলকানন্দা বড়ুয়াই পাবে।

তাঁর মৃত্যুর পর সেই রেজিস্টার্ড, উইলের সমাচার শুনে সুমিত্রার দু'চোখ কেবল ধক ধক করে জ্বলেছে আর জ্বলেছে।

সকলে মিলে ওই বাংলোতেই উঠে আসা হয়েছে তারপর।

·· টাকা এত রোজগার করে চলেছি যে আমার ক্লান্তি এসে গেছে। টাকার স্তূপ জমছে। কিন্তু চাইলেও অবকাশ মেলে না। কাছে দূরে যেখানে হোক বড় অপারেশন কেস হলেই আমাকে ছুটতে হবে। কেউ ছাড়তে চায় না। হাতেপায়ে ধরে।

আমার কোনো দাম নেই কেবল নিজের স্ত্রীর কাছে। মেয়েও আমাকে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। মায়ের মেজাজ দেখে আর আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। কিন্তু বাবারও ভিতরের মেজাজ একটু আধটু অনুমান করতে পারে হয়তো। ওর তেরো বছর বয়সে মায়ের মতোই কিছু একটা অশালীন উক্তি করে বসার ফলে আমার হাতের এক চড় খেয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছিল। ওর মা চিৎকার করে উঠেছিল, ও খুনী! খুনী! কত বড় খুনী আমি ছাড়া কেউ জানে না। কেন কাছে যাস?

হ্যাঁ, আমার মাথায় হঠাৎ হঠাৎ ছেলেবেলার সেই খুন চাপত—যখন আমি পাখি মারতাম, কুকুর মারতাম, ধ্বংস দেখতে চাইতাম।

সেই ভয়েই আমি আরো স্থির, আরো সংযত। চড় মারার পর মেয়েকে বুকে চেপে ধরেছিলাম। ভুল করেছিলাম।

অলকানন্দার ষোল বছর বয়েস হতে আমার টনক নড়ল। আরো সুন্দর আরো মিষ্টি হয়েছে। ওর সর্বাঙ্গ জুড়ে যেন একটা অদ্ভুত আমন্ত্রণ দানা বেঁধে উঠছে। বাংলোর বাইরে আর ভিতরেও ছেলে-ছোকরাদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। অলকানন্দা তাদের সঙ্গে মেশে, হৈ-হৈ করে বেড়ায়। আমি

অস্বস্তি বোধ করি।

স্ত্রীকে বলতে সে মুখ ঝামটা দিল, বেশ করে! ওর বয়সে তুমি কি ছিলে কে দেখতে গেছে!

মেয়ে পাশের ঘর থেকে হাসি চেপে পালাচ্ছে দেখলাম।

আঠার বছর বয়সে একটা ছেলের সঙ্গে বেশি মেলামেশা চোখে পড়তে লাগল আমার। বছর বাইশ-তেইশ হবে ছেলেটার বয়েস। দেখতে সুন্দর। নাম সনি পার্কার। তার বাপ বোম্বাইয়ের মানুষ, গোয়ায় ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। স্বাধীন ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত হলেও গোয়ার এই সব ব্যবসায়ীদের ভালো চোখে দেখি না আমি। অনেকের অনেক রকম নিষিদ্ধ কারবারের সঙ্গে যোগ। আমার চোখে এ-ছেলেটা আরো অপদার্থ। সে নাকি আর্টিস্ট। ছবি আঁকে।

ছবি কখন আঁকে আমি জানি না। সর্বক্ষণ বাড়িতে আড্ডা দেয়। সিগারেট ফোঁকে। যেখানে সেখানে দু'জনকে একসঙ্গে দেখা যায়। অলকানন্দা রাত করে বাড়ি ফেরে। সনি পার্কার তাকে পৌঁছে দিয়ে যায়। মেয়ের মন জয় করতে পেরেছে ভেবে আমাকে খুব একটা পরোয়া করে না। আমার বদ্ধ ধারণা, ও একটা ভ্যাগাবণ্ড মার্কা ছেলে। টাকার লোভে এসে জুটেছে।

আরো এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ অলকার বয়েস যখন উনিশ, ওদের ঘনিষ্ঠতা এত-বেড়ে গেল যে আমার ছেড়ে বাইরের লোকের চোখেও বিসদৃশ ঠেকত। অনেক শুভার্থীজন আমাকে জিজ্ঞাসা করত, ওই সনি পার্কারের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি কিনা।

আমার মন বুঝতো বলেই সুমিত্রা আরো বেশি আসকারা দিত। আমাকে শুনিয়ে বলত, চমৎকার ছেলে। শিল্পীর মর্যাদা সকলে কি বুঝবে! মেয়েকে বারকয়েক সামলে দিতে ফল উল্টো। আরো ছ'মাস না যেতে সে আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, ওই সনি পার্কারকেই বিয়ে করতে যাচ্ছে সে। এটা ওদের দুজনেরই স্থির সিদ্ধান্ত একেবারে।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, ও একটা বাজে ছেলে। তার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না।

অলকানন্দা বলল, সনি কত ভালো ছেলে তুমি জানো না। আমি তাকে ভালবাসি, সে আমাকে ভালবাসে। বিয়ে তার সঙ্গেই হবে।

আমি বললাম, ভালবাসা-টাসা কিছু নয়, ও এসে জুটেছে টাকার লোভে।

অলকানন্দা জবাব দিল, তোমার এক পয়সাও দেবার দরকার নেই তাহলে। দাদু আমাকে যা দিয়ে গেছে তাই দিও। কিছু না পেলেও সনির তোমার টাকার

ওপর এক ফোঁটাও লোভ নেই।

এমনি রেষারেষির মধ্যে আরো ছ'মাস কেটে গেছে। অলকানন্দার বয়েস কুড়ি। মাকে বলেছে এবারে শিগগীরই বিয়ে হবে ওদের।

আমি তখনো বলেছি, আমার আপত্তি আছে। ভ্যাগাবণ্ডের ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করি না।

...কিন্তু এক ব্যাপারে আমাব ভুল হয়েছে। অলকানন্দা আমারই মেয়ে, আমারই মতো অবুঝ, বেপরোযা আর দুঃসাহসী। এদিক থেকে ওর মায়ের সঙ্গে তাব অনেক তফাৎ।

একদিন শুনলাম রাগে শাদা হযে হিস'হিস কবে তাব মাকে বলছে, বাবাকে বলে দিও সে মত দিক আর না দিক আমি কেয়ার কবি না। আমি সনিকে ভালবাসি, সনি আমাকে ভালবাসে—এ বিযে হবেই। হবে হবে হবে। আমার জীবন থাকতে কেউ সনিকে আমাব কাছ থেকে স'বয়ে দিতে পাববে না।

সোমেন মিত্র উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন। লোকানন্দ বড়ুয়া হঠাৎ থেমে যেতে সামনে ঝুঁকলেন একটু। দেখলেন, কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে ভদ্রলোকের সমস্ত মুখ। ঘামছে। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতেও বিষম কষ্ট হচ্ছে যেন।

ঘাবড়ে গিযে সোমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

বিড়বিড় করে লোকানন্দ বড়ুয়া জবাব দিল, সেই কথা—ঠিক সেই রকম কথা—এক দুপুরে বারে বসে নূপুর বলছিল দীপু সরকারকে আর আমি ওদের সামনের কেবিনে বসে শুনছিলাম। দীপুর অবিশ্বাস দেখে রেগে গিয়ে নূপুর বলে উঠেছিল, এই বুকে হাত দিয়ে বলছি, সে-রকম হলে আমার যেন সব শেষ হয়ে যায়—জীবন থাকতে কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না—কেউ পারবে না—কেউ না!

আমার কানের পর্দা হঠাৎ সেদিন ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, অন্য মেয়ে নয়, অলকানন্দার কথাগুলোই ফিরে আবার শুনলাম আমি। কেবিন থেকে ওরা বেরুবাব সময় পর্দা স'রিয়ে নূপুরকে দেখলাম আমি। তারপর ছুটে বাইরে এসেও দেখলাম। অলকানন্দার মতো অত সুন্দর নয়। কিন্তু তারও সর্বাঙ্গে যেন পুরুষ-এর দু চোখ টেনে নেবার মতো কিছু আছে। আমন্ত্রণের ইশারা আছে। আর ভিতরটা আরো বেশি এক-রকম মনে হল ওদের। নইলে এক কথা একই রকম করে দুজনেই বলে কি করে? আমার চোখে নূপুর আর অলকানন্দা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

সোমেন মিত্র নির্বাক। এখনো অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন দেখছেন লোকটার

চোখে-মুখে।

হঠাৎ চমকে উঠে লোকানন্দ বড়ুয়া জিজ্ঞাসা করল, কটা বাজল?

হাতঘড়ি দেখে আশ্বাসের স্বরে সোমেনবাবু বললেন, দেরি আছে, পৌনে এগারোটা।

সোফায় মাথা এলিয়ে দিল আবার।—আচ্ছা, আপনি যান আজ।

…কাল আসব?

ওটুকুতেই বিরক্ত। বলে উঠল, প্লীজ ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি আনটিল আই ফিল লাইক টকিং। আপনার টেলিফোন নম্বর আছে আমার কাছে—খবর দেব। প্লীজ লিভ মি নাও অ্যাণ্ড ডোণ্ট মাইণ্ড।

॥ নয় ॥

এবারের টেলিফোন পবের পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেও এলো না। অপেক্ষায় থেকে থেকে সোমেনবাবুর বিরক্তি ধরে গেল। কি একটা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দু দিনের জন্য তাঁর কলকাতার বাইরে যাবার কথা। ভাবছেন ফোন তুলে কেবল এ-কথাটাই বড়ুয়া সাহেবকে জানিয়ে দেবেন কি না!

এই ভাবনার ফাঁকে দরজার বাইরে দীপু সরকারের খুশি মুখখানা দেখা গেল। সোমেনবাবু দরাজ আহ্বান জানালেন, এসো এসো—কদিন ধরেই ভাবছি তুমি আসবে।

দীপু সরকারের সেই আগের মতোই হাসি-মাখা সুতৎপর হাবভাব। চেয়ার টেনে বসে বলল, কটা দিন একটু ছোটাছুটির মধ্যে ছিলাম, সময় পাইনি—

সোমেনবাবু বললেন, খবর ভালই মনে হচ্ছে যেন?

—তা আপনার আশীর্বাদে একটু আশার মুখ দেখা যাচ্ছে। মোহনদার সঙ্গে সেই ফিনানসিয়ারের ফাইন্যাল এগ্রিমেণ্ট হয়েই গেছে বলতে পারেন। ডেট-ফেট ঠিকমতো পেলে সামনের মাস থেকেই আবার শুটিং শুরু করা যাবে।

শুনে কেন যেন খুব উৎসাহ বোধ করলেন না সোমেন মিত্তির। জিজ্ঞাসা করলেন, নূপুর খুশি?

—খুশি হবে না কেন? মোহনদা তাকে পাকা আশ্বাস দিয়েছেন, এবার ছবি শেষ হওয়ার আগে আর থামা নেই। আর কথা আদায় করে নিয়েছেন, এ ছবি হয়ে গেলে পর পর তাঁর আরো দুখানা ছবিতে কাজ করার আগে নূপুর অন্য লোকের কণ্ট্রাক্ট নেবে না। মোহনদার বাড়িতে জোর আসর বসেছিল কাল।

একটু চুপ করে থেকে সোমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ডক্টর বড়ুয়ার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে ?

—দেখা ! বিরক্তিতে দীপু সরকারের গর্তের চোখ ঠেলে বেরুতে চাইলো।—সেই তো নূপুরের গার্জেন হয়ে বসেছে এখন—দেখা হবে না ! রোজ দেখা হচ্ছে, রোজ উপদেশ ঝাড়ছে, রোজ হম্বিতম্বি করছে ! এখন কি করে তাকে কাটিয়ে দেওয়া যায় সেটাই ভাবনা আমাদের।

একটুও ভালো লাগল না কথাগুলো। জিজ্ঞাসা করলেন, আবার ছবি শুরু হচ্ছে তিনি জানেন ?

—ক্ষেপেছেন ! নূপুরের অবশ্য বলার ইচ্ছে ছিল। তার আশা এখনো যদি লোকটা টাকার থলে নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু আমি আর ঝামেলার মধ্যে নেই মশাই—মোহনদা যদি হাঙর হয় তো আপনার ওই বড়ুয়া আস্ত কুমীর একখানা—বুঝলেন ?

—বুঝলাম, তবে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

—পারলেন না, কেমন ? এতদিন নূপুরও পারেনি। তার বাবা মায়ের জন্য এর মধ্যে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছে। নার্সিং হোম আর হাসপাতালে রোজ দেখতেও যায় তাদের। ছানি অপারেশনের আগে বাপের ডায়বেটিস বেরুনোর ফলে অপারেশন পিছিয়েছে—কেবিন খরচ বেড়েছে—তাও অম্লান বদনে দিয়ে দিচ্ছে। ওদিকে মা তো আরো মাসখানেকের আগে বেরুতেই পারবে না নার্সিং হোম থেকে—নূপুরের হাতে আরো এককাঁড়ি টাকা গুঁজে দিয়েছে সেই জন্য। এই লোককে বোঝা কি এত সহজ ? তদারকের নাম করে বাড়ি এসে যখন নূপুরের গা সেঁটে বসত, আর যখন তখন হাত ধরত আর নিজের হাত ওর কাঁধের উপর চালান করত—তখনো পর্যন্ত বুঝতে কষ্ট হয়েছে। কিন্তু কাল রাতে বোঝা হয়েছে। নূপুরও খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছে কাল রাতে—বুঝলেন ? এরপর আর আমি ওকে নূপুরের ধারে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছি না—অপমান কি করে করতে হয় আমারও জানা আছে ! গাধা বলা বার করছি—

এ-সব শুনে আর এই রাগ দেখে সোমেনবাবুই হকচকিয়ে গেলেন একটু। জিজ্ঞাসা করলেন, কাল রাতে কি হয়েছে ?

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল দীপু সরকার। ওই লোকের প্রতি লেখকেরও একটু দুর্বলতা আছে ভাবে—তাই খবর শোনাতেই এসেছে সে।

—কাল আপনার বড়ুয়া সাহেবের পদার্পণ ঘটেছিল রাত ন-টার সময়।

—কোথায় ?

—কোথায় আবার, নূপুরের বাড়িতে। সঙ্গে একরাশ ভালো ভালো খাবারের প্যাকেট! এসে বলল, আজ সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি হয়েছে, খাওয়াও হয়নি—আজ রাতে আর তার এখান থেকে নড়ার ইচ্ছে নেই—খেয়েদেয়ে এখানেই ঘুম লাগাবে। নূপুরকে বলল, কিছু ব্যস্ত হতে হবে না, যেখানে হোক আমাকে একটু মাথা রাখার জায়গা করে দিলেই হবে।

—ব্যস্ত হতে হবে না বললেই হয় কি করে? দু চোখে ব্যঙ্গ ছড়িয়ে দীপু বলে গেল, বিশেষ করে যে লোক বিদিশার অমন একখানা ঘরে থাকে। বাবার চৌকিতে পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিল তার জন্য—পাশে মায়ের চৌকিতে আমার ব্যবস্থা। এতদিন আমি ওর ভাই দুটোর সঙ্গে পাশের ঘরে শুতুম—নূপুর থাকত এই ঘরে। খাওয়া-দাওয়ার পর যে-যার শুয়ে পড়া গেল। আমার তো মশাই পেটে ভালো দানা পড়লে বিছানায় গা দিতে না দিতে ঘুম। সেই ঘুম ভাঙল সকাল ছটায়। চোখ তাকিয়ে দেখি বড়ুয়া সাহেবের বিছানা খালি।

সোমেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একটু রসিয়ে থামল যেন। তারপর আবার শুরু করল।—ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি একেবারে সাদাটে মুখ করে নূপুর দাওয়ায় বসে আছে। দেখেই বোঝা যায় সমস্ত রাত জেগে কাটিয়েছে। বড়ুয়া সাহেব কোথায় জিজ্ঞাসা করতে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। কোনরকমে বলল, চলে গেছে। শেষে আমার জেরায় পড়ে গলগল করে সব বলে ফেলল। কি করেছে লোকটা রাত্তিরে, ভাবতে পারেন ?

কি শুনবেন ভেবে সোমেন মিত্তির সত্যিই শঙ্কিত একটু এবারে।

—রাত ঠিক কত হবে তখন নূপুর বলতে পারল না, তবে এগারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। ও-সব জায়গায় সেটাই নিঝুম রাত। নূপুরের ঘুম আসছিল না, চুপচাপ ছবির কথাই চিন্তা করছিল। ওদিকের দেয়ালের ধারে ভাই দুটো ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হল, দরজায় কাছে কেউ যেন দাঁড়িয়ে। দরজার দিকে পাশ ফিরেই শুয়েছিল তখন। তারপরেই সর্বাঙ্গ কাঠ একেবারে। অন্ধকার সত্ত্বেও লোকটাকে চিনল। সে ভিতরে ঢুকল। এক পা, দু পা করে নূপুরের দিকে এগলো। খুব কাছে এসে দাঁড়াল। নূপুর জেগে আছে আর চেয়েই আছে অন্ধকারে বুঝবে কি, করে? বেচারীর অবস্থা বুঝুন, অত গরমে গায়ে একটা জামা পর্যন্ত নেই। সিঁটিয়ে পড়ে রইল। বড়ুয়া আস্তে আস্তে ওর মুখের দিকে ঝুঁকল। ভয়ে নূপুর এবার দু চোখ বুজে ফেলল। লোকটার গরম নিঃশ্বাস ওর গালে মুখে লাগছে।

প্রায় আধ মিনিট ওই রকম থেকে লোকটা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর যেমন এসেছিল তেমনি আস্তে আস্তে চলে গেল।

দীপু সরকার চলে যাবার পরেও সোমেন মিত্তির নির্বাক বসে। সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। যাবার আগে দীপু সরকার বলে গেল, ঘরে কাল রাতে ওই ভাই তুটো না থাকলে কি যে হত সে ভাবতে পারে না। সোমেন মিত্তিরের সমস্ত ভেতরটা এর প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। কিন্তু যা শুনলেন তাও যে একেবারে তুর্বোধ্য। কি বলবেন তিনি ?

ফোনও আর করা হল না। বিকেলের দিকে মোহন চৌধুরীর ফোন পেলেন একটা। একটা খবরও নেওয়া হয় না বলে হালকা অনুযোগ। তারপর সেই আশার আর খুশির বার্তা। শীগগিরই তার বাড়িতে সকলকে নিয়ে আলোচনার বৈঠক বসবে একটা, লেখকের তখন না এলেই নয়,—ইত্যাদি।

তুদিন বাদে বাইরে থেকে ঘুরে এসে বিকেলের দিকে সোমেনবাবু কি কাজে বেরিয়েছিলেন একটু। ফিরতে সন্ধ্যা। স্ত্রী জানান দিলেন, তোমার লোকানন্দ বড়ুয়া এর মধ্যে তুবার ফোন করেছিলেন। গলার স্বরে খুব উতলা মনে হল। তুবারই বললেন, আসা মাত্র যেন ফোন করা হয়—জরুরী দরকার।

লোকানন্দ বড়ুয়ার খবর লেখকের মুখে স্ত্রীও কিছু কিছু শুনেছেন ইতিমধ্যে। তাই তাঁরও আগ্রহ।

ফোন করতে বিদিশার ম্যানেজার জানালো, ডক্টর বড়ুয়া এইমাত্র একটু কাজে বেরিয়েছেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবেন। তিনি বলে গেছেন, মিস্টার মিত্র যেন রাত আটটায় বিদিশায় আসেন—এখানেই ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফোন রেখে স্ত্রীর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে সোমেনবাবু শুধু বললেন, রাতে ডিনার সেখানে।

স্ত্রী মন্তব্য করলেন, পাগল আর কাকে বলে—ফোনের গলায় মনে হল কি যেন সাংঘাতিক ব্যাপার।

॥ দশ ॥

ভিতর থেকে ভারী গলা ভেসে এলো, কাম ইন প্লীজ !

সোমেন মিত্র সতের নম্বর ঘরে ঢুকলেন। রাত তখন সাড়ে আটটা।

কিন্তু ঘরের মালিকের দিকে চোখ পড়তে সোমেন মিত্তির অস্বস্তি বোধ

করলেন একটু। সমস্ত মুখ থমথমে। মাথার চুল উসকো-খুসকো। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। সোফার সামনের সেণ্টার টেবিলে হুইস্কির বোতল আর গেলাস। সঙ্গে জল বা সোডা কিছুই নেই। লালচে মুখ। অর্থাৎ ওই কাঁচা তরল পদার্থ বেশ খানিকটা উদরস্থ হয়েছে।

—বসুন। জানলার কাছে গিয়ে নিচের রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন একটু। ঘুরে দাঁড়াতে সোমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার শরীর অসুস্থ নাকি?

—নো, হোয়াই?

—অন্য রকম লাগছে···।

বার দুই পায়চারি করল। সোমেনবাবুর মনে হল, কিছু একটা যন্ত্রণা মাড়িয়ে চলেছে। বিড়বিড় গলার আওয়াজও কানে এলো।—আজ অন্য রকম দিন··· দ্যাট ড্যাম্ ফেটফুল নাইট···দিস টুয়েন্টিনাইন্থ ডে অফ জুলাই···এ দিনটাকে ক্যালেণ্ডার থেকে একেবারে মুছে দিতে পারলে দিতাম।

ঘুরে মুখোমুখি সোফায় বসে পড়ল। হাত বাড়িয়ে হুইস্কির বোতলটা টেনে নিয়ে এবারে ছিপি খুলেই গলায় ঢেলে দিল খানিকটা। মুখ বিকৃত হল একটু। বোতল রেখে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল। এবারে বিরক্তি-মাখা গলার স্বর।—সাড়ে আটটা বেজে গেল, ওরা এখনো আসছে না কেন? এরপর কখন আসবে কখন খাবে কখন বাড়ি যাবে?

সোমেন মিত্র অবাক।—ওরা মানে, দীপু আর নূপুর?

—তা ছাড়া আবার কে!

—ওদের পেলেন কোথায়?

—সকালে গেছলাম।

—ওরা আসবে বলেছে?

—দীপু বাড়ি ছিল না। নূপুর বলেছে আসবে। সী ওয়াজ্ এ বিট্ ডিফারেণ্ট দিস মর্ণিং, আই ডোণ্ট নো হোয়াই।···নটা বাজতে কুড়ি, এখনো আসছে না কেন ওরা?

সোমেনবাবু বলে দিতে পারতেন, ওরা আসবেও না। বলা গেল না।

নটা বাজল। লোকানন্দ বড়ুয়া একবার উঠছে, জানলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, পায়চারি করছে, আবার এসে সোফায় বসছে।—স্ট্রেঞ্জ···কেন আসছে না বলুন তো?

—হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছে।

ডবল বিরক্ত।—আটকে গেছে মানে! এখানে ডিনারের ব্যবস্থা হয়ে আছে

জানে। তাছাড়া আটকে গেলে ফোনে খবর দেবে না কেন?

বলি বলি করে এবারেও কিছু বললেন না সোমেন মিত্র।

সোয়া ন'টা বাজল। সাড়ে নটাও। ক্রমেই ভদ্রলোকের মুখ ঘোরালো হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে কি যেন একটা আতঙ্ক এঁটে বসছে। বার বার একটাই কথা গলা দিয়ে বেরুচ্ছে, স্ট্রেঞ্জ···ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

অসহিষ্ণু হাতে রিসিভার তুলে নিল। রুম-সার্ভিসকে ধমকেই উঠল যেন, ডিনার ফর টু্য! ইয়েস, দ্যাট্স রাইট—ফর টু্য ওন্‌লি!

বোতল থেকে আবার খানিকটা কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢালল। ব্যাপার দেখে সোমেনবাবু ঘাবড়েই যাচ্ছেন।

বেয়ারারা দু'জনের খাবার সাজিয়ে দিল। সোমেনবাবু লক্ষ্য করছেন, লোকটা সুপ খানিকটা খেল। ডিশসুদ্ধ্ খাবারগুলো নাড়াচাড়া করল শুধু—সবটাই প্রায় পড়ে থাকল। চোখে মুখে সেই দুশ্চিন্তা আর আতঙ্ক আরো এঁটে বসছে। হঠাৎ-হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে জানলার দিকে তাকাচ্ছে। ভয়াবহ কিছু যেন চোখে ভাসছে তার।

খুব সাদাসিধে ভাবেই সোমেনবাবু বললেন, এবার ওদের ছবিটা খুব শীগগিরই আবার শুরু হচ্ছে, জানেন তো?

লোকানন্দ বড়ুয়া সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল প্রায়।—হোয়াট্! সী ইজ্ ইন দি গেম এগেইন! এতক্ষণ এ-কথা কেন বলেননি আমাকে! আর ইউ শিওর?

—হ্যা। মোহন চৌধুরী ফোনে বলেছেন। দীপু সরকারও বলে গেছে···

—ও···দ্যাট অ্যাস অ্যাণ্ড অ্যান ইডিয়ট! কিন্তু নূপুর আমাকে কিছু বলল না কেন—কিচ্ছু জানালো না কেন?

উঠে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা করল বারকয়েক। কালো মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে। মনে হল কাঁপছে মানুষটা। আর এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় হাড়পাঁজর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে বুঝি।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো। সোমেনবাবুও নিজের ঘড়ি দেখলেন। রাত দশটা পনের।

—আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে—জাস্ট্ নাও—উইল ইউ কাম উইথ মি প্লীজ?

—কোথায়?

—ডোণ্ট ওয়েস্ট টাইম প্লীজ! উঠুন—ইট্স দ্যাট্ ফেটফুল নাইট অ্যাণ্ড দ্যাট ড্যাম্ আওয়ার ইজ ফাস্ট অ্যাপ্রোচিং। আই অ্যাম শিওর সী ইজ ইন ডেঞ্জার,—

সী মাস্ট বি—আর হোয়াই শূডণ্ট সী কাম?

সোমেনবাবুকে একরকম ঘর থেকে ঠেলে নিয়ে বেরুলো সে। সোমেন মিত্তির আর আপত্তি করলেন না, কারণ এমন একটা মানসিক সংকটের মুখে লোকটাকে একলা ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ ভাবলেন না। না, নূপুর সম্পর্কে তাঁর কোনো আশঙ্কাই নেই।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারটাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলল লোকানন্দ বড়ুয়া। এত রাতে রাস্তাও অনেকটা ফাঁকা। ট্যাক্সি যখন নূপুরের বাড়ির দরজায় দাঁড়াল—ঘড়িতে এগারোটা দশ।

দরজার সামনে আবছা অন্ধকারে দীপু সরকার দাঁড়িয়ে।

লোকানন্দ বড়ুয়া লাফিয়ে নামল। পিছনে সোমেনবাবু। কাছে আসতে দীপুর মুখখানাও খুব শুকনো মনে হল। এত রাতে এই দুজনকে দেখে হকচকিয়ে গেছে।

চাপা গর্জন করে উঠল লোকানন্দ বড়ুয়া।—নূপুর কোথায়?

আমতা আমতা করে দীপু বলল, নটা সাড়ে নটার মধ্যেই তো ফেরার কথা। এখনো আসছে না কেন বুঝছি না…।

দু হাতের থাবায় দীপুর দু কাঁধ ধরে একটা বিষম ঝাঁকানি দিয়ে লোকানন্দ বড়ুয়া ঝাঁঝিয়ে উঠল, কোথায় গেছল সে? কোথা থেকে ফেরার কথা?

—মো-মোহনদার ওখানে…ছবির ব্যাপারে কি একটা দরকারে আসতে বলেছিলেন…আর কিছু টাকাও…

—শাট্ আপ, রাস্কেল! আবার প্রবল ঝাঁকুনি দুটো।—ওর কোনো ক্ষতি হয়ে থাকলে তোমার আমি গায়ের ছাল-চামড়া তুলে নেব! কোথায়? সেই স্কাউনড্রেল কোথায় নিয়ে যেতে পারে ওকে?

এ মূর্তি দেখে দীপুর চোখে-মুখেও একটা অজ্ঞাত ভয়। শুকনো ঠোঁট জিভে ঘষে বলল, মানিকতলার দিকে ওঁর আর একটা বাড়ি আছে, সেখানে যেতে পারে…।

শেষ হবার আগেই ধাক্কা মেরে ট্যাকসির দিকে ঠেলে দিল তাকে।—ওঠো। কুইক!

সে সামনে। সোমেনবাবু আর লোকানন্দ বড়ুয়া পিছনে। ঘড়িতে এগারোটা সতের।

কিন্তু ছোটার দরকার হল না। টালার বড় ব্রিজটা অর্ধেক পেরুতেই লোকানন্দ বড়ুয়া চিৎকার করে উঠল, রোখো! স্টপ!

ব্রেক কষে ট্যাকসি দাঁড়িয়ে গেল।

দরজা খুলে নেমে ব্রীজের ধারের রেলিং-এর দিকে ছুটল লোকানন্দ বড়ুয়া। হ্যাঁ, বুক-উঁচু কার্ণিশে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে একজন। মেয়েই বটে। দীপুকে সঙ্গে করে সোমেনবাবুও দ্রুত এগিয়ে গেলো সেদিকে।

লোকানন্দ বড়ুয়া এক হ্যাঁচকা টানে মেয়েটাকে একেবারে বুকের ওপর নিয়ে এলো। পরমুহূর্তে অন্য হাতের এ-পিঠ ও-পিঠ দিয়ে ঠাস ঠাস করে নূপুরের দুই গালে দুই চড়।—কি করছিলি এখানে তুই? এত রাতে একলা দাঁড়িয়ে এখানে কি করছিলি?

লোকানন্দ বড়ুয়া চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করছে আর উত্তেজনায় নিজেই কাঁপছে থরথর করে।

সোমেন মিত্র দেখছেন, নূপুরের সমস্ত মুখ বিবর্ণ পাংশু। মাথার চুল অবিন্যস্ত। কাঁধের ওপর শাড়ির আঁচলটা এলোমেলো। কাঁধের নিচে ব্লাউজের খানিকটা ছেঁড়া দেখা যাচ্ছে। সকলকে দেখে হোক বা চড় খেয়ে হোক বা ওই কথা শুনে হোক—নূপুর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ।

আবার অল্প একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লোকানন্দ বড়ুয়া সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলে তাকে। ঝুঁকে মুখ দেখছে, তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—ডিড হি ডু ইউ এনি হার্ম?

কাঁদতে কাঁদতেই মাথা নাড়ল নূপুর।—না।

—ওয়াজ হি ড্রাংক? ভেরী?

এবার মাথা নেড়ে সায় দিল।—হ্যাঁ।

দাঁতে দাঁত চেপে লোকানন্দ বলল, সেই জন্যেই সাধের সঙ্গে সাধ্যের যোগ ছিল না। তার পরেই নূপুরের মাথাটা টেনে নিয়ে আদর করল একটু। বার দুই পিঠ চাপড়ে ধরা গলায় বলল, ডোণ্ট ক্রাই মাই গার্ল, ডোণ্ট···দি ওয়ারস্ট ইজ ওভার···ইউ উইল বি অলরাইট নাও···কাম কাম···ডোণ্ট ক্রাই!

প্রগাঢ় মমতায় তাকে ধরে নিয়ে ট্যাকসিতে তুলল। নিজেও উঠল। ও-পাশে সোমেনবাবু। দীপু সরকার সামনে উঠতে যেতেই লোকানন্দ বড়ুয়া ধমকে উঠল তাকে।—তুমি কোথায় যাচ্ছ? গেট ব্যাক হোম—বাড়ি খালি থাকবে? সী নিডস সাম অ্যাটেনশন—কাল সকালে এসো।

দীপু সরকার বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। ট্যাকসি বেরিয়ে গেল।

সমস্ত পথ এক হাতে নূপুরের কাঁধ জড়িয়ে ধরে বসে থাকল লোকানন্দ বড়ুয়া। মাঝে মাঝে পিঠ চাপড়াচ্ছে আর আদরের সুরে বলছে, ডোণ্ট ওয়ারি মাই ডিয়ার ···ইটস অল ওভার···ডোণ্ট ক্রাই!

সোমেন মিত্র ঝুঁকে দেখছেন। গাড়ির আবছা অন্ধকারেও প্রশান্ত সুন্দর দেখাচ্ছে লোকানন্দ বড়ুয়ার কালো মুখখানা। এত সুন্দর যেন আর কখনো দেখেন নি।

বিদিশার তিনতলার সতের নম্বর ঘর। রাত বারোটা তিরিশ। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। গদীর শয্যায় শুয়ে নূপুর অঘোরে ঘুমুচ্ছে। লোকানন্দ বড়ুয়া নিজের হাতে তাকে দুটো স্লিপিং পিল খাইয়ে শুইয়ে দিয়েছে। সাদা আলো নিভিয়ে নীল আলো জেলেছে। শব্দ না করে ঘরের সোফা দুটো তুলে বাইরের করিডোরে এনে পেতেছে। তার একটাতে সোমেন মিত্র বসে আছেন। অন্যটাতে ডক্টর বড়ুয়া এসে বসছে এক-একবার। আবার উঠে ঘরে যাচ্ছেন নূপুরকে দেখতে। মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, তবু যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না লোকটা। বার বার উঠে দেখতে যাচ্ছে। আলতো করে নূপুরের কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

শেষবারের মতো দেখতে এসে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে এসে সোফায় গা ছেড়ে দিল। আর উদ্বেগ নেই। আর যন্ত্রণা নেই।

॥ এগারো ॥

অলকানন্দা বলেছিল, সে সনিকে ভালবাসে, সনি তাকে ভালবাসে—এ বিয়ে হবেই হবে। বলেছিল, ওর জীবন থাকতে কেউ সনিকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না।

আমি সার্জন লোকানন্দ বড়ুয়া এফ. আর. সিএস. ওদের এই ভালবাসাবাসির ব্যাপারটার কানাকড়িও দাম দিইনি। কিন্তু আমার ভুল, সমস্ত ব্যাপারটাই আমি সনি পার্কারের দিক থেকে দেখেছিলাম। আমার বদ্ধ বিশ্বাস, সে একটা ভ্যাগাবণ্ড। টাকার লোভে মেয়েটার কাছে এসে জুটেছে। ওকে মোহগ্রস্ত করেছে। তাই মেয়ের কাছে সনির ভালবাসাটা যদি আমি ঠুনকো প্রমাণ করে দিতে পারি, তাহলেই অলকানন্দার প্রেম-জ্বর ছেড়ে যাবে।

অঢেল টাকা আমার। প্রতিপত্তিরও সীমা-পরিসীমা নেই। সামান্য ইশারায় নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল জনা-তিনেক লোক। তারা টাকার জাল ফেলতে লাগল ওর সামনে। টোপ ফেলে ফেলে অন্য মোহ বিস্তার করে মাথা ঘুরিয়ে দিতে লাগল ওর। দেড় মাস যেতে না যেতে দেখা গেল সনি পার্কার মদে বেহুঁশ হয়ে যেখানে সেখানে পড়ে থাকে, জুয়া খেলে আর খারাপ মেয়েছেলে নিয়ে

আনন্দে মশগুল হয়ে থাকে। অলকানন্দা দেখে, পাগলের মতো ছুটে যায়, আবার পাগলের মতোই হতাশ হয়ে ফিরে আসে। আসবেই। কারণ আমার ওই তিনটি লোক টাকার বৃষ্টি করছে ওব মাথায়, আনন্দ আর ফূর্তির রসদ যুগিয়ে জাহান্নমের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। আবার শাসাচ্ছেও, বন্ধুদের ছেড়ে ভালো ছেলের মতো সংসারী হতে গেলে ওর বুকে ছুরি বসাবেই তারা। বন্ধুদের সঙ্গে থেকে যতো খুশি ফূর্তি করো, যতো খুশি মজা লোটো।

তাকে ফেরাবার আশায় অলকানন্দা যখন শেষবারের মতো তাকে ফেরাতে গেল, সনি পার্কার তখন মদে চুর হয়ে এক মেয়ের কোলে শুয়ে আর একটা মেয়েকে আদর করছে। অলকানন্দাকে দেখে সনি অশ্লীল গালাগালি করে উঠল একটা। সঙ্গীরা তাকে এই রকমই শিখিয়ে রেখেছিল।

অলকানন্দা পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এলো।

আমি সার্জন লোকানন্দ বড়ুয়া আড়াল থেকে ওর মুখখানা দেখি আর হাসি। ক্রমেই ওর সেই সুন্দর মুখ ঘোরালো আর ধারালো হয়ে উঠতে লাগল। আমাকে কোনোরকম সন্দেহ করার কারণ নেই। কিন্তু আমার দিকেও ও অমনি কবেষ্ট তাকায। ওর মায়ের সঙ্গেও কথাবার্তা বন্ধ।

সেদিন একটা ইমারজেন্সি অপারেশন সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরছি। সাড়ে এগারোটা বাজতে মিনিট দুই বাকি। বাড়ির কাছেই একটা মস্ত কালভার্টের ওপর দিয়ে গাড়ি চলেছে আমার। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই ড্রাইভ করে আসছিলাম। দেখি কালভার্টের একেবারে ধারে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে অলকানন্দা। কালভার্টের নিচে এক মাইল জোড়া বিশাল লেক।

গাড়িটা পলকের জন্য একটু স্লো করলাম শুধু। কিন্তু থামালাম না। হেড-লাইট দেখে অলকানন্দা একবার ঘুরে তাকালো। আমার গাড়ি তার না চেনার কথা নয়।

কালভার্ট ছাড়বার আগেই কি মনে হতে সর্বাঙ্গে বিষম একটা ঝাঁকানি। এ-সময় ও এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কোনো খারাপ মতলব নেই তো? কিন্তু পরমুহূর্তে সেই চিরকালের শয়তান ফিসফিস করে উঠল, যা-খুশি হোক, যা খুশি করুক—চলো তুমি!

সবে কালভার্ট ছাড়িয়েছি। আবার ঘড়ি দেখেছি। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা।

ঝপাং করে বেশ বড রকমের শব্দ একটা। সেই মুহূর্তে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল বুঝি। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। গাড়িটা নিজের অগোচরেই নিশ্চল।

নেমে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম কালভার্টের ওপর দিয়ে।

মেয়ে যেখানে ছিল নেই। অলকানন্দা নেই।

চিৎকার করে আমি কি আকাশ চিরে দিতে চেয়েছিলাম? নইলে দেখতে দেখতে অত রাতেও লোকজন এসে গেল কি করে?

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লেকের জল তোলপাড় করে অলকানন্দার দেহ পাওয়া গেল। তাকে ডাঙ্গায় তোলা হল। তার ঢের আগে সব শেষ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু যখন পোস্টমর্টেম হবেই। পরদিন রিপোর্ট এলো। জলের আঘাতে এবং জলে ডুবে মৃত্যু। কিন্তু ওটুকুতেই শেষ নয়। রিপোর্টে আরো কিছু ছিল।

সী ওয়াজ ক্যারিইং। আর্লি স্টেজ অফ প্রেগনেন্সি। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আত্মহত্যা করেছে।

সুমিত্রা কপাল চাপড়ে কাঁদছে। বুক চাপড়ে কাঁদছে। আমার কাছে এসেই মাথা খুঁড়ছে। বলছে, আমার দোষ, সব আমার দোষ, আমাকে তুমি মেরে ফেলো। আমাকে তুমি বিষ দাও। তোমার কথা শুনে ওই বিশ্বাস-ঘাতকটাকে প্রশ্রয় না দিলে আজ আমার কোল এভাবে খালি হয়ে যেত না। তোমার কথা সত্যি হবে জানলে মেয়েকে আমি আগলে রাখতে পারতাম। আমার সব দোষ, আমাকে তুমি ক্ষমা করো না, আমাকে তুমি মেরে ফেলো।

সুমিত্রার কান্না, এই অব্যক্ত যন্ত্রণা আর অনুশোচনা থেকেই হয়তো একদিন মুক্তি তার।

কিন্তু আমার কি হবে?

আমার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। বুকের তলায় একরাশ কালো বাষ্প ফেঁপে উঠছে, রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা সব গ্রাস করে জমাট বাঁধছে। দম বন্ধ করে দিচ্ছে। কোনদিন সেটা নড়বে না সরবে না গলবে না। ওটা আমাকে তিলে তিলে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। ধ্বংস করবে। কিন্তু তখনো আমার অন্তরাত্মা এক নিঃসীম গোপনতার কবরের তলায় অনাগত কাল ধরে গুমরে গুমরে কাঁদবে।

আমার সামনে সুমিত্রা মাথা খুঁড়ছে আর কাঁদছে।

আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। আমার সমস্ত অস্তিত্বের মূল ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিতে শুরু করেছে কেউ। সেখানেও একটা আর্তনাদ শুরু হয়েছে। এলোপাথারি ঝড় উঠেছে। ভিতরের সেই আর্তনাদ আমার কানের পর্দা ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করে দিচ্ছে।—স্বীকার করো, আবারও কবুল করো, সত্যের হাতুড়ির ঘায়ে এই শেষবারের মতো গোপনতার কাঁচঘর ভেঙে দাও। সুমিত্রা

বড়ুয়া সমুদ্র নয়, কর্ণফুলী নয়—তবু স্বীকার করো, তবু কবুল করো। কি হবে ভেবো না, মৃত্যুও যদি হয় তাতেও শান্তি, তাতেও মুক্তি। কিন্তু না যদি পারো তাহলে সমস্ত জীবন ধরে আরো কঠিন মৃত্যু—অফুরন্ত মৃত্যু—ঢের ঢের বেশি ভয়াবহ মৃত্যু।

সোজা হয়ে বসলাম আমি। সুমিত্রার গায়ে হাত দিয়ে তাকেও ঠেলে তুললাম। তার চোখের ভিতর দিয়েই আমি নির্জন কর্ণফুলীর দিকে ছুটলাম। সমুদ্রের দিকে ছুটলাম।

বললাম, দোষ তোমার নয়। সব দোষ আমার। আমার জন্যেই অলকানন্দা চলে গেল।

সেই শোকের মুখেও কথাগুলো বোধ হয় অস্বাভাবিক ঠেকল সুমিত্রার কানে। —তোমার দোষ কেন? তুমি কি করেছ?

—অলকানন্দার দিক থেকে ব্যাপারটা ভাবিনি আমি। তার সেদিনের কথাও আমার মাথার মধ্যে ছিল না।

সুমিত্রা আকুল।—কি মাথায় ছিল না? কি বলেছিল ও?

—অলকানন্দা বলেছিল, ও সনিকে ভালবাসে, ওর জীবন থাকতে কেউ সনিকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না।

সংশয়ে কুটিল হয়ে উঠছে সুমিত্রার চোখ-মুখ। কিন্তু আমার সামনে তখনো কর্ণফুলী। তখনো সমুদ্র।

—কিন্তু তোমার দোষ কেন? তুমি কি করেছ?

—আমি শুধু সনি পার্কারের দিক থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছি। সনির ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করিনি। আমার এ অবিশ্বাসে ভুল ছিল না। লোভের ফাঁদে ফেলে অনায়াসে সনি পার্কারকে আমিই সরিয়ে দিয়েছি।

সুমিত্রার চোখে জল নেই। তীক্ষ্ণ তীব্র হিংস্র চাউনি।

আমার সামনে তখনো কর্ণফুলী। তখনো সমুদ্র।

অকপটে শেষটুকুও কবুল করলাম। বললাম, সেই রাতে ফেরার সময় লেকের কালভার্টে অলকানন্দাকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। অত রাতে ও ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ভেবে আমার খটকা লেগেছিল। ইচ্ছে করলেই গাড়ি থামিয়ে ওকে আমি জোর করে তুলে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু তার বদলে আমার চলে আসার ঝোঁক চাপল। কালভার্ট পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যা হবার হয়ে গেল।

এবারের কনফেশনের ফল? আরো ঢের ঢের বড় ডিজাস্টার।

আহত হিংস্র বাঘিনীর মতোই সুমিত্রা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। তারপর ক্ষিপ্ত আক্রোশে পুলিসে খবর দিতে ছুটল। মেয়ের আত্মহত্যায় ইন্ধন যোগানোর নালিশ। হ্যাঁ, পুলিস তার সাধ্যমতো টানাহেঁচড়াও করল আমাকে নিয়ে। কিন্তু বিচারক সনি পার্কারকে লোভের ফাঁদে ফেলাটা আত্মহত্যায় প্ররোচনা বলে ভাবল না।

কিন্তু সুমিত্রার হিংস্র আচরণে আর খবরের কাগজের কল্যাণে গোয়ার ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সকলে তাই জানল, তাই ভাবল। সকলের সরব আর নীরব ধিক্কারে সুনাম আর আভিজাত্যের চূড়া থেকে একেবারে ধুলায় নেমে এলাম।

তারপর নিঃশব্দে নার্সিং হোমের ভার অন্যের হাতে দিয়ে আর ব্যাঙ্কের সঙ্গে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাতের অন্ধকারে একদিন আমি গোয়া থেকে হারিয়ে গেলাম। এক বছর বাদে আজ আবার সেই রাত। সেই ঊনতিরিশে জুলাই। হাড়পাঁজর-গুঁড়োনো সেই রাত সাড়ে এগারোটা অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে।

কিন্তু আজ ইনজেকশন ছাড়াই আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।